আনন্দ মেলা
পূজাবার্ষিকী
আনন্দ মেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি ও স্ক্যান করেছেন : মোঃ রোকনুজ্জামান রনি

এডিট করেছেন : রনি ও সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুরোধ করো নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcybertron@gmail.com; dhulokhela@gmail.com

চিক্‌লেট্‌স
মজার
চুয়িং
গাম
ADAMS
LEMON
Chiclets
12 PIECES
FLAVOR COATED GUM
ORANGE
TUTTI-FRUTTI
PEPPERMINT
Chiclets
ছেলেরা সব ওই রঙ্গ
দেখো তাকিয়ে
কেমন জোকার মিতে দাঁড়িয়ে
আছে চিক্‌লেট্‌ সাজিয়ে,
জোর গলায় বল সবাই,
আরো দাও, আরো খাবো
চিক্‌লেটের চারটি স্বাদগন্ধে
আমরা মজায় নাচবো।
লেমন
অরেঞ্জ
পিপারমেণ্ট
টুটি - ফ্রুটি
WH 3041

আনন্দমেলা পূজাবার্ষিকী ১৩৭৮

আজকালকার ছেলেমেয়েদের মতিগতির নকশা

যেমন তরুণ মনের, তেমনি তরুণ পায়েরও
তল পাওয়া ভার। বাটার কারিগরদের
সারা জীবনের সাধনাই তো এই নিয়ে।
বাটার দোকানে এলে তাঁদের সেই
গবেষণা, অনুশীলন আর পরীক্ষা-
নিরীক্ষার ফল পাবেন হাতে হাতে।
আরামভরা ও টেকসই, বাহারেও মানানসই।
কাজও দেয়, আরামও দেয় একই সঙ্গে।
বাড়ন্ত পায়ের দুরন্তপনার সকল ধকল
সইতে পারে এমনভাবেই এই জুতো
তৈরি। ছোটোদের যার যার নিজের
জুতো বেছে নিতে দিন।

Bata

সানওয়ে ৪১
৯.৯৫—১২.৯৫

পিন্টু ৬১
৭.৯৫—১০.৯৫
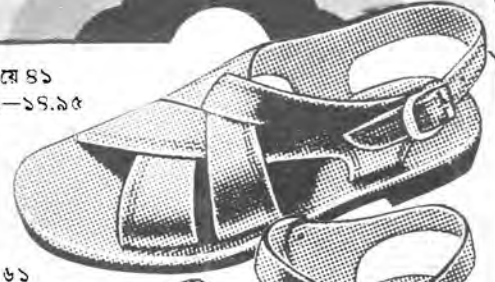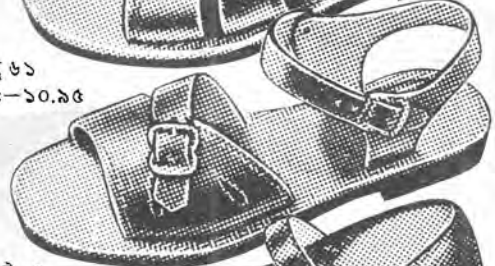
প্লেমেট ৬৭
১৫.৯৫—২০.৯৫

ইভা ৬৪
১৩.৯৫—১৭.৯৫

ওয়েফাইন্ডার্স ৭০
১৭.৯৫—২২.৯৫

ওয়েফাইন্ডার্স ০৩
১৯.৯৫—২৬.৯৫

গোগো ৬৪
৩০.৯৫

গোগো ৮৯
৩০.৯৫

তোমাদের প্রিয় বন্ধু
দস্যি ছেলেটা তোমাদের
সাধের খেলনা—রেলগাড়ি
ভেঙে তার চাকা নিয়ে
উধাও হচ্ছে। এই
দস্যিপনা কি সহ্য করা যায়?
সত্যিকারের রেলগাড়িও তো
তোমাদের বন্ধু।
দূরদূরান্তে যেখানেই যাও,
এই রেলগাড়িই তো তোমাদের
সেখানে পৌঁছে দেয়।
দেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের
ভবিষ্যতও তো এই
রেলগাড়ির ওপর
নির্ভরশীল।
যে সমস্ত
দুষ্টু লোক
এই রেলগাড়ির
সাজ-সরঞ্জাম চুরি
ও তার চলাচল
অচল করে আমাদের
অসুবিধে করছে,
ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষতি
করছে, দেশের
ভবিষ্যৎ নষ্ট করছে,
তোমরা বড় হয়ে
তাদের ক্ষমা
কোরো না।
তোমাদের বন্ধুর শত্রু
তোমাদেরও শত্রু।
INDIAN RAILWAYS

পূর্ব রেলওয়ে

ছবি এ'কেছেন

সত্যজিৎ রায়, পূর্ণেন্দু পত্রী, সমীর সরকার, বিমল দাস, পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়, সুব্রত ত্রিপাঠী, সুবোধ দাশগুপ্ত, সুধীর মৈত্র, বিমল মজুমদার, মদন সরকার, গৌতম রায়, রঘুনাথ গোস্বামী, শৈল চক্রবর্তী, এডওয়ারড লিয়র, সৈয়দ মুজতবা আলী, শিবরাম চক্রবর্তী

আর শিশুশিল্পী

তন্দ্রিমা পত্রী, সুরঞ্জিতা সিংহ, অরুন্ধতী বসু, কুশল চক্রবর্তী, ঝুমকা ভাদুড়ি, পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী, ঊর্মি দাস, কৃত্তিবাস রায়

প্রচ্ছদ পূর্ণেন্দু পত্রী

দাম ২·০০

আনন্দবাজার পত্রিকা (প্রাঃ) লিঃ-এর পক্ষে ৬নং প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীটস্থ কলিকাতা-১ আনন্দ প্রেস থেকে শ্রীরামকৃষ্ণ ঘোষ কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত। সম্পাদক—শ্রীঅশোককুমার সরকার

আমাদের নিবেদিতা
শঙ্করীপ্রসাদ বসু

লোকমাতা নিবেদিতার সমগ্র জীবন-আলেখ্যটি গল্পের মত মনোরম করে চিত্রিত হয়েছে এ বইয়ে।

বইখানি সুচিত্রিত, মনোহর অলংকরণে শোভিত, অনিন্দ্য মুদ্রণ, সুদৃশ্য বাঁধাই—সব দিক দিয়ে ছোটদের এমন বই বাংলায় দুর্লভ। দাম ৬·০০

একটি লোকেরক্তের কাহিনী
সাগরময় ঘোষ

এই কাহিনী একজন দরিদ্র অসহায় অল্পশিক্ষিত মানুষ বৈদ্যনাথের কাহিনী হয়েও শুধু তারই কাহিনী নয়, ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের এক অসামান্য চারিত্র্য-আলেখ্যও—যাতে সেই কর্মযোগী ভারতবরেণ্য বিরাট পুরুষটির যথার্থ ভাবমূর্তিটি নিখুঁতভাবে উদ্ভাসিত। দাম ৩·০০

নন্দকান্ত নন্দাঘুন্টি
গৌরকিশোর ঘোষ

পরম গৌরবের দিন—যেদিন অপরাজিত নন্দাঘুন্টি মাথা নুইয়েছিল একদল তরুণ বাঙালী পর্বত-অভিযাত্রীর কাছে। এই দলের অন্যতম সদস্য গৌরকিশোর ঘোষ ফিরে এসে নন্দাঘুন্টি অভিযানের সেই পরম রোমাঞ্চকর কাহিনী বর্ণনা করেছেন এই গ্রন্থে। দাম ৫·০০

ছেলেদের বিবেকানন্দ
সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার

এই গ্রন্থটি ছোটদের জন্যে লেখা স্বামী বিবেকানন্দের একটি অসাধারণ জীবনকাহিনী। এই সুখপাঠ্য জীবন-চরিত শুধু ছোটদের নয়, যাঁরা অল্পায়াসে স্বামীজীর জীবন ও কর্মের সঙ্গে পরিচিত হতে চান, তাঁদের জন্যেও সর্বশ্রেষ্ঠ গ্রন্থ। ২·০০

মেঘ বৃষ্টি রোদ
রঞ্জিত বন্দ্যোপাধ্যায়

এ বই বাংলা ভাষায় সাধারণের জন্যে সরস ও আগ্রহসঞ্চারী বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ রচনার যে ধারাটি জগদীশচন্দ্র বসু, রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী, জগদানন্দ রায় প্রমুখের পর শুকিয়ে গিয়েছিল, 'মেঘ বৃষ্টি রোদ' গ্রন্থটি সে ধারাটি পুনরুজ্জীবিত করল। ৩·০০

রহস্যময় রূপকুণ্ড
বীরেন্দ্রনাথ সরকার

এক রহস্যময় হ্রদ হিমালয়ের রূপকুন্ড ষোল হাজার ফুট উঁচুতে অবস্থিত এই দুর্গম হ্রদের তীরে আজ দু' শো বছর ধরে পড়ে আছে একদল মানুষের মৃতদেহ আর তাদের ব্যবহৃত নানান সামগ্রী। কে এরা? কোথা থেকে হয়েছিল এদের আগমন? দাম ৩·৫০

ছড়া ॥ অমিতাভ চৌধুরী ছবি ॥ পূর্ণেন্দু পত্রী

ছোটদের বড় হয়ে পড়বার, বড়দের ছোট হয়ে পড়বার, সকলের একসঙ্গে পড়বার ছড়ার বই, ছবির বই, মজার বই। চার রঙা প্রচ্ছদ। পাতায় পাতায় রঙিন ছবি। দুনিয়ার সব ঘটনার সব রটনার ইয়ার-বুক। হাসির গাইড-বুক। দাম ৩·০০

ফুটবল খেলতে হলে
অমল দত্ত

আমাদের দেশের ছেলেদের ফুটবলার হয়ে উঠতে হলে কি করা দরকার, সহজ প্রাঞ্জল ভাষায় অসংখ্য স্কেচের সাহায্যে এই বইয়ে ভবিষ্যতের ফুটবলারদের জন্যে লিখেছেন এককালের ভারতীয় দলের লেফট-হাফ, বর্তমানে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ফুটবল কোচ শ্রীঅমল দত্ত। দাম ১০·০০

ফুটবলের আইনকানুন
মুকুল দত্ত

ফুটবল খেলার মূল আন্তর্জাতিক আইন, বিশদ ব্যাখ্যা ও ভাষ্য, বিভিন্ন আইন ও নিয়মাবলীর প্রয়োগ সম্পর্কিত বিধানের সংক্ষিপ্তসার, ফুটবল খেলায় সংঘটিত অথবা সম্ভাবিত ১৩২টি জটিল প্রশ্নের উত্তর এবং আইনভিত্তিক প্রায় এক শত ডায়াগ্রাম, ইলাস্ট্রেশন ও চিত্রে এই গ্রন্থটি সমৃদ্ধ। দাম ৬·০০

লাল বল লারউড
শঙ্করীপ্রসাদ বসু

ক্রিকেট-ইতিহাসের সবচেয়ে বড় সংঘর্ষ বডিলাইন। সে এমন ভয়াবহ সংঘাত, যাতে জড়িয়ে পড়েছিল দুটি বিরাট দেশ এবং তাদের মধ্যে রাজনৈতিক সম্পর্কচ্ছেদের উপক্রম হয়েছিল। এই ক্রিকেট-বইয়ে আবির্ভূত ক্রিকেটের মহানায়কেরা—ব্র্যাডম্যান, জার্ডিন, লারউড, হ্যামন্ড, উডফুল এবং আরও বহুজন। দাম ৬·০০

ক্রিকেটের আইনকানুন
মতি নন্দী

বর্তমান গ্রন্থে ক্রিকেট খেলার মূল আন্তর্জাতিক আইন, এবং প্রত্যেকটি আইন সম্বন্ধে সরকারী মন্তব্য ও বিভিন্ন জ্ঞাতব্য অসংখ্য ডায়াগ্রাম ও ইলাস্ট্রেশন সহ পরিবেশিত হয়েছে। দাম ৫·০০

নট আউট
শঙ্করীপ্রসাদ বসু

লেখকই বাংলায় প্রথম বিস্তৃত আকারে ক্রিকেট-সাহিত্যের প্রবর্তক। বাংলা সাহিত্যের এই নতুন ধারায় শ্রীযুক্ত বসুর সার্থক সংযোজনা 'নট আউট'। দাম ৬·০০

এবার পূজায় ছেলেমেয়েদের
মাতিয়ে তোলার মতন উপহার!
এইচ-এম-ভি রেকর্ডে
ঠাকুরমার ঝুলি
EMI
ঠাকুরমার ঝুলি
প্রথম খণ্ড : বুদ্ধু-ভুতুম
দ্বিতীয় খণ্ড : নীলকমল - লালকমল
গীতিনাট্যরূপ : ভাস্কর বসু ; সঙ্গীত পরিচালনা : ডাঃ নচিকেতা ঘোষ
অংশ গ্রহণ করেছেন : হেমন্ত মুখোপাধ্যায়, কাজী সব্যসাচী.
সন্ধ্যা মুখোপাধ্যায়, আরতি মুখোপাধ্যায়, শ্যামল মিত্র,
নির্মলেন্দু চৌধুরী, অনুপ ঘোষাল এবং আরো অনেকে।
EMI
দি গ্রামোফোন কোম্পানী অব ইণ্ডিয়া লিমিটেড
(ইলেকট্রনিক, রেকর্ড ও জনরঞ্জনে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে
অগ্রণী ই. এম. আই. প্রতিষ্ঠানসমূহের অন্যতম)
কলিকাতা • বোম্বাই • দিল্লী • মাদ্রাজ • গৌহাটী • কানপুর
GC 6217 R

আশীর্বাদ

মূর্ত্ত তোরা বসন্তকাল মানবলোকে,
সদ্য নবীন মাধুরীকে আনলি চোখে
পুরানোকে ঝরিয়ে দেওয়ার মন্ত্র সাধা,
সরিয়ে দিলি জীবন পথের জীর্ণ বাধা।
ফুল ফোটানোর আনন্দ গান এলি শিখে,
কোথা থেকে ডাক দিয়েছিস মৌমাছিকে
চঞ্চল ঐ নাচের ঘায়ে তরুণ তোরা
উচ্ছলিয়া দিলি ধরায় পাগলা-ঝোরা।
তাই আজি এই নববরষ স্নেহভরে
নবীন আশার বাহন তোদের আশীষ করে
মানবগৃহে তোরা প্রাণের প্রথম বাণী
স্বর্গ হতে কলভাষায় দিলি আনি।
মর্ত্ত্য হতে যেন আবার দিনের শেষে
স্বর্গ পানে পূর্ণতর যায় ফিরে সে।

১৮ বৈশাখ ১৩৪৭ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
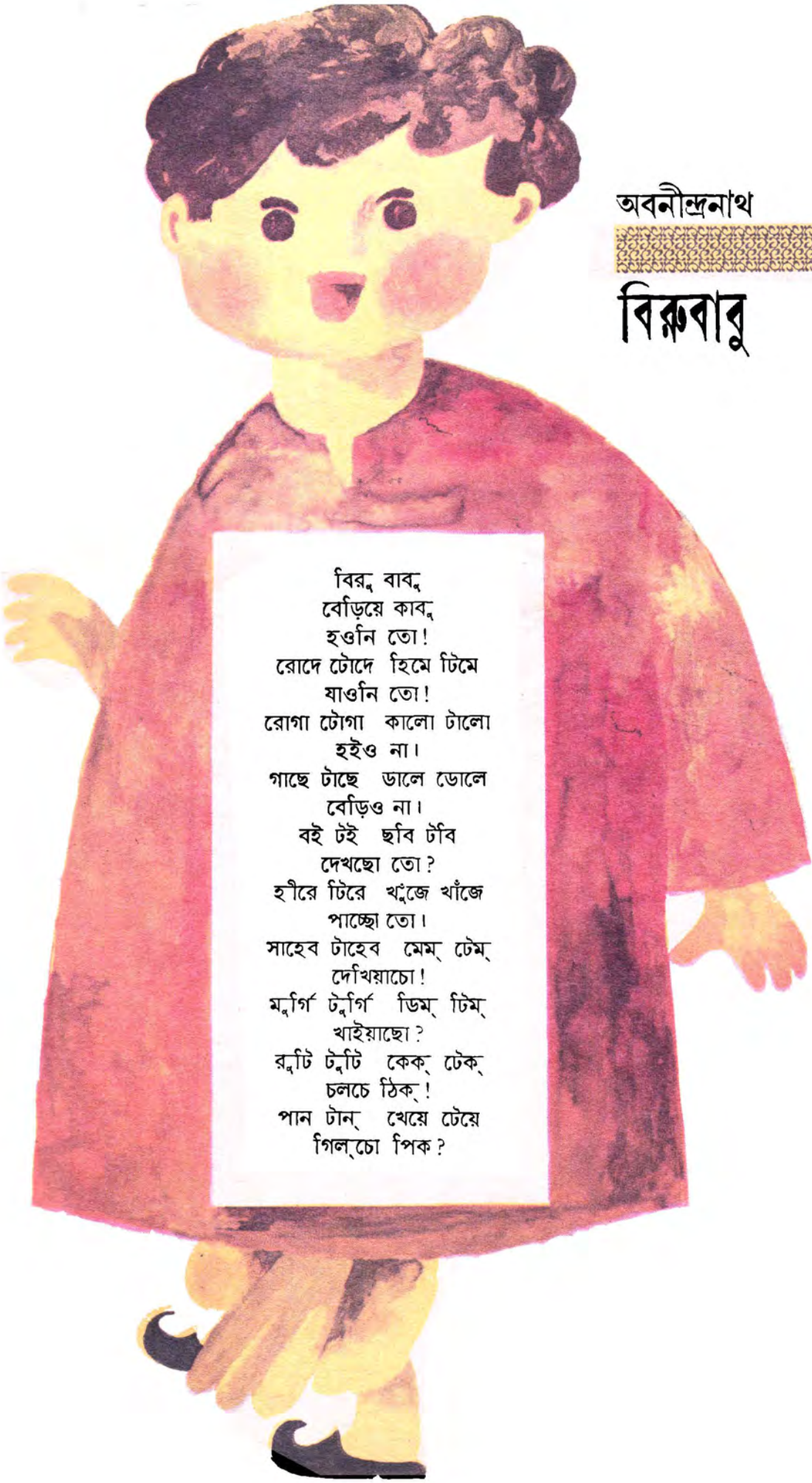
শৈশব সাংখ্য সংগীত

ইন্দিরা দেবীচৌধুরাণী
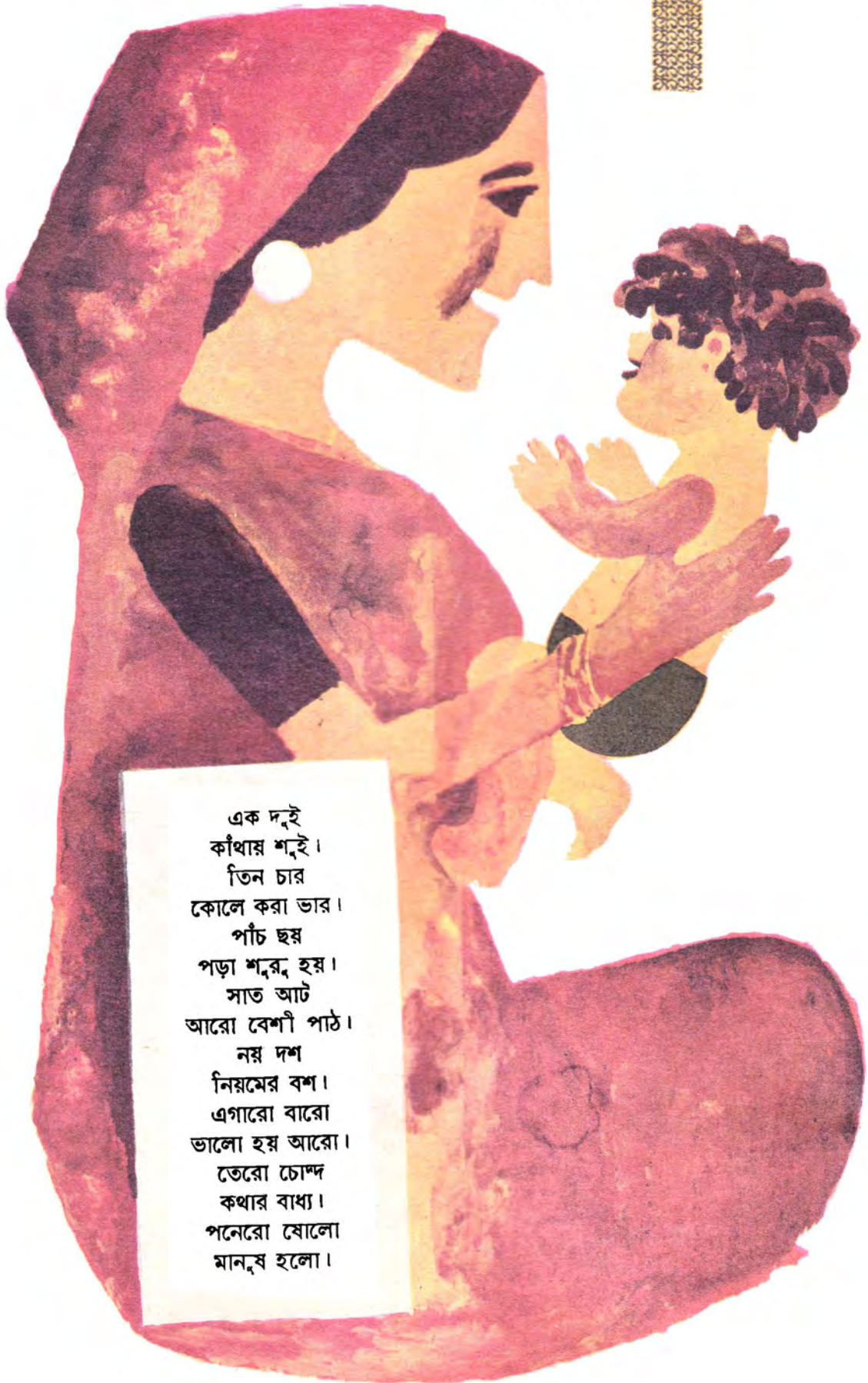
এক দুই
কাঁথায় শুই।
তিন চার
কোলে করা ভার।
পাঁচ ছয়
পড়া শুরু হয়।
সাত আট
আরো বেশী পাঠ।
নয় দশ
নিয়মের বশ।
এগারো বারো
ভালো হয় আরো।
তেরো চোদ্দ
কথার বাধ্য।
পনেরো ষোলো
মানুষ হলো।

অবনীন্দ্রনাথ

বিরুবাবু

বিরু বাবু
বেড়িয়ে কাবু
হওনি তো!
রোদে টোদে হিমে টিমে
যাওনি তো!
রোগা টোগা কালো টালো
হইও না।
গাছে টাছে ডালে ডোলে
বেড়িও না।
বই টই ছবি টবি
দেখছো তো?
হীরে টিরে খুঁজে খাঁজে
পাচ্ছো তো।
সাহেব টাহেব মেম্ টেম্
দেখিয়াচো!
মুর্গি টুর্গি ডিম্ টিম্
খাইয়াছো?
রুটি টুটি কেক্ টেক্
চলচে ঠিক্!
পান টান্ খেয়ে টেয়ে
গিল্‌চো পিক?

এডওয়ার্ড লিয়র

ছোট্ট সোনা চারজনা ছুটলো সাগর মাঠ পেরিয়ে

সে কি আজকের কথা নাকি! দেখতে দেখতে কতো-দিন হয়ে গেল।

সেই আদ্যিকালে এক দেশে থাকত তিন ভাই আর এক বোন। তাদের নাম—বেগুনি, হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং আর সিংহের-পো। যেমনি তাদের নামের বাহার, তেমনি বুদ্ধির বহর। চার মুণ্ডু এক করে একদিন তারা ঠিক করল, পৃথিবী ঘুরতে বেরুবে। সামনের সমুদ্দুর থেকে রওনা হয়ে সারা দুনিয়া পাক দিয়ে দেশের পেছনের সমুদ্দুরে এসে হাজির হবে।

যেই-না ভাবা অমনি শুরু হল তোড়জোড়। বিরাট একটা পালতোলা নৌকো কিনে ফেলল। তার সর্বাঙ্গে লাগাল নীল রং আর মাঝে মাঝে সবুজ রংয়ের বুটি। পালখানাকে করল হলদে-লালে ডোরাকাটা। এই যাত্রায় সঙ্গী নিল ওরা আরও দুজনকে। একজন হল পুষি বেড়াল—সে ওদের নৌকোর হাল ধরবে, নৌকোটাকে দেখাশোনা করবে; অন্যজন বুড়ো হাট্টিমা-টিম-টিম—খাবার-দাবার রান্না করবে, চা-জলখাবারের ব্যবস্থা দেখবে। অন্যান্য জিনিসপত্রের সঙ্গে প্রকাণ্ড একটা কেটলিও তোলা হল নৌকোয়।

প্রথম দশটা দিন তাদের তোফা আরামে কেটে গেল। সমুদ্দুরে কিলবিল করছে অজস্র মাছ। লম্বা চামচে করে তুলে দেওয়ামাত্র হাট্টিমা-টিম-টিম সুন্দর করে রেঁধে দিচ্ছিল। পুষি বেড়াল তো সেই মাছের এঁটোকাঁটা খেয়েই খুশিতে ডগমগ। মনের আনন্দে ওরা ভাসতে ভাসতে চলেছে।

বেগুনি সারাদিন ধরে একটা মাঠাতোলা পাত্রে সমুদ্দুরের নোনা জল তোলে আর তিন ভাই মিলে তার থেকে মাখন বার করতে চেষ্টা করে। চেষ্টাই শুধু সার হয়—মাখন বেরোয় কালেভদ্রে। সন্ধে হলেই চারজনে গিয়ে ঢোকে কেট্‌লিতে। সেখানে আরামে নাক-ডাকিয়ে ঘুমোয়। এদিকে সারা রাত্তির নৌকোটাকে সামলায় পুষি আর হাট্টিমা-টিম-টিম।

এইভাবে দিন যায়, রাত কাটে। ওরা চলেছে তো চলেইছে। চারিদিকে শুধু জল, জল আর জল। কিছু-দিন পর হঠাৎ দূরে একটা ডাঙ্গা দেখা গেল। দেখে ওদের আনন্দ আর ধরে না। তাড়াতাড়ি এগিয়ে গেল ডাঙ্গাটার দিকে। কাছাকাছি গিয়ে দেখল, ভারী মজার এক দ্বীপ সেটা। মাঝখানে জল আর চারপাশে জমি। উপচে-পড়া ঘূর্ণি জলের আঁকাবাঁকা রাস্তা—এই আছে, এই নেই। বিরাট একটা গাছ সেই দ্বীপে। পাঁচশো তিন ফুট লম্বা।

ওরা নামল সেখানে। ওমা, দু-পা এগোতে না-এগোতেই চক্ষু একেবারে ছানাবড়া! সারা দ্বীপটা বোঝাই শুধু মাংসের কাটলেট আর চকোলেটের টুকরো। জনপ্রাণীর কোন পাত্তা নেই কোনখানে। কিন্তু সত্যিই মানুষজন আছে কিনা সেটা তো ভালো করে দেখা দরকার।

কাজেই ওরা গিয়ে উঠল সেই বিরাট গাছটাতে। এক-নাগাড়ে সাতদিন সেখানে কাটিয়েও কারো টিকিটি নজরে পড়ল না। তখন গাছ থেকে নেমে মাত্র দু হাজার মাংসের কাটলেট আর দশ লক্ষ চকোলেটের টুকরো ওরা ওদের নৌকোয় বোঝাই করে নিল। একমাস ধরে মৌজ করে সেগুলোকে সদ্ব্যবহার করল পরমানন্দে অথৈ জলে ভাসতে ভাসতে।

এরপরে যেখানে এসে ঠেকল তাদের নৌকো সেখানে কম করে অন্তত পঁয়ষট্টিটা নীল লেজঅলা টিয়া পাখির বাস। তাদের দিকে তাকালে তাকিয়েই থাকতে হয়। চোখ ফেরান যায় না সহজে। লজ্জার কথা কী বলব, কথা নেই বার্তা নেই পুষি বেড়াল আর হাট্টিমা-টিম-টিম আস্তে আস্তে গুঁড়ি মেরে গিয়ে তাদের লেজগুলোকে দিল কামড়ে। দেখে বেগুনি তো রেগে আগুন। খুব বকাবকি করল দুজনকে। কিন্তু পালক-গুলোকে দেখে লোভ সামলাতে পারল না। লেজ থেকে খসে-পড়া দুশো ষাটটা পালক সে কুড়িয়ে নিয়ে লাগাল তার টুপিতে। আরে ব্বাস! টুপিটাকে তখন কী সুন্দর দেখতে হল! ঠিক যেন কোন রাজকন্যের মুকুট।

যেতে যেতে বাধল আরেক ঝামেলা। সমুদ্দুরের একফালি একটা জায়গায় এত মাছ গিজগিজ করছিল যে তাদের নৌকো আর এগোতেই পারে না। একেবারে নট নড়ন-চড়ন, নট কিচ্ছু। ঠায় ছ সপ্তা আটকে থাকতে হল সেখানে। তবে একটা বাঁচোয়া, মাছগুলো ছিল চিংড়ি মাছের চাটনিতে ভেজানো রান্না করা সব শোল মাছ। তোফা খেতে। গপাগপ ওরা খেয়ে যেতে লাগল। খেয়ে খেয়েই প্রায় সাবাড় করে দিল সবাইকে।

নৌকো চলেছে। চলেছে...চলেছে...চলেছে।

এবারে এসে থামল এক কমলালেবুর রাজ্যে। ইয়া বড় বড় লেবুভর্তি অজস্র গাছ চারিদিকে। ফলের ভারে নুয়ে পড়েছে। হাতছানি দিয়ে যেন ডাকছে তাদের। ডাকছে নিয়ে যাবার জন্যে। পেল্লায় সেই কেটলিটাতে বোঝাই করে লেবু নেবে বলে কেটলিটা নিয়েই নেমে পড়ল ওরা নৌকো থেকে। বেশ কুড়োচ্ছিল। হঠাৎ ফুরফুরে হাওয়া ঝড়ের মতন বইতে শুরু করল। বেগুনির অমন সাধের টুপিটার বেশির ভাগ পালকই উড়ে গেল তার দাপটে। দমাদ্দম আরম্ভ হল লেবুবৃষ্টি। মাথায়, পিঠে, মুখে। কার সাধ্য সেখানে দাঁড়িয়ে থাকে! প্রাণ বাঁচাতে ওরা দৌড় দিল নৌকোর দিকে।

আবার ভেসে চলার পালা।

বেশ কয়েকদিন নির্বিঘ্নেই কাটল। ধীরে-সুস্থে গিয়ে পৌঁছল লাল-চোখো শাদা ইঁদুরের দেশে। অগুনতি লাল-লাল চোখঅলা শাদা-শাদা ইঁদুর তড়িবৎ করে বসে বসে পায়েস খাচ্ছিল। দেখে ওদের নোলায় জল এল। কেন না, এতদিন শুধু শোল মাছ আর কমলালেবু খেয়ে খেয়ে জিব একেবারে হেজে গেছে। অতএব সাব্যস্ত

হল, ইঁদুরদের তুতিয়ে-পাতিয়ে খোশামোদ করে খানিকটা পায়েস চেয়ে নেবে। খড়ের-সংকে বলা হল ইঁদুরদের কাছে আর্জি পেশ করতে। খড়ের-সং এক-পায়ে খাড়া। তক্ষুণি ছুটল আর্জি নিয়ে। ইঁদুররা তাকে নিরাশ করল না। একটা আখরোটের খোলায় আধঘোলা জলে তৈরী একটুখানি পায়েস দিল। তিরিক্ষি হয়ে উঠল খড়ের-সং-এর মেজাজ। বললে, এত পায়েস রয়েছে তোমাদের, আর একটু বেশি দিতে পারছ না? তার কথা শেষ হল না, ইঁদুরগুলো ওর দিকে ঘুরে হাঁচতে শুরু করলে। কী হিংস্র আর মারাত্মক সেই হাঁচি! লক্ষ লক্ষ ইঁদুরের একত্রে হাঁচির বিকট আওয়াজ কল্পনার বাইরে। খড়ের-সং রেগেমেগে তার টুপিটাকে ছুঁড়ে ফেলে দিল পায়েসের হাঁড়িতে। পায়েসটাকে নষ্ট করে ছুটে পালিয়ে এল তাদের নৌকোয়। খুব হয়েছে বাবা! আর পায়েস খেয়ে কাজ নেই—এখন ভালোয়-ভালোয় এখান থেকে কেটে পড়াই বুদ্ধিমানের কাজ। অতএব তড়িঘড়ি ওরা খুলে দিল ওদের নৌকো।

ফের সেই অকূল দরিয়া। সেই ভাসতে ভাসতে এগিয়ে চলা।

এবার যেখানে এল, সেখানে একটাও বাড়িঘর নেই—আছে অসংখ্য নীল রঙের ছিপি খোলা শিশি। মিষ্টি চোখ-জুড়নো নীল রঙ। প্রত্যেক শিশির মধ্যে আবার একটা করে নীল মাছি। তারা গুণগুণ করে গান গাইছে। অদ্ভুত চাষাড়ে সেই সুর। নিজেদের মধ্যে কোন ঝগড়া-ঝাঁটি নেই, বিবাদ নেই। যে-যার শিশিতে সুখে বাস করছে। বেগুনি, হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং, সিংহের-পো—সকলেই দেখে খুব অবাক হয়ে গেল।

নীল-শিশি-মাছিদের অনুমতি নিয়ে ওরা তীরে নৌকো ভেড়াল। একটু চা না খেলে আর চলছিল না। শিশিগুলোর সামনে ওরা চা করতে বসল। চায়ের পাতা ফুরিয়ে গিয়েছিল, কাছেই গরম জলে কিছু নুড়ি ছেড়ে দেওয়া হল। হাট্টিমা-টিম-টিম তার একোর্ডিয়ানটাকে বার করল। সুন্দর একটা গৎ বাজাতেই আপনা থেকে চমৎকার চা হয়ে গেল।

চা খেয়ে চারজনে নীল-শিশি-মাছিদের সঙ্গে শুরু করল গল্পগুজব। মাছিরাও খুব শান্ত আর ভদ্রভাবেই তাদের সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করলে। অবশ্য মাছিদের কথা বলার ভেতরে একটা গুণগুণানি টান ছিল। কেননা ওরা ওদের দাঁতের ফাঁকে ছোট্ট কাগজের বুরুশ আটকে রাখে—তাই কথা বলার সময় একটা হিস-হিস আওয়াজ হয়।

বেগুনি জিজ্ঞেস করল, আচ্ছা, তোমরা এই শিশির মধ্যে বাস কর কেন দয়া করে বলবে? আর শিশির মধ্যেই যদি থাক, তাহলে সবুজ বা ময়ূরকণ্ঠী কিম্বা হলদে শিশির মধ্যে থাক না কেন?

উত্তরে একটা নীল-মাছি বললে, ব্যাপারটা কী জানো, আমরা জন্মেই দেখি এই শিশিগুলো আমাদের বাস করার জন্যে তৈরী হয়ে আছে। আমাদের ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা, তার ঠাকুর্দা এগুলোকে তৈরী করে গেছলেন। আমরা তাই জন্মের পরই এর মধ্যে ঢুকে পড়ি। শীত এলে শিশি-গুলোকে উল্টে নিই। তাতে আমাদের আর ঠাণ্ডা লাগে না। অন্য রঙের শিশিতে কিন্তু এসব চলবে না, সে কথা তো তোমরা ভাল করেই জানো।

হাতুড়ি-পেটা আমতা-আমতা করে বললে, হ্যাঁ, তা চলবে না ঠিকই—কিন্তু তোমরা কী খেয়ে পেট ভরাও জানতে পারি কি?

নীল-মাছি জবাব দিল, প্রধানত শামুকের তৈরী পিঠেই আমাদের খাদ্য। অবশ্য যখন তা পাওয়া যায় না, তখন খাই বৈঁচির কাঞ্জি আর সেদ্ধ করতে করতে আমসত্ত্ব হয়ে যাওয়া রাশিয়ান চামড়া। খড়ের-সং হুস করে জিবের ঝোল টেনে বলল, আঃ, কী সোয়াদ! সিংহের-পো ফোড়ন কাটল, উঃ, দারুণ!

আর নীল-শিশি-মাছিরা সমস্বরে বলে উঠল, গুণ গুণ।

এমন সময়ে মাঝবয়সী একটা মাছি স্মরণ করিয়ে দিল, আরে-আরে, বিকেলের গান গাইবার সময় হয়ে গেল যে!

ব্যস, সঙ্গে সঙ্গে এক ইশারায় সমস্ত নীল-শিশি-মাছিরা গুণগুণিয়ে সপ্তমে কালোয়াতি ধরল। সর্দি-ঝরার মত সুরের সেই ঘড়ঘড়ে গমক ছড়িয়ে পড়ল কূল-কিনারাহীন জলের ওপর। পথ-আগলে দাঁড়িয়ে থাকা শান্ত ক্যাবলাকান্ত সবুজে পাহাড়টার চুড়োয় হারিয়ে-যাওয়া চামচিকেদের হট্টগোলকেও ছাপিয়ে ভেসে চলল সেই সুর। তারা-ঝকমকে আকাশ থেকে তখন উপচে পড়ছে চাঁদের আলো—সেই আলোয় নীল-শিশি-মাছিদের তেল-চকচকে শরীরের দু পাশে, ডানায় আর পেছনের দিকে অদ্ভুত এক জংলী আভা ফুটে বেরুচ্ছে। আকাশের মতন নীলচে চোখ-জুড়নো সেই আসরের খুশি দেখে দিগ্বিদিকও স্থির থাকতে পারল না—হেসে ফেলল ফিক্ করে।

সেই সন্ধের কথা ওরা বহুদিন ভুলতে পারে নি। প্রায়ই মনে পড়ত, আর ভারী ভালো লাগত।

যাই হোক, মাঝরাত্তিরে ওরা সেখান থেকে নৌকো ছেড়ে দিল। হাট্টিমা-টিম-টিম যেভাবে নৌকোটাকে সাজিয়ে রেখেছিল তার এতটুকু এদিক-ওদিক হয় নি। চায়ের কেটলি আর মাঠাতোলা বোয়েম যেখানে থাকার ঠিক সেখানেই রয়েছে। পুষি বেড়াল বসেছে হালে। চার ভাইবোন একে একে নৌকোয় উঠল। নীল-শিশি-মাছিরা অবাক হয়ে ওদের চলাফেরা দেখছিল। ওরা চলে যাচ্ছে বলে দুঃখও হচ্ছিল তাদের। বিদায় নেওয়ার আগে বেগুনি হঠাৎ নৌকো থেকে নেমে এল। তার কাছে সেই টিয়ার

লেজের সুন্দর পালক তখনও কয়েকটা ছিল। ভালবাসার চিহ্ন হিসাবে একটা পালক সে নীল মাছির চুলের পেছনে আটকে দিল। হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং আর সিংহের-পো-ও মাছিদের তিনটে ছোট ছোট বাক্স উপহার দিল। বাক্সের একটায় ছিল কালো পিন, আরেকটায় শুকনো খড়, অন্যটায় বিট নুন। এগুলো পেয়ে মাছিরা খুব খুশী। বারবার ওদের অভিনন্দন জানাতে লাগল।

নীল-শিশি-মাছিদের ছেড়ে এসে সত্যিই ওরা খুব মুষড়ে পড়েছিল। কেবলই মনে হচ্ছিল তাদের কথা আর কান্নায় ভরে উঠছিল সারাটা বুক। তাড়াতাড়ি ওরা তাই ঢুকে পড়ল কেটলির মধ্যে। চোখ জুড়ে নামল গভীর ঘুম। তারপর ঢেউয়ের তালে দুলতে দুলতে কখন এক সময় নীল-শিশি-মাছিদের দেশ ছাড়িয়ে ওরা চলে এল দূরে, বহু দূরে।

বলার মত কিছুই আর ঘটল না কদিন। নিরুপদ্রব যাত্রা। ক্রমশ একঘেয়ে হয়ে উঠছিল দিনগুলো। এমন সময় আবার হল এক মজার কাণ্ড। প্রায় ছ সাত শ ইয়া দাঁড়াঅলা কাঁকড়া আর গলদা চিংড়ির সঙ্গে মোলাকাত। জলের ধারে বসে তারা একটা প্রকাণ্ড বড় লাল পশমের গুলি নিয়ে তার জট খোলার চেষ্টা করছে। জট তো খুলছেই না, বরং আরও পাকিয়ে যাচ্ছে। তিতিবিরক্ত হয়ে ওরা মাঝে মাঝে পশমের গোলাটাকে তাই ল্যাভেণ্ডার আর শাদা মদের ফেনায় চুবিয়ে নিচ্ছে। ব্যাপার-স্যাপার দেখে চার মূর্তি তো হতভম্ব।

কিছুক্ষণ পর ওরা আর চুপ করে থাকতে পারল না। খুব মোলায়েম করে জিগ্যেস করল, ও ভাই কাঁকড়া আর চিংড়ি বন্ধুরা, আমরা কি তোমাদের কোন সাহায্য করতে পারি?

কাঁকড়াদের সর্দার সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিলে, তাহলে তো খুব ভালোই হয়। আমরা কয়েকটা পশমের দস্তানা করতে চাই। কিন্তু মুশকিল কী হয়েছে জানো, আসলে আমরা কেউই জানি না কী করে দস্তানা করতে হয়।

দস্তানা তৈরির ওস্তাদ কারিগর বেগুনি। সে অমনি লাফিয়ে উঠল। বলল, এই কথা! এর জন্যে তোমাদের এতটুকু ভাবনা নেই। আচ্ছা ভাই, তোমাদের ওই দাঁড়া-গুলো খোলা যায়, নাকি একেবারে জোড়া?

সর্দার কাঁকড়া বললে, জোড়া! না, না খোলা যায়। সবগুলোই খোলা যায়।

বলে কাঁকড়ারা তাদের দাঁড়াগুলো খুলে বাড়িয়ে ধরল নৌকোর দিকে।

বেগুনি অমনি চট করে সেই দাঁড়ার ফাঁকে আটকে প্রথমে পশমের জটগুলোকে খুলে ফেলল। তারপর ঝট-পট বুনে ফেলল অনেকগুলো দস্তানা। এত কম সময়ে এমন সুন্দর দস্তানা তৈরী করতে দেখে কাঁকড়া তো থ। ভারী খুশি ওরা দস্তানা পেয়ে। পেছনের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল সব। তারপর পাখির মত নরম

পনের

গলায় গান গাইতে গাইতে চলে গেল।

চলেছে আমাদের ক্ষুদে অভিযাত্রীরাও। অভিজ্ঞতা জমছে তাদের ঝুলিতে। বিশ্বভ্রমণ বলে কথা! ছেলেখেলা নয়ত ব্যাপারটা। এবার কী হতে পারে আন্দাজ করো তো! কিছুতেই পারবে না, বাজি ফেলে বলতে পারি।

এবার এলো ওরা অদ্ভুত চেহারার একটা দ্বীপে, প্রকাণ্ড দ্বীপ, প্রথমে কিছুই নজরে পড়ল না। ওরা হাঁটতে লাগল সেই দ্বীপে। হাঁটতে হাঁটতে চলে গেল অনেক দূর। তারপর হঠাৎ নজরে সেই জিনিসটা। দেখেই থমকে দাঁড়াল। অনেকক্ষণ ধরে দেখেও ঠিক বোঝা গেল না বস্তুটা কী! মনে হল একজন লোক মস্ত বড় একটা শাদা রঙের টুপি মাথায় দিয়ে চেয়ারে বসে আছে। সেই চেয়ারটা নরম কেক আর শামুকের খোলা দিয়ে তৈরী।

বেগুনি বললে, আমার কিন্তু মনে হচ্ছে ওটা কোন মানুষ নয়। শুনে সবাই আর একবার ভালো করে সেদিকে দৃষ্টি দিল। কিন্তু লাভ হল না কিছুই; রহস্যের কোন কিনারাই করা গেল না।

ওদের ভেতর হাট্টিমা-টিম-টিম এর আগে বার কয়েক পৃথিবী ঘুরে এসেছিল। কাজেই তার জ্ঞানগম্যি অনেকটা বেশী। সে হঠাৎ চিৎকার করে বললে, আরে দূর-দূর, ওটা নিশ্চয় একটা বারোয়ারি ফুলকপি।

বারোয়ারি ফুলকপি! সে আবার কোন জন্তুর বাবা! পরখ করে দেখার জন্যে ওরা এক দৌড়ে তার কাছে গেল। হ্যাঁ, ঠিকই—কোন মানুষ নয়, একটা বিরাট ফুলকপি। এতক্ষণ যেটাকে সাদা টুপি বলে মনে হচ্ছিল সেটা কপিটার মাথা। ওর কোন পা নেই; কিন্তু বাঁধাকপির একটা ডাঁটায় তালে তালে ওর দোল খাওয়া দেখে ভাবা যাচ্ছিল, ও বুঝি খুব স্বচ্ছন্দে চলাফেরা করতে পারে। আর বাঁধাকপির ডাঁটায় ঢাকা পড়ে ওর জুতো মোজার খরচটাও বেমালুম বেঁচে যাচ্ছে।

নিশ্চিন্ত হয়ে নৌকোয় ফিরে ওরা সেই অদ্ভুত কপিটাকেই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল। আরে, আরে—ওটা যে হঠাৎ জ্যান্ত হয়ে উঠছে! তালকানা একটা লোকের মতন দুটো শশার উপর আরামে ভর করে ছুটছে দোঁখ ডুবন্ত সূর্যের দিকে। আর তিনটে করে সারি বেঁধে একদল কাদা খোঁচা পাখি চলেছে ওর পিছু পিছু। ঐ যাঃ; ওরা মিলিয়ে গেল পশ্চিম দিগন্তের ধুলো বালির মেঘের আড়ালে।

তাজ্জব এই দৃশ্য দেখতে দেখতে ক্ষুদে অভিযাত্রীদের ভীষণ ক্ষিধে পেয়ে গেল। এই সব মজার জিনিস দেখা কম পরিশ্রমের কাজ নাকি!

যাক গে, এর কিছুদিন পরের ঘটনা বলি। ওরা তখন একটা ঝুলন্ত পাহাড়ের নিচে পৌঁছেছে। ছোট্ট এক-টুকরো একটা পাহাড়। তার ওপরে দাঁড়িয়েছিল কিম্ভূত বিচ্ছিরি চেহারার একটা ছেলে। গোলাপী রঙের জামা গায়ে, মাথায় একখানা দস্তার থালা। কোথাও কিছু নেই ছেলেটা দুম করে এ্যাব্বড় এক কুমড়ো ছুঁড়ে দিল নৌকোটার ওপর। সঙ্গে সঙ্গে নৌকো একেবারে কাৎ! পুরো উল্টে গেল সেটা!

তাতে অবশ্য ওদের তেমন ক্ষতি হল না। সাঁতার ওরা খুব ভালো জানতো। আর এভাবে সাঁতার কাটতে পেয়ে ওদের বরং ভালোই লাগল। চাঁদ না ওঠা পর্যন্ত ওরা এমনি সাঁতার চালিয়ে গেল। তারপর একটু শীত শীত করতে উঠে পড়ল নৌকোয়। উঠে বেশ ক'রে গা হাত পা মুছে ফেলল। এদিকে হাট্টিমা-টিম-টিম করেছে কী! ঠেলতে ঠেলতে কুমড়োটাকে জোরসে পাহাড়টার দিকে পাঠিয়ে দিয়েছিল। পাহাড়টা আসলে ছিল চকমকি পাথরে বোঝাই। কুমড়োর ধাক্কা খেতেই চকমকিগুলো জ্বলে উঠল। গোলাপী জামার বিচ্ছিরি মার্কা সেই ছেলেটা তখনও বসেছিল পাহাড়ের ওপর। প্রথমে আগুনটা সে দেখতে পায় নি—গায়ে গরম আঁচ লাগতে তাকিয়ে দেখে, ওরে বাব্বা! চারদিক দাউদাউ করে জ্বলছে। পালাবার কোন পথই নেই। বেচারীর অমন সাধের জামাটা গেল পুড়ে, নাকটাও গেল বেগুনপোড়া হয়ে।

এরপর বাধল আরেক ঝামেলা। সেটা অবশ্য আরেক জায়গায়। সেখানে কিছুই নেই—কেবল বড় বড় কয়েকটা খাদ আর খাদগুলো বোঝাই তুঁতফলের আচার। এই খাদের মালিক হলদে নাকঅলা বাঁদর। এক-আধটা নয়, অমন হাজার হাজার বাঁদর সেখানে বাস করে। শীতকালের খাবার হিসেবে তারা ওই তুঁতফল একটা জায়গায় জড়ো করে রাখে। প্রচুর সোনামুখী লতাও সেখানে জন্মায়। তুঁতফল আর সেই সোনামুখী লতা দিয়ে বাঁদরগুলো চমৎকার খাবার তৈরি করতে পারে। সে খাবার একবার খেলে তার স্বাদ সারা জীবন ভোলা যায় না।

যাই হোক, ওরা যখন পেঁছুল তখন একটিমাত্র বাঁদর সেখানে ঘুমোচ্ছিল। ঘুম বলে ঘুম—এমন বিচ্ছিরি সুরে ঘোঁৎ-ঘোঁৎ করে তার নাক ডাকছিল যে চার মূর্তি আর তাদের দুই সঙ্গীর আত্মারাম খাঁচাছাড়া হওয়ার দাখিল। সেই বিটকেল, বিদঘুটে আওয়াজে ভয় পেয়ে কোন রকমে মাত্র এককৌটো তুঁতফল নিয়েই ওরা ভোঁ দৌড়।

কিন্তু নৌকোয় ফিরতে গিয়ে চক্ষু ছানাবড়া। নৌকোটার পাত্তাই নেই। মাঠাতোলা বোয়েম আর কেটলিসমেত পুরো নৌকোটাকেই গিলে বসে আছে বিরাট এক মাকড়সা। কী ভয়ঙ্কর চেহারা সেই মাকড়সাটার! তাকালেই ভয়ে দেহের রক্ত জমে আইসক্রীম হয়ে যায়। এতখানি পথ তারা এসেছে, এমন একটা বিকট জীব এর আগে নজরে পড়েনি। ওদের অমন সাধের নৌকোটাকে মাকড়সা তখন তার পঞ্চান্ন লক্ষ কোটি দাঁতের ফাঁকে কড়মড় করে চিবুচ্ছিল। দেখে হাতুড়ি-পেটা, খড়ের-সং,
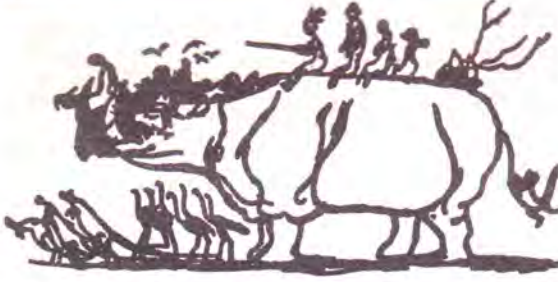
ছবি | এডওয়ার্ড লিয়র

সিংহের-পো আর বেগুনির দারুণ কান্না পেল। হায় রে! পৃথিবী ঘোরা ওদের খতম। এখন অগামারা এই জায়গায় পচে মরতে হবে বাকী জীবনটা।

কখনই না। ওরা ঠিক করল, নৌকো গেছে কুছ-পরোয়া নেই। এবার হাঁটাপথে শুরু করবে অভিযান। পায়ে হেঁটেই এগোতে যাচ্ছিল, এমন সময় এক বুড়ো গন্ডারকে সেখান দিয়ে যেতে দেখা গেল। বাস, চটপট গিয়ে ওরা সেই গন্ডারের পিঠে চেপে বসল। চারজনের বেশী জায়গা হয় না সেখানে—কাজেই হ্যাট্রিমা-টিম-টিম গন্ডারের কান ধরে তার শিংয়ের ওপর গিয়ে চড়ল। আর পুষি বেড়াল? সে ঝুলে পড়ল গন্ডারের লেজ ধরে। দিব্যি দোল খেতে খেতে মজাসে চলল পুষি বেড়াল।

বাহন তো জুটল, কিন্তু খাবার? ওদের কাছে মাত্র চারটে ছোট বরবটি আর সামান্য কিছু আলু ছিল—তাই দিয়ে তো আর পুরো পথটা চলবে না। ভাগ্যের চাকা যখন ঘোরে তখন কোন কিছুতেই আটকায় না। খাবারের জন্যে ওদেরও আটকাল না।

গন্ডারের পিঠে একটা রডোড্রেনডন গাছ গজিয়েছিল, তার বীজ খেতে উড়ে আসত অজস্র মোরগ আর চীনে মুরগি নাম-না-জানা পাখ্‌-পাখালি। ওরা তাদের ইচ্ছে-মত খপাখপ ধরত আর রান্না করে ফেলত। রান্নার জন্যেও কোন চিন্তা ছিল না। গন্ডারের পিঠে বসে বসেই তা করা যেত। কেননা ওর পিঠে একটা জলন্ত উনুনও ছিল আগে থেকেই।

আস্তে আস্তে একদল ক্যাঙ্গারু আর বিরাট বিরাট অনেকগুলো সারস পাখি ওদের সঙ্গী হয়ে গেল। একা-একা চলার দুর্ভাবনাও আর রইল না। রীতিমতন শোভা-যাত্রা করেই এগিয়ে চলল ওদের মিছিল।

চলতে চলতে আঠারো সপ্তার আগেই ওরা নিরাপদে ফিরে এল দেশে। দেশের লোক ওদের ফিরে পেয়ে খুব খুশি। আত্মীয়স্বজন, বন্ধুবান্ধব সবাই এসে আনন্দে জড়িয়ে ধরল ওদের। আর তখুনি ওরা ঠিক করল, খুব শিগ্‌গীরই ফের বেরিয়ে পড়বে বাদবাকী জায়গাগুলো দেখতে। পৃথিবী ঘোরার মতন এমন মজা আর দুটি নেই!

ও, হ্যাঁ, আসল কথাটাই তো বলতে ভুলে যাচ্ছি। সেই বুড়ো গন্ডারটা, যার দৌলতে ওদের যাত্রা শেষ অবধি অতো আরামের হয়েছিল তার কী হল জান? সে মারা যাওয়ার পর তার চামড়া দিয়ে ওরা একটা খড়ের পুতুল বানিয়ে বাইরের ঘরের পাপোশের ওপর সুন্দর করে সাজিয়ে রাখল—ওদের আজব ভ্রমণের স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে।।

ভাষান্তর : শৈলশেখর মিত্র অশোককুমার মিত্র

পিং পং

অন্নদাশংকর রায়

পিং পং
কালিমপং।
ডিং ডং
কালিমপং।
কিং কং
কালিমপং।
সিং সং
কালিমপং।

টিং লিং
দার্জিলিং।
জিং লিং
দার্জিলিং।
মিং লিং
দার্জিলিং।
শিং লিং
দার্জিলিং।

অং বং
কারশিয়ং।
ঠং ঠং
কারশিয়ং।
ঢং ঢং
কারশিয়ং।
লং লং
কারশিয়ং।

ছবি
অরুন্ধতী বসু ॥ ৭ বছর

ময়না কই ?

অজিত দত্ত

রাজকন্যা বলেন, আমার ময়না কই ?
ময়না কোথা কেউ সেকথা কয়না কই।
কোথায় গেলে ময়না পাবো,
ময়না হেন গয়না পাবো,
একলা ঘরে ভয় না পাবো,
আর যাতনা সয় না সই।
ময়না বিনে জীবন তো রয় না সই।

রাজা বলেন, ময়না গেছে, থাক পুষি,
ময়না তো নয়, ভাঁড়ার-খাওয়া রাক্ষুসী।
খায় সে আঙুর, খায় বেদানা,
আক্রা দামে কিনিয়ে আনা,
দই সন্দেশ মাখন ছানা,
দেখছি তো রোজ চাক্ষুষই,
কাঁদিস নে মা, বেড়াল নিয়েই থাক খুশী।

ময়না গেছে, আপদ গেছে, কয় রানী,
একরানী নয়, সব মিলিয়ে ছয় রানী।
ধিঙ্গি মেয়ের বায়না খালি,
আজ নেবে যা, চায় না কালই,
করছে শুধু হায় নাকালই,
বাড়ির লোকের হয়রানি।
বুঝবে মজা নিজেই যদি হয় রানী।

সবাই মিলে জটলা করে ময়না নিয়ে,
রাজা বলেন, শালিখ ধরেই আয় না নিয়ে।
ছয়রানী কয়, পাত্র খুঁজি,
সদয় যদি হন রঘুজী,
বিয়ের কুসুম ফুটলে বুঝি
থাকবে ভুলে গয়না নিয়ে।

তুমুল হলো, সব বাড়িতেই হয় যা নিয়ে।

ছবি
তন্দ্রিমা পত্রী ॥ ৮ বছর

তিন দশা

(তিতিরের জন্য)

বুদ্ধদেব বসু

ছবি
ঊর্মি দাস ॥ ৯ বছর

বয়স তখন বারো—
বন্ধু ছিলো ময়না গিরিশ হাবুল,
মন্টু নিমাই পুতুল,
এবং অনেক আরো।
যেমন খেলে সতেরোটা দাঁত-না-ওঠা
বাচ্চা বেড়াল,
একের ডাকে ঝোপের ফাঁকে হুক্কা হাঁকে
দশটা শেয়াল,
তেমনি সহজ হেলাফেলায় মেলামেশায়
আমরা সবাই মেতেছিলাম এক-বয়সের নেশায়।

বয়স তখন তিরিশ—
হঠাৎ দেখা হ'লে পরে
কেমন যেন লজ্জা করে,
কে জানতো এমন বুদ্ধু গিরিশ!
কে জানতো মন্টু ঘোষাল
আসলে এক ফালতু বাচাল, ওপর-চালাক
ফোঁপরদালাল।
কে জানতো সে হবে এমন নাদুশনুদুশ রঙিন ফানুস,
মুখ থেকে যার বেরোয় শুধু রকমারি আজব শাড়ি
মোটরগাড়ি গয়না—
যে ছিলো সেই মিষ্টি মেয়ে ময়না!

বয়স হ'লো ষাট—
একলা থাকি ঘরের কোণে আপন মনে,
পারতপক্ষে পেরোই না চৌকাঠ।
এখন ভাবি হয়তো সবই আমারই ভুল,
কেউ ছিলো না ময়না গিরিশ মন্টু পুতুল।
থাকতো যদি দেখতে পেতাম মন্টু এমন মন্দ তো নয়,
অন্তত তার ফুলের সঙ্গে আছে প্রণয়,
দেখতে পেতাম ময়না যত ছাড়ুক আওয়াজ
আসলে তার মুঠো দরাজ;
গিরিশ অনেক দুঃখ পেয়েও যায়নি ভুলে হাসতে, ভালো-
বাসতে;
দেখতে পেতাম যত না থাক কালো-কালো গর্তগুলো,
একটু আলো
যে ক'রে হোক চায় বেরিয়ে আসতে।

যেও না

প্রেমেন্দ্র মিত্র

চাঁদে যাও ছাদে যাও,
যাও যেথা যেতে চাও,
ভুঁড়ো কি শুঁটকো দেশ হ্যাংলা।
কিছুতে চেও না যেতে
দায়ে কি হুজুগে মেতে
সেই দেশে, নাম যার 'বাংলা'।

কাজ কী ও ঝামেলায়।
না দেখলে নেই দায়
কে কার ওপরে করে হাম্‌লা।
কানা কালা সেজে যাও,
কেন বা ধরবে ম্যাও?
ভেবে নাও ঘরোয়া ও মামলা!

হয় নাকি কাটাকাটি,
মাথা নিয়ে হুটোপাটি
গেন্ডুয়া খেলে ইয়া ইয়া খান।
ভুট্টো ও টিক্কা
দিচ্ছে পরীক্ষা
কে যে মেজো কে বা সেজো শয়তান

নিকসন মারকিন
চাঁদে যান, যান চীন
বাংলার নামে শুধু ভড়কান!
পিনডি থাকলে খুশী
পিকিং গোটাবে ঘুষি
গোলাগুলি দেন তাই জলপান!

ছবি
কৃত্তিবাস রায় ॥ বয়স পাঁচ

আমাদের কালের খেলাধুলা

অহীন্দ্র চৌধুরী পা দিলেন ছিয়াত্তরে। তাঁর গোপালনগর রোডের বাড়ির দেওয়ালে তাঁর নানা-বয়সের নানা ভূমিকায় অভিনয়ের ছবি। বিকেল সাড়ে পাঁচটার আগে কারু সঙ্গে দেখা করেন না। ইজিচেয়ারে শুয়ে পড়াশুনো করেই তাবৎ সময় কাটান। মন খারাপ হলে মা পঙ্কজিনী চৌধুরী যাঁর বয়েস নব্বই, তাঁর সঙ্গে গল্প করেন। মনোমত সঙ্গী পেলে স্মৃতিচারণও করেন। যেমন ঃ

কিশোর বয়সে লেখাপড়ার বাইরে সবচেয়ে বড় চিন্তা ছিল খেলা। অভিনয়-টভিনয় নয়। অভিনেতা-আমি-র সঙ্গে সেই ছেলেবেলার আমি-র এতটুকুও মিল নেই।

বয়েস তখন কত? ছয়, কি, সাত। আমরা তখন ভবানীপুরে। বাবা ভর্তি করে দিলেন চক্রবেড়িয়া শিশু বিদ্যালয়ে। স্কুলে লেখাপড়ার সঙ্গে খেলা-ধুলোর তোফা বন্দোবস্ত। জিমনাসটিক শেখাতেন এক মাদ্রাজী মাস্টার মশাই। লাইন পড়ে যেত প্যারালেল বার-এর খেলায়। রোজই ব্যায়াম আর ড্রিল করতাম। তাতেও আশ মিটত না। ইণ্ডিয়ান ক্লাবে গিয়ে হালকা মুগুর ভাঁজতাম। সেইসঙ্গে ফুটবলেও নাম লেখালাম।

তখন কলকাতায় ম্যালেরিয়া সংক্রামক। আমিও আক্রান্ত হলাম। শরীর সারাতে দেশ শান্তিপুরে গেলাম। তারপর—জশিডি। দু-বছর কাটল ঘুরে ঘুরেই।

কলকাতায় ফিরে এখন যেখানে গোখ্‌লে স্কুল সেই পোড়াবাজারের লনডন মিশনারিতে (স্কুল-কাম-কলেজ) ক্লাস এইট-এ। শুরু হল আবার খেলা—এবার শুধুই ফুটবল। ১৯০৪ সালের কথা। লনডন মিশনারির সঙ্গে লা মারটিনেয়ার, সেনট জেভিয়ারস ইত্যাদির ম্যাচ লেগেই থাকতো। আমি এমনিতে ফরোয়ার্ডের প্লেয়ার হলেও প্রয়োজনে গোলে পর্যন্ত খেলতাম। আজকালকার মতন জার্সি-টার্সি ছিল না আমাদের। বেশির ভাগই মালকোঁচা মেরে খেলতো। সময়ের কোন মাপ ছিল না, যতক্ষণ দমে কুলোবে ততক্ষণ খেলা।

১৯১১ সাল। মোহনবাগান শিলড জেতায় সে কী উত্তেজনা আর ধুমধাম। কিছুদিন পরেই ইলিয়ট শিলডের খেলা। কলেজের ছাত্র না হলেও লনডন মিশনারিতে পড়ি, সেই সুবাদে কলেজ-টিমের হয়ে মাঠে নামলাম। কিন্তু বেশীক্ষণ খেলতে পারলাম না। মাথায় প্রচণ্ড আঘাত লাগল, কেটেও গেল এমন যে ধরাধরি করে নিয়ে গেল প্রেসি-ডেনসির তাঁবুতে। মোহনবাগানের সুধীর চ্যাটার্জি ছিলেন, ব্যাণ্ডেজ বেঁধে দিয়ে বললেন—এক্ষুনি একে হাসপাতালে নিয়ে যাও।

সুধীরবাবু বড় খেলোয়াড়, তাঁকে মানতাম। কিন্তু হাসপাতালকে মানতে পারলাম না। বললাম, আমার শরীর মুগুরভাঁজা। জিমনাসটিক-করা। এমন কিছু হয়নি। বাড়ি গেলেই সেরে যাবে।

বাড়ি এলাম। এসে তিনদিন শয্যাশায়ী। জীবনে ফুটবলের যবনিকাপাত!

তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় এখন চুয়াত্তর। তাঁর টালা পার্কের বাড়ি যেন একদা সেই সব জমিদার পরি-বারের ছোটখাট একটি আধুনিক সংস্করণ। ছেলে, জামাই, মেয়ে, নাতি-নাতনী নিয়ে ভরা সুখের সংসার। তার মধ্যে যখন তাঁর কালের কথা শোনার জন্যে তাঁকে কেউ ধরে পড়ে, বিশেষ করে নাতি-নাতনীরা, তখন ঃ

আমার কপালে ডান দিকের এই যে বড় কাটা-দাগটা দেখছো, এটা কীসের জান? তখন পড়তাম লাভপুর স্কুলের ফার্স্ট ক্লাশ-এ। গল্প, কবিতা বা উপন্যাস রচনার শাস্তি নয় এটা। হকি খেলার পুরস্কার। ফুটবলের হিরো ছিলাম ফোর্থ ক্লাশ থেকেই। ফার্স্ট ক্লাশ-এ ওঠার পর হঠাৎ একদিন হকি সেট এল স্কুলে। সারা স্কুল তোলপাড়। যারা ফুটবল খেলে, তাদের ডাক পড়ল সকলের আগে। আমরা কয়েকজন তো ডাকেরও অপেক্ষাই করলাম না। ফুটবল খেলতাম ফরওয়ার্ডে
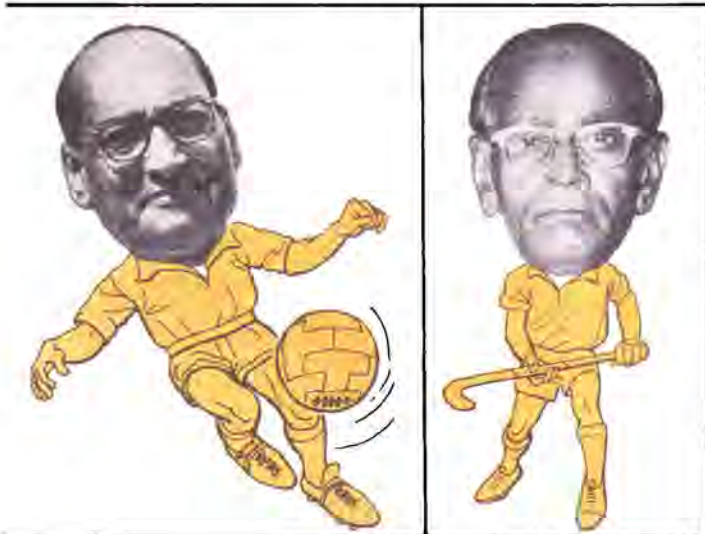
হকিতেও তাই। হকির স্বপ্নে খাওয়া, ঘুম, পড়াশুনো সব শিকেয় উঠল। তিনদিন কাটল এই ভাবে। চতুর্থ দিন স্কুল ছুটির পর আবার মাঠে নামলাম। জোর খেলা চলছে। হঠাৎ বিপক্ষ দলের একটি ছেলে রং-সাইডে স্টিক চালান। আর লাগবি তো লাগ আমার নাকে, মুখে, কপালে। দরদর রক্ত ঝরছে। জামা ভিজে লালে লাল। আমাকে চ্যাংদোলা করে নিয়ে গেল বাইরে। ব্যাণ্ডেজ বাঁধল নাকে, মুখে, কপালে। বাড়ি ফিরলাম রাত্রে। কিন্তু কোনরকম বকুনি খেতে হয়নি। খেলার সঙ্গে পড়াশুনো ঠিকমত করলে খেলার ব্যাপারে বরং উৎসাহ পাওয়া যেত।

একটু সারতেই আবার নামলাম মাঠে ব্যাণ্ডেজ নিয়েই। না নেমে উপায়ও ছিল না। বন্ধুরা বলল, তুই না খেললে আমাদের টিম বড় উইক হয়ে যাবে। তবে ওই অবস্থায় ফরওয়ার্ডের বদলে গোলে দাঁড়ালাম। বেশ মনে পড়ছে সেদিন ডি পি আই এসেছিলেন আমাদের স্কুল পরিদর্শনে। সাহেব-মানুষ। গোলের কাছে এসে আমার সঙ্গে আলাপ জুড়লেন। আমিও সুযোগ পেয়ে ভাঙা-ভাঙা ইংরিজিতে বুঝিয়ে দিলাম, আহত হলেও আমার না খেললে উপায় নেই! আমাদের টিমের আমিই ব্যাকবোন! দলের হিরো।

শিল্পী ও ভাস্কর **দেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরীকে** দেখে মনেই হয় না তাঁর বয়স বাহাত্তর। প্রথম দর্শনেই মনে হবে এখনও নিয়মিত শরীরচর্চা করেন। মাদ্রাজের আরট কলেজে অধ্যক্ষ থাকার সময়, সেখানে কুস্তির আখড়াও একটা খুলেছিলেন। এই বয়সে এখনও সকাল দশটা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত কাজ করেন। গত ছ বছর ধরে একনাগাড়ে এগারটি বিরাট শহীদ মূর্তি তৈরিতে ব্যস্ত। তারই এক অবসরে ঃ

আমার বাল্য আর কৈশোরের স্কুল-পালানো, লেখাপড়া-না-করার ঘটনা শুনলে এখনও আমাকে যারা ভালচোখে দেখে, তারাও দূরে সরিয়ে দেবে। তবু, সত্যিকথা বলতে আমার দ্বিধা নেই।

ষাট-পঁয়ষট্টি বছর আগের ঘটনা। আমার মামা তাজহাটের (রংপুর) রাজাবাহাদুর গোপাললাল রায়ের চৌরঙ্গী লেনের বাড়িতে থাকতাম আমি। ভর্তি হলাম ওয়েলিংটন স্কোয়ারের উত্তরপূব কোণে খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশনে। কিন্তু পড়াশুনোয় একফোঁটা মন বসতো না। প্রায়ই যেতাম তাজহাটে মামাবাড়ি। বয়স তখন এগার। মামার

নানা ধরনের রাইফেল আর বন্দুক নিয়ে টার্গেট প্র্যাকটিশ করতাম। শুটিং প্র্যাকটিশ হত চিতা মেরে। ঘোড়ার স্যাড্‌লে পা পৌঁছাত না তবু বন্দুক রাইফেল ভাল না লাগলে মামার ঘোড়া নিয়ে ছুটতাম এ-গ্রাম সে-গ্রামে। রোজ শরীরচর্চার মধ্যে ছিল দু মাইল দৌড়। বিলিতি প্রথায় কুস্তির কসরৎ আর ডন-বৈঠক। প্রতিদিন দেড়ঘণ্টা করে কাটত এতে। বাড়ির কুস্তির আখড়ায় বাবা সেকালের দুই বিখ্যাত পালোয়ান চেৎ সিং ও হীরাদৎকে মাইনে করে রেখে দিয়েছিলেন। শরীরচর্চার পর বাবা জিগ্যেস করতেন, কতখানি ঘাম বেরিয়েছে।

আগেই বলেছি খেলাৎচন্দ্র ইনস্টিটিউশন ছাড়ার পর কয়েক বছর উড়নচণ্ডী ছিলাম। নানা মূর্তি বানানো ছাড়া রাস্তায় ঘুরে বাঁশি বাজানো, সার্কাসে সাইকেলের খেলা দেখানোও তখন পেয়ে বসেছে।

এই সব নেশা চরমে, বাবা ভর্তি করে দিলেন সাউথ সুবারবন স্কুলে। সেখানেই বা কে আটকায়? স্কুল পালিয়ে চলে যেতাম গঙ্গায়। বড় বড় নৌকার ওপর থেকে ডাইভ দিতাম, সাঁতার কাটতাম। সেইসঙ্গে শুরু হল এবার ফুটবল। রাইট-ইনে খেলতাম। প্রথমে ছিলাম টেলিগ্রাফ স্টোর ইয়ার্ডে, তারপর ন্যাশনালে, অবশেষে এরিয়ানে। এতেও মন ভরলা না। মামা চালাতেন তাজহাট টিম। আমি ওদিকে নিউ বয়েজ ক্লাব পত্তন করলাম। কলকাতায় আমি তখন নিউ বয়েজের টপ স্কোরার। বল নিয়ে আমার সঙ্গে অত জোরে কেউ ছুটতে পারত না। বিপক্ষ দলগুলো সবচেয়ে ভয় করত আমার কর্নার কিক্‌কে। ঠিক সাড়ে সাত ফুট উঁচু হয়ে বল তীরবেগে সোয়ারভ করে গোলে ঢুকত।

প্রোফেসর
হিজিবিজ্‌বিজ্‌
সত্যজিৎ রায়
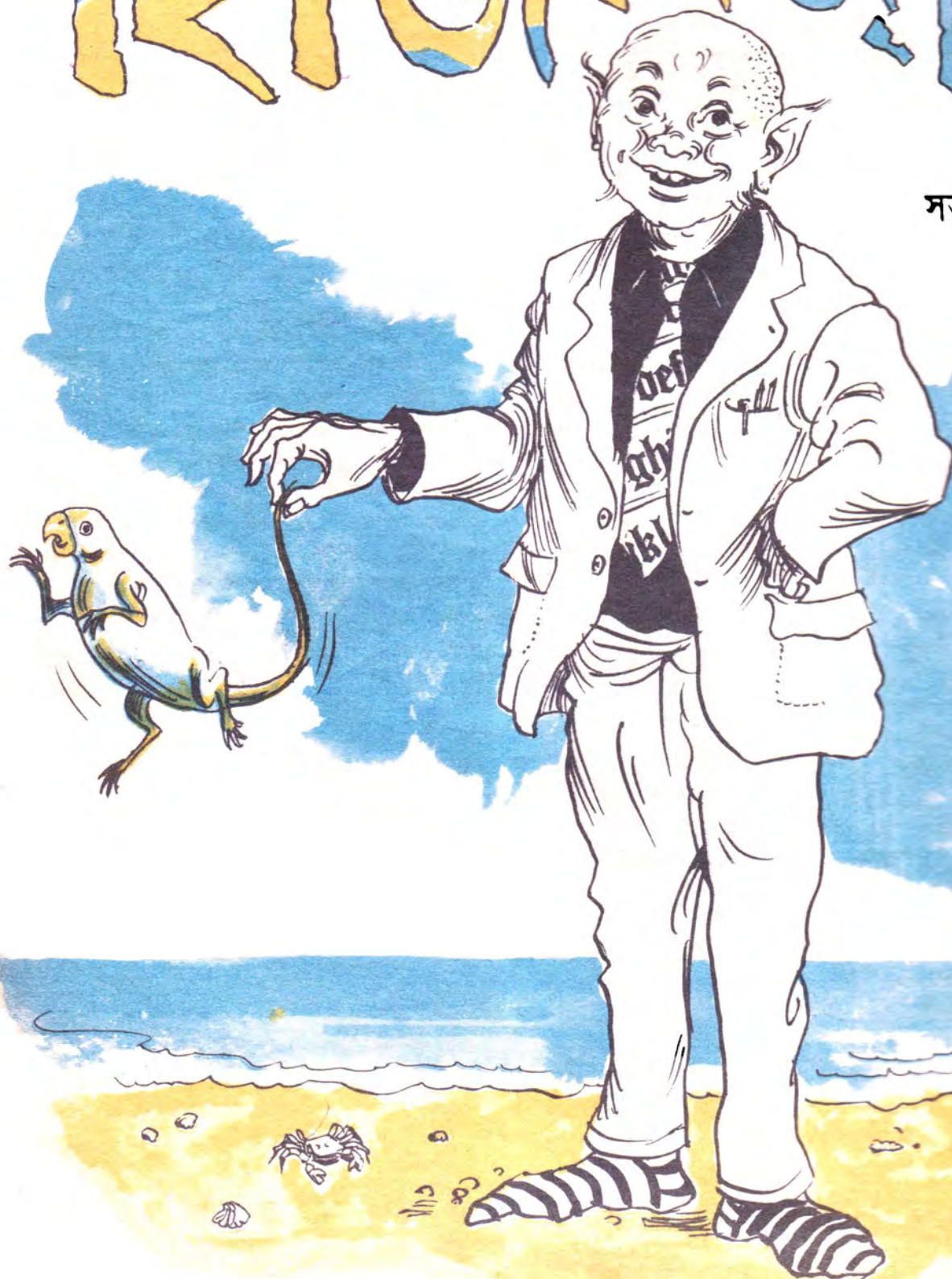
আমার ঘটনাটা কেউ বিশ্বাস করবে বলে বিশ্বাস হয় না। না করুক—তাতে কিছু এসে যায় না। নিজে চোখে না দেখা অবধি অনেকেই অনেক কিছু বিশ্বাস করে না। যেমন ভূত। আমি অবিশ্যি ভূতের কথা লিখতে বসিনি। সত্যি বলতে কি, এটাকে যে কিসের ঘটনা বলা চলে সেটা আমি নিজেই জানি না। কিন্তু ঘটনাটা ঘটেছে, আর আমার জীবনেই ঘটেছে। তাই আমার কাছে সেটা সত্যি। আর তাই সেটার বিষয় লেখা আমার কাছে খুবই স্বাভাবিক।

আগেই বলে রাখি, যাকে নিয়ে এই ঘটনা তাঁর আসল নামটা আমি জানি না। তিনি বললেন তাঁর কোনো নামই নেই। শুধু তাই না, নাম নিয়ে একটা ছোটখাটো লেকচারই দিয়ে ফেললেন আমাকে। বললেন—

'নাম দিয়ে কী হবে মশাই? নাম একটা ছিল এককালে। সেটার আর প্রয়োজন নেই বলে বাদ দিয়ে দিয়েছি। আপনি এলেন, আলাপ করলেন, নিজের নামটা বললেন, তাই নামের প্রশ্নটা উঠছে। এমনিতে কেউ ত আসে না, আর তার মানে কারুর আমাকে নাম ধরে ডাকার প্রয়োজনও হয় না। চেনাশোনা কেউ নেই, কাউকে চিঠি-পত্র লিখি না, কাগজে লেখা ছাপাই না, ব্যাঙ্কে চেক সই করি না—কাজেই নামের প্রশ্নটাই আসে না। একটা চাকর আছে, সেটাও বোবা। বোবা না হলেও সে নাম ধরে ডাকত না। বলত বাবু। ব্যস্, ফুরিয়ে গেল। এখন কথা উঠতে পারে আপনি কী বলে ডাকবেন। এটা নিয়েই ভাবছেন ত?...'

শেষটায় অবিশ্যি তাকে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্ বলে ডাকাই ঠিক হল। কেন, সেটা পরে সময় মতো বলছি। আগে একটু গোড়ার কথা বলে নেওয়া দরকার।

ঘটনাটা ঘটে গোপালপুরে। উড়িষ্যার গঞ্জাম ডিস্ট্রিক্টে বহরমপুর স্টেশন থেকে দশ মাইল দূরে সমুদ্রের ধারে একটি ছোট্ট শহর গোপালপুর। গত তিন বছর আপিসের কাজের চাপে ছুটি নেওয়া হয়নি। এবার তিন সপ্তাহের ছুটি নিয়ে এই না-দেখা অথচ নাম-শোনা জায়গাটাতেই যাওয়া স্থির করলাম। আপিসের কাজের বাইরে আমার আরেকটা কাজ আছে, সেটা হল অনুবাদের কাজ। আজ পর্যন্ত আমার করা সাতখানা ইংরিজি রহস্য উপন্যাসের বাংলা অনুবাদ বাজারে বেরিয়েছে। প্রকাশক বলেন বইগুলোর কাটতি ভালো। কতকটা তাঁরই চাপে নিতে হয়েছে ছুটিটা। এই তিন সপ্তাহের মধ্যে একটা গোটা বই অনুবাদ করার দায়িত্ব আমার স্কন্ধে রয়েছে।

গোপালপুরে আগে কখনো আসিনি। বাছাইটা যে ভালোই হয়েছে সেটা প্রথম দিন এসেই বুঝেছি। এমন নিরিবিলি অথচ মনোরম জায়গা কমই দেখেছি। নিরিবিলি আরো এই জন্যে যে এটা হল অফ্ সীজন—এপ্রিল মাস। হাওয়া-বদলের দল এখনো এসে পৌঁছায়নি। যে হোটেলে এসে উঠেছি, তাতে আমি ছাড়া আছেন আর একটি মাত্র ব্যক্তি—এক বৃদ্ধ আর্মেনিয়ান—নাম মিস্টার অ্যারাটুন। তিনি থাকেন হোটেলের পশ্চিম প্রান্তের একটা ঘরে, আর আমি থাকি পুব প্রান্তে। হোটেলের লম্বা বারান্দার ঠিক নীচ থেকেই শুরু হয়েছে বালি; একশো গজের মধ্যেই সমুদ্রের ঢেউ এসে সেই বালির উপর আছড়ে পড়ছে। লাল কাঁক্‌ড়াগুলো মাঝে মাঝে বারান্দায় উঠে এসে ঘোরাফেরা করে। আমি ডেক-চেয়ারে বসে দৃশ্য উপভোগ করি আর লেখার কাজ করি। সন্ধ্যায় ঘণ্টা দুয়েকের জন্য কাজ বন্ধ রেখে বালির উপর হাঁটতে বেরোই।

প্রথম দুদিন সমুদ্রের তীর ধরে পশ্চিম দিকটায় গেছি; তৃতীয় দিন মনে হল একবার পুব দিকটাতেও যাওয়া দরকার। বালির ওপর আদ্যিকালের নোনাধরা পোড়ো বাড়িগুলো ভারী অদ্ভুত লাগে। মিস্টার অ্যারাটুন বলছিলেন এগুলো নাকি প্রায় তিন-চারশ বছরের পুরোন। এককালে গোপালপুর নাকি ওলন্দাজ-দের একটা ঘাঁটি ছিল। এ সব বাড়ির বেশির ভাগই নাকি সেই সময়কার। দেয়ালের ইঁটগুলো চ্যাপ্টা আর ছোট ছোট দরজা জানালার বাকি রয়েছে শুধু ফাঁকগুলো, আর ছাত বলতেও ছাউনির চেয়ে ফাঁকটাই বেশি। একটা বাড়ির ভিতর ঢুকে দেখেছি। ভারী থমথমে মনে হয়।

পুব দিকে কিছুদূর গিয়ে দেখলাম এক জায়গায় বালির অংশটা অনেকখানি চওড়া হয়ে গেছে, আর তার ফলে শহরটাও সমুদ্র থেকে অনেকটা পিছিয়ে গেছে। প্রায় সমস্ত জায়গাটা জুড়ে কাৎ করে শোয়ানো রয়েছে অন্তত শ' খানেক নৌকো। বুঝলাম এইগুলোতেই নুলিয়ারা সকালে সমুদ্রে মাছ ধরতে বেরোয়। নুলিয়া-গুলোকেও দেখলাম এখানে ওখানে বসে জটলা করছে, কিছু বাচ্চা নুলিয়া আবার জলের কাছটাতে গিয়ে কাঁকড়া ধরছে, খানচারেক শুয়োর এদিকে ওদিকে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে বেড়াচ্ছে।

এরই মধ্যে আবার দেখলাম একটা উপুড় করা নৌকোর ওপর বসে আছেন দুটি প্রৌঢ় বাঙালী ভদ্র-লোক। একজনের চোখে চশমা, তিনি হাতে একটি বাঙলা খবরের কাগজ হাওয়ার মধ্যে ভাঁজ করতে গিয়ে হিমসিম খেয়ে যাচ্ছেন। আরেকজন বুকের কাছে হাত দুটোকে জড়ো করে একদৃষ্টে সমুদ্রের দিকে চেয়ে বিড়ি খাচ্ছেন। আমি একটু কাছে যেতে কাগজওয়ালা ভদ্র-লোকটি সেধে আলাপ করার ভঙ্গিতে বললেন—

'নতুন এলেন?'

'হ্যাঁ...এই...দুদিন...'

'সাহেব হোটেলে উঠেছেন?'

আমি একটু হেসে বললাম, 'আপনারা এখানেই থাকেন?'

ভদ্রলোক এতক্ষণে কাগজটাকে সামলাতে পেরেছেন। বললেন, 'আমি থাকি। ছাব্বিশ বচ্ছর হল গোপালপুরে।

নিউ বেঙ্গলিটা আমারই হোটেল। ঘনশ্যামবাবু অবিশ্যি আপনারই মতো চেঞ্জে এসেছেন।'

আমি 'আচ্ছা' বলে আলাপ শেষ করে এগোতে যাবো এমন সময় ভদ্রলোক আরেকটা প্রশ্ন করে বসলেন—

'ওদিকটায় যাচ্ছেন কোথায়?'

বললাম, 'এমনি...একটু বেড়াব আর কি।'

'কেন বলুন ত?'

আচ্ছা মুশকিল ত। বেড়াতে যাচ্ছি কেন সেটাও বলতে হবে?

ভদ্রলোক ইতিমধ্যে উঠে দাঁড়িয়েছেন। আলো কমে আসছে। আকাশের উত্তর-পশ্চিম কোণে একটা কালচে নীল মেঘের চাবড়া জমাট বাঁধছে। ঝড় হবে নাকি?

ভদ্রলোক বললেন, 'বছরখানেক আগে হলে কিছু বলার ছিল না। যেখানে মন চায় নির্ভয়ে ঘুরে আসতে পারতেন। গত সেপ্টেম্বরে পূবদিকে নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে মাইলখানেক দূরে একটি প্রাণী এসে আস্তানা গেড়েছেন। ওই পোড়োবাড়িগুলো দেখছেন, ওরই মতন একটা বাড়িতে। আমি অবিশ্যি নিজে দেখিনি সে বাড়ি। এখানকার পোস্টমাস্টার মহাপাত্র বলছিল দেখেছে।'

আমি জিগ্যেস করলাম, 'সাধু-সন্ন্যাসী গোছের কেউ?'

'আদপেই না।'

'তবে?'

'তিনি যে কী, সেটা মশাই জানতে পারিনি। মহাপাত্র বললে বাড়িটার ফাটাফুটো নাকি সব তেরপল দিয়ে ঢেকে ফেলেছে। ভেতরে কী হয় কেউ জানে না। তবে ছাতের একটা ফুটো দিয়ে বেগুনে ধোঁয়া বেরোতে দেখা গেছে। বাড়িটা না দেখলেও, লোকটাকে আমি নিজে দেখেছি দুবার। আমি ঠিক এইখেনটেতেই বসে, আর ও হেঁটে যাচ্ছিল আমার ঠিক সামনে দিয়েই। পরনে হলদে রঙের কোট প্যান্টুলুন। গোঁফ দাড়ি নেই, মাথায় গুচ্ছের ঝাঁকড়া চুল। হাঁটবার সময় কী জানি বিড়বিড় করছিল আপন মনে। এমনকি একবার যেন গলা ছেড়ে হাসতেও শুনলুম। কথা বললুম, কথার জবাব দিলে না। হয় অভদ্র, নয় পাগল। বোধহয় দুটোই। ওনার আবার একটি চাকরও আছে। তাকে অবিশ্যি সকালের দিকটায় বাজারে দেখা যায়। এমন ষণ্ডা মার্কা লোক দেখিনি মশাই। মাথায় কদম ছাঁট চুল। ঘাড়ে গর্দানে চেহারা। কতকটা ওই শুয়োরের মতোই। লোকটা হয় বোবা নয় মুখ বন্ধ করে থাকে। জিনিস কেনার সময়ও মুখ খোলে না। দোকানদারকে হাত দিয়ে দেখিয়ে বুঝিয়ে দেয়। মনিব যেমন লোকই হোক না কেন, অমন চাকর যে বাড়িতে আছে, তার কাছাকাছি না যাওয়াটাই বুদ্ধিমানের কাজ নয় কি?'

ঘনশ্যাম ভদ্রলোকটিও ইতিমধ্যে উঠে পড়েছেন। বিঁড়িটাকে বালির ওপর ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে বললেন, চলুন মশাই।' দুই ভদ্রলোক তাঁদের হোটেলের দিকে রওনা দেবার আগে ম্যানেজারবাবুটি জানিয়ে গেলেন যে তাঁর নাম রাধাবিনোদ চাটুজ্যে, এবং আমি একবার তাঁর হোটেলে পায়ের ধুলো দিলে তিনি খুবই খুশী হবেন।

রহস্য গল্প অনুবাদ করে করে রহস্য সম্পর্কে যে একটা স্বাভাবিক আকর্ষণ আমার মনে গড়ে উঠেছে সেটাত আর নিউ বেঙ্গলি হোটেলের ম্যানেজারবাবু জানেন না! আমি বাড়ি ফেরার কথা একবারও চিন্তা না করে পূবদিকেই আরো এগোতে লাগলাম।

এখন ভাটার সময়। সমুদ্রের জল পিছিয়ে গেছে। ঢেউও অল্প। পাড়ের যেখানে এসে ঢেউ ফেনা কাটছে, তার কাছেই কয়েকটা কাক লাফালাফি করছে, ফেনা-গুলো সরসর করে এগিয়ে এসে পিছিয়ে যাচ্ছে, আর তারপরেই ফেনার বুড়বুড়িতে ঠোকর দিয়ে কাকগুলো কী যেন খাচ্ছে। নুলিয়া গ্রাম ছাড়িয়ে মিনিট দশেক হাঁটার পর দূর থেকে ভিজে বালির ওপর একটা চলন্ত লাল চাদর দেখে প্রথমটা বেশ হকচকিয়ে গিয়েছিলাম; কাছে গিয়ে বুঝলাম সেটা একটা কাঁকড়ার পাল, জল সরে যাওয়াতে দলে বলে তাদের বাসায় ফিরে যাচ্ছে।

আর পাঁচ মিনিট পথ যেতেই বাড়িটাকে দেখতে পেলাম। তেরপলের তাপ্পির কথা আগেই শুনেছিলাম, তাই চিনতে অসুবিধা হল না। কিন্তু কাছে গিয়ে দেখি শুধু তেরপল নয়, বাঁশ, কাঠের তক্তা, মর্চে ধরা করুগেটেড টিন, এমনকি পেস্ট বোর্ডের টুকরো পর্যন্ত বাড়ি মেরামতের কাজে ব্যবহার করা হয়েছে। দেখে মনে হল, এক যদি ছাত ভেদ করে বৃষ্টির জল না পড়ে, তাহলে এ বাড়িতে একজন লোকের পক্ষে থাকা এমন কিছু অসম্ভব নয়। কিন্তু সেই লোকটা কোথায়?

মিনিটখানেক দাঁড়িয়ে থেকে মনে হল, সে যদি সত্যিই ছিটগ্রস্ত হয়, আর তার যদি সত্যিই একটা ষণ্ডা মার্কা চাকর থেকে থাকে, তাহলে আমি যেভাবে উগ্র কৌতূহল নিয়ে বাড়িটার দিকে হাঁ করে চেয়ে দেখছি, সেটা বোধহয় খুব বুদ্ধিমানের কাজ হচ্ছে না। তার চেয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে অন্যমনস্কভাবে পায়চারি করলে কেমন হয়? আন্দুর এসে লোকটাকে একবার অন্তত চোখের দেখা না দেখেই ফিরে যাব?

এই সব ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ খেয়াল হল যে বাড়ির সামনের দরজার ফাঁকটার পিছনে অন্ধকারের মধ্যে কী যেন একটা নড়ে উঠল। আর তারপরেই একটি ছোটখাট্টো বেঁটে লোক বাইরে বেরিয়ে এলো। বুঝতে বাকি রইল না যে ইনিই বাড়ির মালিক, আর ইনি বেশ কিছুক্ষণ থেকেই অন্ধকারের সুযোগ নিয়ে আমাকে পর্যবেক্ষণ করছিলেন।

'আপনার হাতে যে ছ'টা আঙুল দেখছি! —হেঃ হেঃ!' হঠাৎ মিহি গলায় কথা এলো।

কথাটা ঠিকই। আমার হাতে বুড়ো আঙুলের পাশে

জন্ম থেকেই একটা বাড়তি আঙুল রয়েছে যেটা কোনো কাজ করে না। কিন্তু ভদ্রলোক অতদূর থেকে সেটা বুঝলেন কী করে?

এবার আরো কাছে এলে পর বুঝলাম তাঁর হাতে রয়েছে একটা আদ্যিকালের একচোখো দূরবীণ, আর সেইটে দিয়েই নির্ঘাৎ এতক্ষণ তিনি আমাকে স্টাডি করছিলেন।

'অন্যটা নিশ্চয়ই বুড়ো আঙুল? তাই নয় কি? হেঃ হেঃ!'

ভদ্রলোকের গলার স্বর অত্যন্ত মিহি। এত বয়সের লোকের এমন গলা আমি কক্ষনো শুনিনি।

'আসুন না—বাইরে দাঁড়িয়ে কেন, হেঃ হেঃ!'

কথাটা শুনে আমি রীতিমতো অবাক হলাম। রাধা-বিনোদবাবুর কথায় আমার লোকটা সম্পর্কে একেবারে অন্য রকম ধারণা হয়েছিল। এখন দেখছি দিব্যি খোশ-মেজাজী ভদ্র ব্যবহার।

আমার চেয়ে এখনো হাত দশেক দূরে দাঁড়িয়ে ভদ্রলোক। সন্ধের আলোতে তাঁকে ভালো করে দেখতে পাচ্ছিলাম না, অথচ দেখার ইচ্ছেটাও প্রবল, তাই তাঁর অনুরোধে আপত্তি করলাম না।

'একটু সাবধানে, আপনি লম্বা মানুষ, আমার দরজাটা আবার...'

হেঁট হয়ে মাথা বাঁচিয়ে ভদ্রলোকের আস্তানায় প্রবেশ করা গেল। একটা পুরোন মেটে গন্ধর সঙ্গে সমুদ্রের স্যাঁতসেঁতে গন্ধ আর আরেকটা কী জানি অচেনা গন্ধ মিশে এই পাঁচমেশালি জোড়াতালি বাড়ির সঙ্গে বেশ খাপ খেয়ে গেছে।

'বাঁদিকে আসুন। ডানদিকটা আমার—হেঃ হেঃ—কাজের ঘর।'

ডানদিকের দরজার ফাঁকটা দেখলাম একটা বড়ো কাঠের তক্তা দিয়ে বেশ পোক্তভাবেই বন্ধ করা রয়েছে। আমরা বাঁদিকের ঘরে ঢুকলাম। এটাকে বোধহয় বৈঠক-খানা বলা চলে। এক কোণে একটা কাঠের টেবিলের উপর কিছু মোটা মোটা খাতাপত্র, গোটাতিনেক কলম, একটা দোয়াত, একটা আঠার শিশি, একটা বড় কাঁচি। টেবিলের সামনে একটা মর্চে ধরা টিনের চেয়ার, এক পাশে একটা বড় উপুর করা প্যাকিং কেস, আর ঘরের ঠিক মাঝখানে একটা বিরাট চেয়ার। এই শেষের আসবাবটি থাকা উচিত ছিল কোনো রাজবাড়ির বৈঠকখানায়। জাঁদরেল কাঠের উপর জাঁদরেল কারুকার্য, বসবার জায়গায় গাঢ় লাল মখমলের ওপর ফুলকারি।

'আপনি ওই বাক্সটায় বসুন, আমি চেয়ারে বসছি।'

এই প্রথম একটা খট্‌কা লাগল। লোকটা বদ্ধ পাগল না হলেও, একটু বেয়াড়া রকমের খামখেয়ালি ত বটেই। তা না হলে একজন বাইরের লোককে নিজের বাড়িতে ডেকে এনে প্যাকিং বাক্সে বসতে দিয়ে নিজে সিংহাসনে বসে?

অথচ জানালায় তেরপলের ফাঁক দিয়ে আসা সন্ধ্যার আলোতে ত তার চোখে কোনো পাগলামির লক্ষণ দেখছি না। বরং বেশ একটা ছেলেমানুষী হাসি-খুশি ভাব। আর সেই কারণেই লোকটার বেয়াড়া অনুরোধ সত্ত্বেও তাঁর উপর কোনো বিরক্তির ভাব এল না। আমি প্যাকিং কেসটার উপরেই বসলাম।

'তারপর বলুন,' ভদ্রলোক বললেন।

কী বলব? আসলে ত কিছুই বলতে আসিনি, শুধু দেখতেই এসেছিলাম, তাই ফস্ করে বলুন বললে বেশ মুশকিলেই পড়তে হয়। শেষটায় আর কিছু ভেবে না পেয়ে নিজের পরিচয়টাই দিয়ে ফেললাম—

'আমি এসেছি ছুটিতে, কলকাতা থেকে। আমি, মানে, একজন লেখক। আমার নাম হিমাংশু চৌধুরী। এদিকে এসেছিলাম বেড়াতে...আপনার বাড়িটা চোখে পড়ল...'

'বেশ বেশ। পরিচয়টা পেয়ে খুশি হলাম। তবে আমার কিন্তু নাম-টাম নেই।'

আবার খট্‌কা। নাম নেই মানে? নাম ত একটা সকলেরই থাকে; এনার বেলায় তার ব্যতিক্রম হবে কেন?

কথাটা তাঁকে জিগ্যেস করাতেই ভদ্রলোক নামের উপর লেকচারটা দিয়ে দিলেন। সেটা শেষ হবার পর আমাকে চুপ করে থাকতে দেখে ভদ্রলোক মুচ্‌কি হেসে বললেন, 'আমার কথাগুলো বোধহয় আপনার মনঃপুত হল না। একটা কথা তাহলে বলি আপনাকে—আমি নিজে কিন্তু মনে মনে আমার একটা নাম ঠিক করে রেখেছি। অবিশ্যি এ নামটা কাউকে বলিনি; কিন্তু আপনার কিনা ছ'টা আঙুল, তাই আপনাকে বলতে আপত্তি নেই।'

আমি ভদ্রলোকের দিকে চেয়ে রইলাম। ঘরে আলো ক্রমশঃ কমে আসছে। চাকরটাকে দেখছি না কেন? অন্তত একটা মোমবাতি বা কেরোসিনের আলো ত এই সময় ঘরে এনে রাখা উচিত।

ভদ্রলোক এবার হঠাৎ তার মাথাটা একপাশে ঘুরিয়ে বললেন, 'আমার কানটা লক্ষ্য করেছেন কি?'

এতক্ষণ করিনি, কিন্তু এবার চোখ পড়তেই চমকে উঠলাম।

মানুষের এরকম কান আমি কক্ষনো দেখিনি। উপর দিকটা গোল না হয়ে ছুঁচোল—ঠিক যেমন শেয়াল কুকুরের হয়। এরকম হল কী করে?

কান দেখিয়ে আমার দিকে ফিরে ভদ্রলোক হঠাৎ আরেকটা তাজ্জব ব্যাপার করে বসলেন। তাঁর নিজের মাথার চুলটা ধরে দিলেন এক টান, আর তার ফলে সেটা হাতে খুলে এল। অবাক হয়ে দেখি—এক ব্রহ্মতালুর কাছে আর কানের পাশটাতে ছাড়া সারা মাথার কোথাও এক গাছি চুল নেই। এই নতুন চেহারা, আর তার সঙ্গে

মিটিমিটি চাহনিতে দুষ্টু হাসির ভাব দেখে আমার মুখ থেকে আপনা থেকেই একটা নাম বেরিয়ে পড়ল—'হিজিবিজ্‌বিজ্‌!'

'এগ্‌জ্যাকটলি!' ভদ্রলোক হাততালি দিয়ে খিল্‌খিল্‌ করে হেসে উঠলেন। 'আপনি ইচ্ছে করলে ছবির সঙ্গে মিলিয়ে দেখতে পারেন।'

বললাম, 'দরকার নেই। হিজিবিজ্‌বিজের চেহারা ছেলেবেলা থেকেই মনে গেঁথে আছে।'

'বেশ, বেশ, বেশ! আপনি চান ত স্বচ্ছন্দে এ নামটা ব্যবহার করতে পারেন। এমনকি নামটার আগে একটা প্রোফেসর জুড়ে দিলে আরো ভালো হয়। অবিশ্যি এটা কাউকে বলবেন না। যদি বলেন তাহলে কিন্তু—হেঃ হেঃ হেঃ...'

এই প্রথম যেন আমার একটু ভয় ভয় করতে লাগল। লোকটা নিঃসন্দেহে পাগল। কিম্বা বেয়াড়া রকমের ছিটগ্রস্ত। এ ধরনের লোককে বরদাস্ত করা ভারী কঠিন। সব সময়ই কী বলবে কী করবে ভেবে তটস্থ হয়ে থাকতে হয়।

দুজনের এক সঙ্গে চুপ করে থাকাটাও ভালো লাগছিল না; তাই বললাম, 'আপনার কানের ছুঁচোল অংশটার রং একটু অন্য রকম বলে মনে হচ্ছে?'

'তাত হবেই,' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটাত আর আমার নিজের নয়। জন্মের সময় ত আর আমার এরকম কান ছিল না।'

'তাহলে কি ওটা আপনার চুলের মতোই নকল? টানলে খুলে আসবে নাকি?'

ভদ্রলোক আবার সেই খিল্‌খিলে হাসি হেসে বললেন, 'মোটেই না, মোটেই না, মোটেই না!'

নাঃ। লোকটা নির্ঘাৎ পাগল। বললাম, 'তাহলে ওটা কী?'

'দাঁড়ান। আগে আমার চাকরের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দিই। একেও হয়ত আপনি চিনতে পারবেন।'

এতক্ষণ লক্ষ্য করিনি; কোন ফাঁকে জানি আরেকটি লোক পিছনের দরজাটার ঠিক বাইরে এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে একটা কেরোসিনের বাতি। এই সেই চাকর, যার কথা রাধাবিনোদবাবু বলেছিলেন।

ভদ্রলোক হাতছানি দিয়ে ডাকলে পর সে নিঃশব্দে ঘরে ঢুকে টেবিলের উপর কেরোসিনের বাতিটা রাখল। সত্যিই, এরকম ষণ্ডামার্কা লোক এর আগে দেখেছি বলে মনে পড়ে না। লোকটার গায়ে একটা ডোরাকাটা ফতুয়া, আর একটা খাটো করে পরা ধুতি। পায়ের গুলি, হাতের মাস্‌ল, কব্‌জির বেড়, বুকের ছাতি আর গর্দানের বহর দেখলে স্তম্ভিত হতে হয়। অথচ লম্বায় লোকটা পাঁচ ফুট দু-তিন ইঞ্চির বেশি নয়।

'কারুর কথা মনে পড়ছে কি আমার চাকরকে দেখে?' জিগ্যেস করলেন হিজিবিজ্‌বিজ্‌।

লোকটা বাতি নামিয়ে রেখে তার মনিবের দিকে ফিরে আদেশের অপেক্ষায় চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে। মিনিটখানেক তার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ মিলটা মনে পড়ে গেল। অবাক হয়ে বললাম, 'আরে, এ যে ষষ্ঠিচরণ!'

'ঠিক ধরেছেন, ঠিক ধরেছেন!' ভদ্রলোক খুশিতে বসে বসেই নেচে উঠলেন।

'খেলার ছলে ষষ্ঠিচরণ হাতি লোফেন যখন তখন
দেহের ওজন উনিশটি মণ, শক্ত যেন লোহার গঠন...

অবিশ্যি ওর ওজন ঠিক উনিশ মণ নয়, সাড়ে তিনের একটু বেশি। অন্তত সিক্সটি সেভেনে তাই ছিল। আর হাতি লোফাটার কথা জানি না, কিন্তু এখানে এসে অবধি প্রতিদিন সকালে ও দুটো আস্ত ধেড়ে শুয়োর নিয়ে লোফালুফি করে, এটা আমি নিজের চোখে দেখেছি। এই যে আমার চেয়ারটা, এটাত ও এক হাতে তুলে নিয়ে এসেছে।'

'কোত্থেকে?'

'হেঃ হেঃ হেঃ হেঃ—সেটা আর নাই শুনলেন। যাও ত ষষ্ঠি—দুটো ডাব নিয়ে এস ত আমাদের জন্য।'

ষষ্ঠি আজ্ঞা পালন করতে চলে গেল।

বাইরে মেঘের গর্জন। একটা দম্‌কা হাওয়ায় তেরপলগুলো পট্‌পট্‌ শব্দে নড়ে উঠল। এইবারে না উঠলে দুর্যোগে পড়তে হতে পারে।

'আমার কানটার কথা জিগ্যেস করছিলেন না?' ভদ্রলোক বললেন, 'ওটা আসলে একটা বনবেড়ালের কান আর আমার ওরিজিন্যাল কান মিশিয়ে তৈরি।'

কথাটা শুনে হাসিই পেয়ে গেল। বললাম, 'মেশালেন কী করে?'

ভদ্রলোক বললেন, 'কেন—একটা মানুষের হৃৎপিণ্ড আরেকটা মানুষের শরীরে বসিয়ে দিচ্ছে, আর একটা জানোয়ারের আধখানা মাত্র কান একটা মানুষের কানের ওপর বসিয়ে দেওয়া যাবে না?'

'আপনি কি আগে ডাক্তারি করতেন? প্লাস্টিক সার্জারি জাতীয় কিছু?'

'তাত বটেই। করতাম কেন—এখনো করি, হেঃ হেঃ। তবে সে যেমন তেমন প্লাস্টিক সার্জারি নয়। এই যেমন ধরুন—আপনার ওই যে বাড়তি বুড়ো আঙুলটা—ওটা যদি আপনার না থাকত, তাহলে প্রয়োজনে ওটা লাগিয়ে দেওয়া আমার পক্ষে হত জলের মতো সোজা।'

লোকটাকে অনেক চেষ্টা করলাম বড় ডাক্তার হিসেবে কল্পনা করতে, কিন্তু কিছুতেই পারলাম না। অথচ কানটার দিকে চোখ গেলে সত্যিই ভারী অদ্ভুত লাগছিল। কী বেমালুমভাবে জোড়া লাগিয়েছে! বোঝার কোনো উপায়ই নেই।

ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি আর বিজ্ঞানের বই ছাড়া

জীবনে কেবল মাত্র দুটি বই পড়েছি আমি—আবোল-তাবোল আর হ-য-ব-র-ল। আর দুটোর মধ্যেই যে ব্যাপারটা আমার সবচেয়ে মনে ধরেছে সেটা হচ্ছে ওই প্রাণীগুলো—যাদের বলা হয় আজগুবি কিম্ভূত। এই যে সাধারণের বাইরে কিছু হলে, বা করলে, বা বললেই যে লোকে পাগলামি আর আজগুবি বলে উড়িয়ে দেয় এটার কোনো মানেই হয় না। আমি ছেলেবেলা মোমবাতি চুষে খেতাম জানেন। দিব্যি লাগে খেতে। আর মাছি যে কত খেয়েছি ধরে ধরে তার কোনো গোনা গুন্‌তি নেই।'

ষষ্ঠিচরণ ডাব নিয়ে এসেছে, তাই ভদ্রলোককে একটু থামতে হল। দুটো কলাইকরা গেলাস টেবিলের উপর রেখে তার উপর একটার পর একটা ডাব ধরে দু হাতের তেলো দিয়ে চাপ দিতেই সেগুলো মট্‌ মট্‌ করে ভেঙে ভেতরের জল পড়ল গিয়ে ঠিক গেলাসের ভেতর। ষষ্ঠিচরণ আমাদের হাতে গেলাস ধরিয়ে দিল।

ডাবের জলে চুমুক দিয়ে ভদ্রলোক বললেন, 'ডাক্তারি পড়ে প্লাস্টিক সার্জারিতে স্পেশালাইজ করলাম কেন বলুন তো।'

'কেন?' আমার কৌতূহল বাড়ছিল। সেটা আর কিছুই না—ভদ্রলোকের কল্পনার দৌড় কদ্দুর সেটা জানবার জন্যে।

হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বললেন, 'কারণ, শুধু ছবি দেখে মন ভরত না। খালি ভাবতাম এমন জানোয়ার যদি সত্যি করে থাকত। কোথাও না কোথাও যে আছেই ওসব প্রাণী, সে বিষয়ে আমার কোনো সন্দেহ ছিল না। কিন্তু আমি তাদের চাইছিলাম আমার ঘরের মধ্যে, আমার হাতের কাছে, আমার চোখের সামনে, বুঝেছেন।'

আমি বললাম, 'না মশাই, বুঝিনি। কোন্‌ সব প্রাণীর কথা বলছেন আপনি?'

'এই ধরুন—বকচ্ছপ, কি গিরগিটিয়া, কি হাঁসজারু।'

বললাম, 'বুঝেছি। তারপর?'

'তারপর আর কী। শুরু করলাম গিরগিটিয়া দিয়ে। দুটোই হাতের কাছে ছিল। টিয়ার মুড়ো আর গিরগিটির ল্যাজ। ঠিক যেমন বইয়ে আছে। প্রথম বাজিতেই কিস্তি মাৎ। বেমালুম জোড়া লেগে গেল। কিন্তু জানেন—'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে এক মুহূর্ত চুপ করে থেকে বললেন, 'বেশিদিন বাঁচল না। খেতেই চায় না কিছু! না খেলে বাঁচবে কী করে? আসলে যা লেখা আছে সেটাই ঠিক—শরীরে শরীরে মিলে গেলেও মনের সন্ধিটা হতে চায় না। তাই এখন ধড়ে-মুড়ো সন্ধিটা ছেড়ে অন্য এক্সপেরিমেন্ট ধরেছি।'

ভদ্রলোক হঠাৎ কেমন যেন অন্যমনস্ক হয়ে পড়লেন। ভাগ্যে ডাব খেতে দিয়েছে! চা বিস্কুট হলে সাহস করে মুখে পোরা যেত না। ষষ্ঠিচরণ কোথায় গেল কে জানে। একটা খুট্‌খাট্ শব্দ পাচ্ছি। যেদিক থেকে আসছে, তাতে মনে হয় হয়ত ভদ্রলোক যেটাকে তার কাজের ঘর বললেন, তার দরজাটা খোলা হচ্ছে।

বাইরে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করেছে। মেঘের গুড়্গুড়ুনিটাও ভালো লাগছে না। আর বসা যায় না। ফিরে গিয়ে কাজে বসতে হবে। ভদ্রলোককে ধন্যবাদ দিয়ে উঠে পড়লাম।

'চললেন? কিন্তু আপনার কাছে যে একটা জিজ্ঞাস্য ছিল।'

'বলুন—'

'ব্যাপার কী জানেন—সবই জোগাড় হয়েছে—সজারুর কাঁটা, রামছাগলের সিং, সিংহের পেছনের দুটো পা, ভাল্লুকের লোম, সব কিছুই। কিন্তু খানিকটা অংশ যে আবার মানুষের—আর সেখানে ত ছবির সঙ্গে মিল থাকা উচিত, তাই নয় কি? সেরকম মানুষ আপনার চোখে কেউ পড়েছে কিনা জানতে পারলে সুবিধে হত।'

এই বলে ভদ্রলোক তার টেবিলের উপর রাখা খাতা-পত্রের নীচ থেকে একটা আদ্যিকালের আবোল-তাবোল বার করে সেটার একটা পাতা খুলে আমার চোখের সামনে ধরলেন। চেনা ছবি অবশ্যই। হাতে মুগুর নিয়ে একটা অদ্ভুত প্রাণী একটি পলায়নরত গোবেচারা মানুষের দিকে কটমট করে চেয়ে আছে—

ভয় পেয়ো না ভয় পেয়ো না—তোমায় আমি মারব না,
সত্যি বলছি তোমার সঙ্গে কুস্তি করে পারব না...

'কেমন চমৎকার হবে বলুন ত এমন একটি প্রাণী তৈরি করতে পারলে! কিছুই না—তোড়জোড় সব হয়েই আছে, তলার দিকের খানিকটা জোড়াও লেগে গেছে, এখন দরকার কেবল একটি এই রকম চেহারার মানুষ।'

আমি বললাম, 'অত গোলগোল চোখ কি মানুষের হয়?'

'আলবৎ!' ভদ্রলোক প্রায় লাফিয়ে উঠলেন। 'চোখ ত গোলই হয়! চোখের পাতা দিয়ে গোলের অনেকটা ঢাকা থাকে বলে অতটা গোল মনে হয় না।'

আমি দরজার দিকে রওনা দিলাম। একে পাগল, তায় নাছোড়বান্দা, তায় আবার কথার ঝুড়ি।

'ঠিক আছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্, কাউকে নজরে পড়লে জানাব।'

'অতি অবশ্যই জানাবেন। বড্ড উপকার হবে। আমি অবিশ্যি নিজেও খুঁজছি। আপনি কোথায় উঠেছেন সেটা বললেন না ত?'

শেষের প্রশ্নটা না শোনার ভান করে অন্ধকারে বেরিয়ে পড়লাম। আর বেরিয়েই দৌড়। ভিজতে আপত্তি নেই, কিন্তু ঝড়ের সঙ্গে যে বালি ওড়ে সেটা নাকে চোখে ঢুকে বড় বিশ্রী অসুবিধার সৃষ্টি করে।

কোনোরকমে হাত দুটো মুখের সামনে ধরে চোখটাকে বাঁচিয়ে হোটেলে যখন ফিরেছি তখন বৃষ্টি শুরু হয়ে গেছে। ঘরে ঢুকে সুইচ টিপে দেখি বাতি জ্বলছে না। বারান্দায় বেরিয়ে হাঁক দিয়ে বেয়ারাকে ডাকতে যাবো, কিন্তু সেটার আর প্রয়োজন হল না। বেয়ারা মোমবাতি নিয়ে আমার ঘরের দিকেই আসছে। কী ব্যাপার জিগ্যেস করতে বলল, বেশি ঝড় বৃষ্টি হলে বাতি নিভে যাওয়াটা নাকি গোপালপুরে একটা খুব সাধারণ ব্যাপার।

আটটার মধ্যে খাওয়া শেষ করে খাটে বসে টিমটিমে আলোতে লেখার কাজ শুরু করতে গিয়ে বুঝতে পারলাম মনোযোগে ব্যাঘাত ঘটছে। মনটা বার বার চলে যাচ্ছে প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজের দিকে। তিনশো বছরের পুরোন ঝুরঝুরে বাড়িতে জোড়াতালি দিয়ে (এখানেও সেই আবোল-তাবোলের থুড়থুড়ে বুড়িটার কথাই মনে পড়ে!) কী ভাবে রয়েছে লোকটা! বদ্ধ পাগল না হলে কি কেউ এরকম করে? আর ষষ্ঠিচরণ? কোত্থেকে এমন এক ষাঁড়ের মতো চাকর জোগাড় করলেন তিনি? আর সত্যিই কি তিনি ওই পুবদিকের বন্ধ ঘরটায় একটা

অদ্ভুত কিছু করছেন? লোকটার কথার কতটা সত্যি আর কতটা মিথ্যে? পুরোটাকেই অবশ্য পাগলের প্রলাপ বলে উড়িয়ে দেওয়া যেত, কিন্তু গোলমাল করছে ওর ওই কান দুটো। ওগুলো যে শুধু বেমালুম ভাবে জোড়া হয়েছে তা নয়; আসবার সময় কেরোসিনের আলোতে লক্ষ্য করলাম একটা কানের ছুঁচোল অংশটাতে আবার একটা ফোস্‌কা পড়েছে। তার মানে সে কান শরীরেরই অংশ, আর শরীরের অন্য সব জায়গার মতো সেখানেও শিরা আছে, স্নায়ু আছে, রক্ত চলাচল আছে, সবই আছে।

সত্যি, যতই ভাবছি ততই মনে হচ্ছে যে ওই কানটা না থাকলে যেন অনেকটা নিশ্চিন্ত হতে পারতাম।

* * *

পরদিন সকালে সাড়ে পাঁচটায় ঘুম থেকে উঠে দেখি রাতারাতি মেঘ কেটে গেছে। চা খেতে বসে হিজিবিজ্‌-বিজের কথা মনে হতে হাসি পেল। ব্যাপারটা আর কিছুই না—আবছা অন্ধকারে কেরোসিনের আলোয় অর্ধেক দেখেছি, অর্ধেক কল্পনা করেছি। হোটেলে ফিরে এসেও পেয়েছি সেই একই অন্ধকার, তাই মন থেকে খট্‌কার ভাবটা কাটবার সুযোগ পাইনি। আজ বালির উপর সকালের রোদ আর শান্ত সমুদ্রের চেহারা দেখে মনে হল লোকটা খ্যাপা ছাড়া আর কিছুই না।

পায়ের তলায় গোড়ালির কাছে একটা চিন্‌চিনে ব্যথা অনুভব করছিলাম। পরীক্ষা করে দেখলাম একটা জায়গায় ছোট্ট একটা কাটার দাগ। বুঝলাম কাল অন্ধকারে বালির উপর দিয়ে দৌড়ে আসার সময় ঝিনুক জাতীয় কিছুর আঁচড় লেগেছে। সঙ্গে ডেটল আয়োডিন কিছুই আনিনি, তাই নটা নাগাৎ একবার বাজারের দিকে গেলাম।

বাজার যাবার রাস্তাটা নিউ বেঙ্গলি হোটেলের সামনে দিয়ে গেছে। হোটেলের সামনেই বারান্দায় কালকের ঘনশ্যামবাবুকে দেখলাম একজন ফেরিওয়ালার কাছ থেকে একটা প্রবাল নিয়ে নাড়াচাড়া করে দেখছেন। আমার পায়ের আওয়াজ শুনে ভদ্রলোক মুখ তুললেন, আর তুলতেই আমার বুকের ভিতরটা ধড়াস্‌ করে উঠল।

এ যে সেই আবোল-তাবোলের মুখ—যে মুখের খোঁজ করছেন ওই উন্মাদ প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্‌!

কোনো সন্দেহ নেই : সেই থ্যাবড়া নাকের নীচে দু পাশে ছিট্‌কে থাকা লম্বা পাকা গোঁফ, লম্বা গলার দু পাশে ঠিক ছবির মতো করে বেরিয়ে থাকা শিরা, এমনকি চ্যাপ্টা থুৎনির নীচে কয়েক গাছা মাত্র চুলের ছাগ্‌লা দাড়িটা পর্যন্ত। আসলে কাল কেন জানি লোকটার হাবভাব পছন্দ হয়নি বলে ওর মুখের দিকে ভালো করে তাকাইনি। আজকে চোখাচুখিটা হল বটে, আর আমি একটা নমস্কারও করলাম, কিন্তু ভদ্রলোক দেখলাম সেটা গ্রাহ্যই করল না। ভারী অভদ্র।

কিন্তু তাও লোকটার জন্য দুশ্চিন্তা হল। ওই পাগলের খপ্পরে কখনই পড়তে দেওয়া যায় না একে। হিজিবিজ্‌বিজ্‌ বা তার চাকর যদি একে দেখে, তাহলে নির্ঘাৎ বগলদাবা করে নিয়ে যাবে ওই ঝুরঝুরে বাড়িতে। আর তারপর যে কী করবে সেটা মা গঙ্গাই জানেন।

ঠিক করলাম বাজার ফেরতা একবার রাধাবিনোদ-বাবুর সঙ্গে দেখা করে তাঁকে ব্যাপারটা খুলে বলব। তাঁকে সাবধান করে দেবো তাঁর হোটেলের একমাত্র অতিথিকে যেন তিনি একটু চোখে চোখে রাখেন।

কিন্তু ডেটল কিনতে কিনতেই আমার সঙ্কল্পটা যেন আপনা থেকেই বাতিল হয়ে গেল। রাধাবিনোদ-বাবুকে যে সব উদ্ভট কথা আমাকে বলতে হবে, সেগুলো কি তিনি বিশ্বাস করবেন? মনে ত হয় না। এমন কি সে সব শুনে শেষটায় হয়ত আমাকেই পাগল বলে ঠাউরাবেন। তাছাড়া আমি যে তাঁর নিষেধ অগ্রাহ্য করে হিজিবিজ্‌বিজের বাড়ি গেছি, সেটাও নিশ্চয় তাঁর মনঃপুত হবে না।

ফেরার পথে আরেকবার ঘনশ্যামবাবুকে দেখে মনে হল—আমার চোখে যাকে ওই ছবির মতো মনে হচ্ছে, হিজিবিজ্‌বিজের চোখে সেটা নাও হতে পারে। সুতরাং যতটা ভয়ের কারণ আছে বলে ভাবছি, আসলে হয়ত ততটা নেই। কাজেই বুদ্ধিমানের কাজ হবে এদের কিছু না বলা, আর প্রোফেসরকেও ঘনশ্যামবাবু সম্বন্ধে কিছু না বলা। এবার থেকে শুধু পশ্চিম দিকটায় বেড়াতে যাবো, আর বাকি সময়টা হোটেলের ঘরে বসে লেখার কাজ করব।

হোটেলে ফিরতেই বেয়ারা বলল একটি ভদ্রলোক

আমার খোঁজে এসেছিলেন। আমাকে না পেয়ে তিনি নাকি একটা চিঠি লিখে রেখে গেছেন।

অত্যন্ত খুদে খুদে প্রায় পিঁপড়ের মতো অক্ষরে লেখা চিঠিটা হচ্ছে এই—

প্রিয় ষড়াঙ্গুল মহাশয়,

আজ সন্ধ্যাবেলা অবশ্যই একবার আমার গৃহে আসিবেন। সিংহের পশ্চাৎভাগের সহিত সজারুর কাঁটা এবং ভাল্লুকের লোম নিখুঁৎভাবে জোড়া লাগিয়াছে। মুদ্গরও একটি তৈয়ার হইয়াছে চমৎকার। শৃঙ্গ তিনটি মস্তকের অপেক্ষায় আছে। এখন শুধুমাত্র মস্তক ও হস্তদ্বয় সংগ্রহ হইলেই হয়। ষষ্ঠিচরণ জনৈক ব্যক্তির সন্ধান আনিয়াছে; মূল চিত্রের সহিত তাহার নাকি যথেষ্ট সাদৃশ্য। আশা করি আজই আমার পরীক্ষা সফল হইবে। অতএব সন্ধ্যায় একবার কিংকর্তব্যবিমূঢ়ে পদার্পণ করিলে যারপরনাই আহ্লাদিত হইব।

ইতি ভবদীয়

এইচ্, বি, বি

মনে পড়ল বাড়ির নাম কিংকর্তব্যবিমূঢ় রাখার কথাটা হ-য-ব-র-লতে হিজিবিজ্‌বিজ্‌ই বলেছিল। চিঠিটা পড়ে মনে আবার দুশ্চিন্তা দেখা দিল, কারণ মন বলছে ষষ্ঠিচরণ হয়ত ঘনশ্যামবাবুকেই দেখেছে।

সারা দুপুর যতদূর সম্ভব মন দিয়ে লেখার কাজ করলাম। বিকেলের দিকে ঝোড়ো হাওয়া বইতে শুরু করল। বারান্দায় ডেক চেয়ারে বসে সমুদ্রের দিকে দেখতে দেখতে মনটা অনেকটা হালকা হয়ে এল। উত্তর-পশ্চিম থেকে হাওয়া এসে এগিয়ে আসা ঢেউগুলোর গায়ে লাগছে, আর তার ফলে ঢেউয়ের মাথার ফেনাগুলো টুকরো টুকরো হয়ে হাওয়ায় ছড়িয়ে পড়ছে। বেশ লাগছে দেখতে।

ছ'টা নাগাৎ হঠাৎ দেখি রাধাবিনোদবাবু কেমন একটা উদ্‌ভ্রান্ত ভাব নিয়ে বালির উপর দিয়ে হন্তদন্ত ভাবে আমাদের বারান্দার দিকে এগিয়ে আসছেন। ভদ্রলোক কাছে এসে হাঁপাতে হাঁপাতে বললেন—

'আমার সেই গেস্টটিকে কি এদিক দিয়ে হেঁটে যেতে দেখেছেন?

'কে, ঘনশ্যামবাবু?'

'আরে হ্যাঁ, মশাই। কাল যেখানে ছিলুম আমরা, সেখানেই ওয়েট করার কথা আমার জন্য। এখন এসে দেখছি নেই। কাছাকাছির মধ্যে একটা লোক নেই যাকে জিগ্যেস করি। এদিকে আমার হোটেলেও হ্যাঙ্গামা—আমার সোনার ঘড়িটি চুরি গেছে—চাকরটাকে জেরা করতে দেরি হয়ে গেল। আপনার এদিক দিয়ে যায়নি বোধ হয়?'

আমি চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়লাম।

'না, এদিক দিয়ে যায়নি,' আমি বললাম, 'তবে একটা সন্দেহ হচ্ছে আমার। একটা জায়গায় গেলে হয়ত খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। আপনার হাতের লাঠিটা বেশ মজবুত ত?'

রাধাবিনোদবাবু থতমত খেয়ে বললেন, 'লাঠি? হ্যাঁ...তা...লাঠি ত আমার সেই ঠাকুরদার...কাজেই...'

আমার সঙ্গে আর কিছুই নেই—একটা করাত মাছের দাঁত কিনেছিলাম প্রথম দিন এসেই, সেইটে সঙ্গে নিয়ে নিলাম। অন্য হাতে নিলাম আমার টর্চটা।

পূবদিকে যাচ্ছি দেখে রাধাবিনোদবাবু ধরা গলায় বললেন, 'নুলিয়া বস্তি ছাড়িয়ে যাবেন কি?'

'হ্যাঁ। তবে বেশি দূর নয়—মাইল খানেক।'

সারা রাস্তা রাধাবিনোদবাবু শুধু একটি কথাই বার তিনেক বললেন—'কিছুই বুঝতে পারছি না মশাই।'

প্রায় দেড় মাইল পথ সঙ্গে এক প্রৌঢ়কে নিয়ে বালির উপর দিয়ে হেঁটে যেতে লেগে গেল ঘণ্টাখানেক। সন্ধ্যা হয়ে গেছে। বাড়ির কাছ অবধি না যাওয়া পর্যন্ত তাতে কেউ আছে কি না বোঝা অসম্ভব। বাড়িটার দিকে যতই এগোচ্ছি ততই দেখছি রাধাবিনোদবাবুর উৎসাহ কমে আসছে। শেষটায় দশ হাত দূরে পৌঁছে হঠাৎ একেবারে থেমে গিয়ে বললেন, 'আপনার মতলবটা কী বলুন ত?'

বললাম, 'অ্যাদ্দুরই যখন এলেন, তখন আর মাত্র দশটা হাত যেতে আপত্তি কিসের?'

অগত্যা ভদ্রলোক এগিয়ে গেলেন আমার পেছন পেছন।

বাড়ির সামনে এসে টর্চ জ্বালতে হল, কারণ ভিতরে দুর্ভেদ্য অন্ধকার। কালকের কেরোসিনের বাতি

এতক্ষণে জ্বলে যাবার কথা, কিন্তু জ্বলেনি।

সামনের দরজা দিয়ে ভেতরে ঢুকে টর্চের আলোতে প্রথমেই দেখলাম একটা লোক মাটিতে হুমড়ি দিয়ে পড়ে আছে। লোকটা মরেনি, কারণ তার বিশাল বুকটা নিশ্বাসে প্রশ্বাসে ওঠানামা করছে।

'এ যে সেই চাকরটা!' ঘড়ঘড়ে গলায় বলে উঠলেন, রাধাবিনোদবাবু।

'আজ্ঞে হ্যাঁ। ষষ্ঠিচরণ।'

'আপনি নামটাও জানেন নাকি?'

এ কথার উত্তর না দিয়ে প্রথম বৈঠকখানায় ঢুকলাম। ঘর খালি। প্রোফেসরের কোনো চিহ্নই নেই। সেখান

থেকে বেরিয়ে গেলাম কাজের ঘরের দিকে।

দরজাটা অর্ধেক খোলাই ছিল। ষষ্ঠিচরণকে ডিঙিয়ে তবে ভেতরে ঢুকতে হল।

বৈঠকখানার মতোই ঘরের আয়তন। একদিকে টেবিলের ওপর স্তূপীকৃত সরঞ্জাম—শিশি বোতল, কাঁটা-ছুরি, ওষুধপত্র ইত্যাদি। একটা উগ্র গন্ধে ঘরটা ভরে রয়েছে। এ গন্ধ আমি চিনি। ছেলেবেলায় চিড়িয়াখানায় জন্তুর খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে এ গন্ধ পেয়েছি।

'আরে—সে লোকটার পাঞ্জাবীটা রয়েছে দেখছি এখানে!' রাধাবিনোদবাবু চেঁচিয়ে উঠলেন।

আজই সকালে পাঞ্জাবীটা আমিও দেখেছি। তিন কোয়ার্টার হাতা ব্রাউন রঙের পাঞ্জাবী, বুকে সাদা বোতাম। এটা যে ঘনশ্যামবাবুরই পাঞ্জাবী তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

আর এই পাঞ্জাবীর পকেটে হাত ঢুকিয়ে এই ছমছমে অবস্থাতেও রাধাবিনোদবাবু চমকে উঠে হাঁপ ছাড়লেন। তিনি তাঁর সোনার ঘড়ি ফিরে পেয়েছেন।

'কিন্তু এখানে এসব কী হচ্ছে বলুন ত। কিসের সরঞ্জাম ওগুলো? পাঞ্জাবী রয়েছে, পকেটে ঘড়ি রয়েছে, কিন্তু সে ব্যাটা মানুষটা গেল কোথায়? আর সে বুড়োটাই বা কোথায় গেল?'

বললাম, 'বাড়ির ভেতরে যে নেই সেটা ত বোঝাই যাচ্ছে। চলুন বাইরে।'

ষষ্ঠিচরণ এখনো অজ্ঞান। তাকে আবার ডিঙিয়ে পেরিয়ে আমরা বাড়ির বাইরে বালির উপর এলাম। এবারে সমুদ্রের দিকে চাইতেই আবছা অন্ধকারে একটা মানুষকে দেখতে পেলাম। সে এই দিকেই আসছে। আরেকটু কাছে আসতে হাতের টর্চটা জ্বালিয়ে তার উপর ফেললাম। প্রোফেসর হিজিবিজ্‌বিজ্।

'ষড়াণ্ডুল মশাই কি?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ—আমি হিমাংশু চৌধুরী।'

'আরেকটু আগে এলেন না!' ভদ্রলোক যেন গভীর আক্ষেপের সঙ্গে কথাটা বললেন।

'কেন বলুন ত?' জিগ্যেস করলাম।

'ও ত চলে গেল! ছবির মতো মানুষ পেলুম। এক ঘণ্টায় জোড়া লেগে গেল, দিব্যি চলে ফিরে বেড়াল, পরিষ্কার কথা বলল, ষষ্ঠিচরণ ভয় পাচ্ছিল বলে ওর মাথায় মুগুরের বাড়ি মারল, আর তারপর চলে গেল সোজা সমুদ্রের দিকে। একবার ভাবলুম ডাকি, কিন্তু নাম ত নেই, কী বলে ডাকব!...মানুষের মাথা, সিংহের পা, সজারুর পিঠ, রামছাগলের সিং...অথচ জলে যে গেল কেন সেটা বুঝতেই পারলাম না...'

কথাটা বলতে বলতে ভদ্রলোক তাঁর অন্ধকার বাড়ির ভেতর ঢুকে গেলেন। আমার হাতের টর্চটা এতক্ষণ তাঁর উপর ফেলা ছিল, এখন হাতটা নীচে নামতে চোখে পড়ল বালির উপর পায়ের ছাপ। টাট্‌কা পায়ের ছাপ। পা ত নয়, থাবা।

ছাপ ধরে আলো ফেলে এগিয়ে গেলাম। ক্রমে ভিজে বালি এলো, তাতে ছাপ আরো গভীর। কাঁকড়ার গর্তের পাশ দিয়ে, অজস্র ঝিনুকের ওপর দিয়ে থাবার ছাপ ক্রমে জলের দিকে গিয়ে সমুদ্রে হারিয়ে গেছে।

এতক্ষণে রাধাবিনোদবাবু কথা বললেন।

'সবই ত বুঝলুম। ইনি ত বদ্ধ পাগল, আপনি হয়ত হাফ-পাগল, কিন্তু আমার হোটেলের বাসিন্দা ওই বাট-পাড়টা গেল কোথায়?'

হাত থেকে করাত মাছের দাঁতটা জলে ফেলে দিয়ে হোটেলের দিকে পা বাড়িয়ে বললাম, 'সেটা না হয় পুলিশকে তদন্ত করতে বলুন। পাঞ্জাবীটা যখন এখানে পাওয়া গেছে, তখন এখানেই দেখতে বলুন। তবে আমার আশঙ্কা হচ্ছে যে রহস্যের কুলকিনারা করতে গিয়ে পুলিশবাবাজীরও শেষটায় না আমার দশাই হয়—অর্থাৎ কিংকর্তব্যবিমূঢ়।'

ছবি এঁকেছেন সত্যজিৎ রায়

জীবনকে মধুরতর করে ক্যাডবেরিস্ !
Cadbury's
MILK
CHOCOLATE
CADBURY'S MILK
খাঁটি দুধের তৈরী ক্যাডবেরিস্ চকোলেট —
বাড়ীর সবারই মনেরমত জিনিষ আর এটি যেমন
স্বাদিষ্ট তেমনি পুষ্টিকর। প্রত্যেকের প্রিয় স্বাদের জন্য
এই চকোলেট বিভিন্ন রকমে পাওয়া যায় !
প্রতিটি চকোলেট
দুধের গুণে ভরপুর !
AIYARS.C.74 BN

শান্তিনিকেতনের ইসকুলে
ছোটদের পড়ানোর ফাঁকে
অদ্ভুত সব ধাঁধা তৈরী করে
রবীন্দ্রনাথ তাদের সঙ্গে মজা করতেন।
মুখে মুখে বানানো সেই সবেরই
একটি বলা গেল নিচে।

উপরে দেখছো দুটিমাত্র অক্ষর।
তার মধ্যে 'কা' কাটা, থেকেও নেই।
'ডা' আছে কিন্তু বেঁকে কাত হয়ে। আসলে,
সংকেতে ভয়ংকর একটি লোকের নাম।
কী নাম, বলো তো! পারছো না?
আচ্ছা, আমরা তোমাদের একটু সাহায্য করি।
আমরা খবর নিয়ে ওই ভয়ংকর লোকটি
কোথায় থাকে জানতে পেরেছি। উহুঁ,
এমনিতে বলা যাবে না। রবীন্দ্রনাথের মতন
সংকেতেই সেটা বলা গেল ...এবার?

সিদ্ধ পুরুষ

সুবোধ ঘোষ

রামগড় থেকে রাজপুর কলিয়ারীতে যাবার সড়কে একুশ মাইল-স্টোনের কাছে এসেই হঠাৎ ব্রেক কষে ছুটন্ত জীপ গাড়ির দুরন্ত আবেগ থামিয়ে দিল লোকনাথ, কলিয়ারীর এনজিনিয়র চরণবাবুর ছেলে।

লোকনাথ বললে—দেখবেন তো চলুন, অডিটারবাবু। এখানে একজন সিদ্ধপুরুষ থাকেন।

—সিদ্ধপুরুষ?

লোকনাথ—হ্যাঁ, একজন খাঁটি সিদ্ধপুরুষ। উনি গাছের ভাষা বোঝেন, গাছের সঙ্গে কথা বলেন। গাছেরা, যত শাল, কেঁদ, মহুয়া আর পিয়ালেরা ও'কে খুব ভালবাসে। সবচেয়ে বেশি ভালবাসে একটি আমগাছ।

সড়ক থেকে সামান্য একটু দূরে, যেখানে ফাঁকা শালবনের পাশে মুণ্ডাদের গাঁয়ে মাদল বাজছে আর অনেক-পুরনো কয়েকটা ইটখোলার ধ্বংসের গায়ে শেয়ালকাঁটার জঙ্গলের উপর হলদে প্রজাপতি উড়ে বেড়াচ্ছে, সেখানে একটা একলা আমগাছের ছায়ার কাছে ছোট্ট একটা ঘর; ইটের দেয়াল আর খাপ্‌রার চালা। লোকনাথ বললে—ওই, ওই ঘরটাই হলো সিদ্ধপুরুষের আস্তানা।

—চল, দেখে আসি।

সড়ক থেকে নেমে, ফাঁকা শালডাঙ্গার চোরকাঁটা মাড়িয়ে সেই ঘরের দিকে যেতে যেতে লোকনাথ বললে—এই সিদ্ধপুরুষের বয়স তিনশো বছরের বেশী ছাড়া কম নয়। কলিয়ারীর কম্পাসবাবু বলেন, অন্তত পাঁচশো বছর হবে। ঠিক কবে আর কোথা থেকে তিনি এখানে এসে আস্তানা করলেন, তা কেউ ঠিক বলতে পারে না। বোশেখ মাসে যখন পাহাড়-পোড়ানো গরম বাতাসের হল্কা লেগে মাঠের গরু মরে যায় আর ঘরের মানুষেরা ছটফট করে, তখন গাছেরা ঠান্ডা বাতাস বইয়ে দিয়ে সিদ্ধপুরুষের আস্তানাটিকে ঠান্ডা ক'রে রাখে। সবচেয়ে আশ্চর্যের ব্যাপার হলো, যে-রাতের আকাশে পূর্ণিমার চাঁদ ঝলমল ক'রে জ্যোৎস্না ছড়ায়, সে-রাতে সিদ্ধপুরুষের ঘরের আঙিনার ওই আমগাছ চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে হয়ে আর হেসে-হেসে সিদ্ধপুরুষের কাছে এসে দাঁড়ায়। কম্পাসবাবু দেখেছেন, রাজপুর থানার সেকেন্ড অফিসার নিমাইবাবুও দেখেছেন, সেই চমৎকার সুন্দরীর সঙ্গে হেসে-হেসে কথা বলছেন সিদ্ধপুরুষ।

ঘরের দরজার কাছে এসে দাঁড়াতেই ভিতর থেকে বের হয়ে এলেন সিদ্ধপুরুষ। সাদা মাথা, সাদা দাড়ি। কিন্তু এ কী? এরকম অদ্ভুতভাবে দুই চোখ অপলক করে তিনি আমাকে দেখছেন কেন?

সিদ্ধপুরুষ বললেন—তুমি তো বিমলের বন্ধু?

—আজ্ঞে হ্যাঁ।

সিদ্ধপুরুষ—আমাকে মনে পড়ে?

—হ্যাঁ মনে পড়েছে। চিনতে পেরেছি। আপনি হলেন বিমলের মামাবাড়ির ভোলাদা। সেই যে, আজ বোধহয় তিরিশ বছর হলো, আপনি বর্ধমানে চলে গেলেন, তারপর আর আপনাকে দেখিনি। শুনেছিলাম, আপনি বিয়ে করেছেন।

ভোলাদা—হ্যাঁ, বিয়ে হবার পর রেলওয়ের ইট সাপ্লাইয়ের কন্ট্রাক্ট পেয়ে এখানে এসে আর এই ঘরটি তৈরী করিয়ে সস্ত্রীক ঠাঁই নিয়েছিলাম। তারপর আর বেশী দিন নয়, একটা বছরও পার হয়নি, তিন দিনের জ্বর সহ্য করতে না পেরে সে চলে গেল। একলা হয়ে এই ঘরে শুধু রয়ে গেছি আমি।

—কিন্তু এরা যে বলছে, আপনি একজন সিদ্ধপুরুষ। পূর্ণিমার রাতে আপনার ঘরের আঙিনার ওই আমগাছ নাকি চমৎকার এক সুন্দরী মেয়ে হয়ে আপনার কাছে দেখা দেয়।

হেসে ফেললেন ভোলাদা—না, ঠিক তা নয়। চমৎকার একটি সুন্দরী মেয়ে আমগাছের ছায়া হয়ে আমার কাছে দেখা দেয়।

—আজ্ঞে? কী বললেন?

ভোলাদা—তোমার বউদি নিজের হাতে এই আমগাছের চারা পুঁতেছিল। আর, জান না বোধহয়, তোমার সেই বউদি দেখতে খুব সুন্দর ছিল।

হাতে মসী মুখে মসী
মেঘে ঢাকা শিশু শশী
সুলেখা ওয়ার্কস্ লিমিটেড
সুলেখা পার্ক কলিকাতা-৩২

লিউইস ক্যারল-এর ধাঁধা

অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যানড-এর লেখক লিউ-ইস ক্যারল (আসল নাম লাডউইগ ডগসন) ছিলেন অংকশিক্ষক। আসল নামে অংকের অনেক বই লিখেছিলেন তিনি। তাঁর নাম দেখে অংকের ভয়ে যদি অ্যালিস ইন ওয়ানডারল্যানড কেউ না পড়ে, তাই সেই বইতে তিনি ছদ্মনাম নিয়েছিলেন লিউইস ক্যারল। আর, সেই লিউইস ক্যারল নামেই আজ তিনি বিশ্ববিখ্যাত।

লিউইস ক্যারলও প্রায়ই ক্লাসে এসে ধাঁধা লাগিয়ে দিতেন তাঁর ছাত্রদের। অংকশিক্ষক তো, তাই মজাটা করতেন অংক নিয়েই। একদিন ক্লাসে এসেই তিনি বললেন, 'দূর, যোগফলটা রোজ শেষে লিখতে ভালো লাগে না, আজ আগে লিখে রাখি। তাহলে ভুলও হবে না, ভুলেও যাবো না।' বলে বোর্ডের মাথায় লিখলেন ৪১০৬২। ছাত্ররা অবাক! কোথায় যোগ যে তার ফল লিখছেন স্যর?

'এসো, এবার নিশ্চিন্তে যোগটা সেরে ফেলা যাক!' বলে ক্যারল এবার বোর্ডে লিখলেন ১০৬৬। তারপর ছাত্রদের একজনকে বললেন—'আমার চারটে সংখ্যার নিচে তুমি চারটে সংখ্যা লিখে দাও—যা তোমার মনে আসে!' ছাত্রটি লিখল ৩৪৭৮। ক্যারল তার তলায় ৬৫২১ লিখে আরেকটি ছাত্রকে ডাকলেন। সে লিখল ৭১৫০। তলায় ক্যারল লিখলেন ২৮৪৯। তৃতীয় ছাত্র এসে লিখল ৩৫৯১। ক্যারল যোগ করলেন ৬৪০৮। চতুর্থ ছাত্র লিখল ১৩৭৮। ক্যারল তারপর ৮৬২১ লিখে বললেন, 'অনেক বড় হয়ে গেছে, আর নয়। এবার তোমরা খাতায় যোগ দিয়ে দ্যাখো তো ফলটা ঠিক লিখেছি কিনা?'

ছাত্ররা যোগ দিয়ে দেখল। আরে, তাইতো! বিলকুল ঠিক! এবার তোমরা বলো তো, কী করে সম্ভব হলো ব্যাপারটা?

উত্তর **আটচল্লিশ** পাতায়

ধাঁধা তৈরী করেছেন অরূপরতন ভট্টাচার্য

টেবিলের ওপর সমান মাপের একসার ছটা গেলাসের বাঁদিকের তিনটে জল ভর্তি, বাকি তিনটে খালি। এখন একটা গেলাসে হাত লাগিয়ে—মাত্র একটাতেই হাত লাগাতে পারবে—সবকটাকে এমনভাবে সাজাবে যাতে প্রথমটা ভর্তি, দ্বিতীয় খালি, তৃতীয় ভর্তি, চতুর্থ খালি, পঞ্চম ভর্তি। আর শেষেরটা? খালি। ঠিক তাই। তোমরা করে দেখো।

ছবি দেখো। দশটা মার্বেল সাজিয়ে পিরামিড। এর থেকে তিনটে তুলে উল্টো পিরামিড তৈরি করো। পারবে?
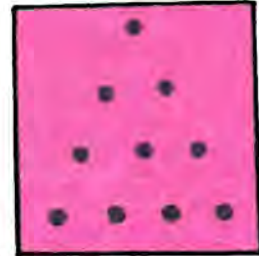
উত্তর একশ ছিয়াত্তর পাতায়
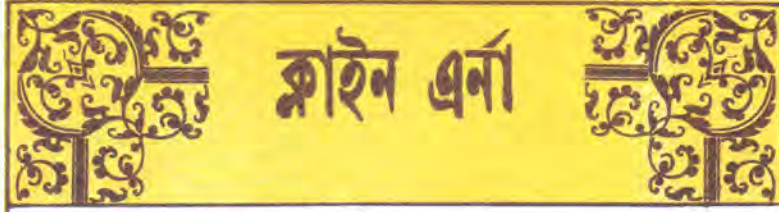
ক্লাইন এর্নার মামা সাধনোচিত ধামে চলে গেলেন। তিনি চাষবাস করতেন; এমন কিছু পয়সা-কড়ি ছিল না। কিন্তু ও-পারে যাবার পূর্বে পাড়ার পাদ্রিসায়েবকে বলে গিয়েছিলেন, তাঁর যে একটি অত্যুত্তম ছাগলী আছে সেটা যেন ক্লাইন এর্নাকে দেওয়া হয়। তিনি ভাগ্নীকে সত্যসত্যই বড়ই স্নেহ করতেন।

পাদ্রিসায়েবের কাছ থেকে খবর পেয়ে মা মেয়ে ছাগলীটাকে নিয়ে আসার জন্য গাঁয়ে গেলেন। খাসা ছাগলী। তোমাদের মধ্যে যারা "পরশুরামের" লম্বকর্ণ পড়েছো, তাদের উদ্দেশ্যে আমি শুধু এইটুকু বলতে পারি, সেই জরমন ছাগলী লম্বকর্ণের চেয়ে এক কাঠি না হোক, আধ কাঠি সরেস। সেই পুরুষ্টু ছাগলীটি দুদিন ধরে কিছু খেতে পায়নি। ক্লাইন এর্না তার জন্য আহারাদি নিয়ে গিয়েছিল। তাই সে চরম অজানন্দে ঘোঁৎ ঘোঁৎ করতে করতে ওদের সঙ্গে চললো।

ইতিমধ্যে পথমধ্যে প্রতিবেশিনী এক মহিলার সঙ্গে সাক্ষাত। তিনি ছাগলীটার দিকে বুভুক্ষ নয়নে তাকিয়ে এর্নাকে শুধোলেন, ক্লাইন এর্না, এই পুরুষ্টু পাঠীটি পেলি কোত্থেকে?

এজ্ঞে, আমার মামা যাবার পূর্বে আমাকে এটি দিয়ে গিয়েছেন।

মহিলা ঃ উত্তম। কিন্তু প্রশ্ন; এখন তো গ্রীষ্মকাল। বাগানে বেঁধে রাখলেই হবে। কিন্তু শীতকালে করবি কী? তোদের বাড়িতে তো সে-রকম কোনো ব্যবস্থা নেই।

ক্লাইন এর্না তিন গাল হেসে বললে, কেন? তার জন্য চিন্তা কী? আমাদের বেডরুমে থাকবে।

মহিলা স্তম্ভিত হয়ে বললেন, সে কী! সে দুর্গন্ধে—

ক্লাইন এর্না শান্তকণ্ঠে বললে, ছাগলীটাকে দুর্গন্ধ সহ্য করে নিতে হবে বই কি!

* * *

এ-গল্প প্রাচীন দিনের। তখন ইয়োরোপীয়রা স্নানটান বিশেষ করতো না। তখন এর্না পরিবারের শরীরের দুর্গন্ধ বেশী, না, ছাগলীর বেশী সেই নিয়ে সমস্যা!

শিল্পীদের ছবির সঙ্গে কবির লড়াই

নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

এই পাখি নেই পাখি,
কোন্‌খানে সেই পাখি
ডাকে?
দুখীরাম বাগড়ীর
পকেটে না পাগড়ির
ফাঁকে?
কভু বসে জুত করে,
কভু-বা ফুড়ুত করে
ওড়ে।
কভু-বা ভড়াক মেরে
হঠাৎ চরাক মেরে
ঘোরে।
রাম কী কিরিয়া বাবা,
এ কোন্ চিড়িয়া বাবা?
আজই
দুখিয়া দিনে কি রেতে
মুলুকমে চলে যেতে
রাজী।
ব্যাকুল দুখিয়ারাম
'সিয়ারাম সিয়ারাম'
হাঁকে।
ওই দ্যাখো নচ্ছার
চিড়িয়া বসেছে তার
নাকে।

অমিতাভ চৌধুরী

নাসিক বাড়ি, পাগড়িধারী, মারহাট্টী এক ছোকরা,
নাকের দাঁড়ে দাঁড়িয়ে আছে ছোট্ট পাখি নাকঠোকরা।
দাঁড়ের ধারে চোখের বাটি,
বাটি তো নয় জলের ঘাঁটি
জল গড়িয়ে ভিজিয়ে দিল ঝুঁটির যত চুল কোঁকড়া॥
তারপরেতে জাদুর ফাঁকি
কোথায় নাকু, কোথায় পাখি
লেজ গুটিয়ে পালিয়ে গেছে বমবে থেকে বাগডোগরা॥

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

গুড়গুড়ে পাখি এক
পুছে বাত নিয়ত
পাগুড়িতে ঢাক ঢাক
গুড়গুড় কী অত

বলে দাদা শুনে সব
ভুরু দুটো কুঁচকে
কত বড় বেআদব
ঐটুকু পুঁচকে

অবিশ্যি এও ঠিক
মাথা সাফ থাকলে
বেঁধেছেঁদে চারিদিক
রাখা চাই আগ্‌লে

নইলে তো ছেড়ে নাক
টাক-ডুম ডুম-টাক॥

পূর্ণেন্দু পত্রী

পানকৌড়ি! পানকৌড়ি
খেতে দেব পান মৌরি
লক্ষ্মী আমার, নাকের থেকে নাম রে।

পাগড়ি এঁটে ঢেকেছি টাক
নরুন দিয়ে কাটবো কি নাক?
ঝক্কি আমার, হায় সীয়ারাম রাম রে।

বোরোলীন

সুরভিত অ্যাণ্টিসেপটিক ক্রীম

বোরোলীন উৎসবের পিছনে

কাটা-ছেঁড়া-ফাটা এবং
শুষ্ক ত্বক আবার সহজ,
স্বাভাবিক, সুরক্ষিত।

বাহাদুর

আশাপূর্ণা দেবী

শেষ পর্যন্ত একা ভেঁপুই সারা পাড়ার বাজার-সরকার হয়ে গেল। অবিশ্যি ভেঁপুদের নিজেদের বাড়ি বাদে। বাড়িতে তো ভেঁপুর মা ভেঁপুর টিকিটিও দেখতে পান না। দেখবেন কখন? হঠাৎ পাড়ার সমস্ত ভদ্রলোক আর ভদ্রমহিলা যে ভেঁপুর মামা, কাকা, দাদা, দাদু এবং মাসীমা, জ্যেঠাইমা, দিদি, বউদি হয়ে উঠেছেন।

অথচ, এর মূলে মাত্র একটি গুলি সুতো!

হ্যাঁ, স্রেফ শাদা সিধে একটি শাদা গুলি সুতো। মা-র অর্ডারী গুলি সুতোটা কিনে হাতে করে লুফতে লুফতে বাড়ি ফিরছিলো ভেঁপু, হঠাৎ চোখে পড়ে গেল নন্দঠাকুমার। পড়বেই, কারণ এইটাই নন্দঠাকুমার গঙ্গা নেয়ে ফেরার সময়। গুলি সুতো দেখে নন্দঠাকুমা দাঁড়িয়ে পড়ে একগাল হেসে বললেন, কে ভেঁপু? গুলি সুতো কিনেছিস? কতো দিয়ে কিনলি, দাদা? খাসা গোলগাল গুলিটা—

ভেঁপুর মনে হঠাৎ একটু বাহাদুরির বাসনা জেগে উঠলো। ভেঁপু বললো, পাঁচ পয়সা।

দশকে পাঁচ বলাটা যে খুব দোষের তা ভাবেনি ভেঁপু, আর এ-ও ভাবেনি, ওই চেপে ফেলা পাঁচটি পয়সা দিয়ে সে একখানি রামজিলিপি-প্যাঁচ কিনলো।

নন্দঠাকুমা ফোকলা মুখের সবটা হাঁ ছড়িয়ে বলে উঠলেন, অ্যাঁ! মাত্তর পাঁচ পয়সা! আর আমার বাড়ির ওই পোড়ারমুখো গঙ্গাধর সেদিন কিনা একটা গুলি সুতো এনে দিয়ে গালে চড়টি মেরে দশ-দশটা পয়সা নিলো! দিনে ডাকাতি নয়? মগের মুলুক পেয়েছে? আচ্ছা, গিয়ে দেখাচ্ছি মজা!

শুনে তো ভেঁপুর মাথায় আকাশ! আহা, বেচারা গঙ্গাধর, কতোদিন ভেঁপুর ঘুড়িতে ধরাই দিয়ে দিয়েছে, ক্রিকেট খেলার ইট জোগাড় করে দিয়েছে। ভেঁপুর দোষে সে 'মজা' দেখবে? দেখার পক্ষে 'মজা'টা তো খুব একটা ভালো জিনিস নয়।

ভেঁপু তাই তাড়াতাড়ি বলে ওঠে, বাঃ! ও কী করে পাবে? এতো আমার চেনা দোকানের—

চেনা দোকানের? অ! নন্দঠাকুমা আবার ফোকলা হাসি হেসে বলেন, তাই বল! তা দোকানদারের সঙ্গে চেনা হলো কী করে, দাদা?

কী মুশকিল!

বুড়ীদের কি এতও কৌতূহল! কী করে চেনা হলো তাও জানতে ইচ্ছে করে?

ভেঁপু আবার গল্প বানায়, বাঃ আমার বন্ধুর মামার দোকান যে—

বন্ধুর মামার দোকান! নন্দঠাকুমা আহ্লাদে নেচে উঠে বলেন, তা হলে তো সকল দ্রব্যিই সস্তা পাবি। বলি, কী কী মাল রাখে রে, ওখানে?

ভেঁপু বোঝে না ভেঁপু কী ফাঁদে পা দিচ্ছে। ভেঁপু এই মাত্র দোকানে যা যা দেখে এসেছে বলতে থাকে—

ভেঁপুকে স্কুলে যাওয়া স্থগিত রেখে 'মামার দোকানে' ছুটতে হয়।

ভেঁপু স্কুল থেকে ফিরছে, হারাধনজ্যাঠা সামনে দাঁড়ান, ভেঁপু, তোমার জেঠী বলেছে তোমার কী চেনা দোকান আছে, সেখান থেকে এক পাত সেফটি-পিন, এক পাত ঝিনুকের বোতাম, আর এক ভরি পাতি জর্দা এনে দিতে। এই নাও টাকাটা—

হারাধনজ্যাঠা লোক খারাপ নয়। পুরো আস্ত একখানা পাঁচ টাকার নোটই ধরে দেন, কিন্তু ভেঁপুকে তো মুখ রাখতে হবে? পুরো দামেই যদি আনবে ভেঁপু তো হারাধনজ্যাঠা নিজে কী দোষ করলেন?

ভেঁপুর নাম ডাক ক্রমশ তার বাড়ি পর্যন্ত পেঁছিয়। ভেঁপুর মা তেড়ে আসেন, এই গুণমণি ছেলে, তুমি না কি পাড়া-রাজ্যির সবাইকে কোন চেনা দোকান থেকে সস্তায় কেনা-কাটা করে দিচ্ছো? কই, বাড়ির জন্যে তো কুটোটি ভাঙতে দেখি না। বলি, তোর আবার মামার দোকান কোথায় রে?

আমার মামা কেন হতে যাবে? বন্ধুর মামা—

অম্লান মুখে বলে ভেঁপু। বলে বলে এতো অভ্যেস হয়ে গেছে যে ওর নিজেরই ক্রমে বিশ্বাস জন্মে যাচ্ছে, আছে ওই রকম কোনো ব্যাপার।

মা বলেন, তা, সে কতোবড়ো দোকান যে নেই হেন জিনিস নেই! স্বপনের মা বললো, তুই না কি তাকে আট আনা সের দিয়ে এমন পটল এনে দিয়েছিস যে লোকে এক টাকায় পায় না।

তা সত্যি। এনে দিয়েছে ভেঁপু।

বাধ্য হয়েই ভেঁপুকে মামার দোকানের আয়তন বাড়িয়ে বলতে হচ্ছে। আলু, পটল, বেগুন, কাঁচা লঙ্কাও রাখতে হচ্ছে সে দোকানে।

পাড়ার লোকেরা তো আর নিজের লোকেদের বাজার পাঠিয়ে সুখ পাচ্ছে না!

এখন পাড়া জুড়ে শুধু 'ভেঁপু ভেঁপু' জয়ধ্বনি, পাড়ার সকলের মুখে মুখে শুধু ভেঁপু বাঁশির তান।

সত্যি ভেঁপু, কী করে যে পাস তুই!...বাবা ধন্যি ছেলে বটে। এই জিনিস মোটে তিরিশ পয়সায় পেলি? আমাদের অমুকতো পঞ্চাশ পয়সার এক পয়সা কমে আনতে পারে না।...না বাবা, খুব বাহাদুর ছেলে বটে! একেই বলে ওস্তাদ ছেলে! প্রতিটি জিনিসে দশ পয়সা পনেরো পয়সা বিশ পয়সা করে কম! বেঁচে থাকো বাবা! এমন নইলে ছেলে! কী পরোপকারী!

কিন্তু বাড়ির লোকেরা কখনও বাড়ির ছেলের সুখ্যাতি-টুখ্যাতি সুনজরে দেখে না। ভেঁপুর পিসী বলে, ঘর জ্বালানে পর ভোলানে! বাড়ির কাজে মাথা ভোম্বল! তার বেলায় পকেট থেকে নোট পড়ে হারিয়ে যায়! দোকানে পয়সা গুণে নিতে ভুল হয়ে যায়! ওই জ্বালায় তো ছেড়েই দিয়েছি ওকে। অথচ লোকের

ব্যাপারে—

ভেঁপুর বাবা বলেন, ভেঁপুকে দিয়ে যদি একটা কাজ পাওয়া যায়! সকাল থেকে বলছি জামা ধোবাবাড়ি দেবার সময় পকেট থেকে একখানা দশ টাকার নোট বার করে তাকের ওপর রাখলাম, কোথায় যে গেল! একটু খুঁজে দ্যাখ, হাওয়ায় উড়ে চৌকির তলায়-টলায় গেল কিনা! তা বয়েই গেছে!

আর, ভেঁপুর দিদি বলে, তুই দেখালি বটে বাবা একখানা! খাম পোস্টকার্ড যে আবার চেনা দোকান থেকে সস্তায় কিনতে পাওয়া যায়, এ কখনো শুনিনি। টুলুর দিদি বলে গেল, ওরা নাকি আজকাল তোকে ছাড়া আর কাউকে খাম পোস্টকার্ড কিনতেই দেয় না। মানেটা কী?

ভেঁপু রেগে রেগে বলে, মানে আবার কি? এমনি।

ভেঁপু রাগ করে বেরিয়েই যায় পকেট থেকে লিস্টটা বার করে পড়তে পড়তে—

এক নম্বরঃ হারুজ্যাঠার নস্যি।

দু নম্বরঃ বেবিমাসীমার জামার লেস্!

তিন নম্বরঃ ননীকাকীমার হেয়ার অয়েল।

চার নম্বরঃ মনীষা বউদির সল্টেড্ কাজু।

পাঁচ নম্বরঃ ঘনশ্যাম দুহিতার অঙ্কের খাতা।

ছয় নম্বরঃ টুলুর পিসীর এমব্রয়ডারির ছুঁচ।

সাত নম্বরঃ হরসুন্দরবাবুর আবার সিগারেট।

আট নম্বরঃ বলুদার আবার ব্লেড্।

ন নম্বরঃ নন্দঠাকুমার আবার নারকেল পাটালি।

দশ নম্বরঃ

সুতো, ছুঁচ, পেনসিল, ছুরি, ঘুড়ি, লাটাই, লাট্টু, মারবেল—

আহা কী ছিরির দোকান দিয়েছে মামা—নন্দঠাকুমা রেগে ওঠেন, ওসব নিয়ে তো আমি সগ্‌গে যাবো!

যেন নন্দঠাকুমাকে সগ্‌গে পাঠাবার জন্যেই লোকে দোকান খুলেছে।

ভেঁপু ভয়ে ভয়ে বলে, আরো তো কতো কী আছে! বিস্কুট, ল্যাবনচুষ, বাদামচাক্তি, নারকেল পাটালি—

নন্দঠাকুমার মুখটায় হঠাৎ ইলেকট্রিক লাইট জ্বলে ওঠে, নারকেল পাটালি পাওয়া যায়? আহা, বড়ো খাসা জিনিস রে! কতোকাল খাইনি! সেই খুলনা ছেড়ে অবধি আর চোখেও দেখিনি! তা আমায় এনে দিতে পারবি?

কেন পারবো না? ভেঁপু উৎসাহিত হয়, পয়সা দিন।

দোকানে যেতে ভেঁপু সর্বদাই এক পায়ে খাড়া।

নন্দঠাকুমা হাতের গঙ্গাজলের ঘটি বুকে চেপে কৌশলে একহাতে আঁচলের গিঁট খুলে চারআনা পয়সা দেন ভেঁপুর হাতে। তারপর বলেন, এই নে গঙ্গাজলে হাত ধো, আর বেশ সস্তা করে আনবি, বুঝলি? বন্ধুর মামার দোকান যখন।

ভেঁপুর পকেটে মার দেওয়া গুলি সুতোর দরুন অনেকগুলো পয়সা, কাজে কাজেই সস্তা করে আনতে অসুবিধে নেই ভেঁপুর। ভেঁপু বলে, আপনি দু মিনিট দাঁড়ান ঠাকুমা, আমি এক্ষুনি এনে দিচ্ছি—

এই হলো শুরু!

পরদিনই রাস্তায় হরসুন্দরবাবু খপ করে ধরলেন ভেঁপুকে, কী ভেঁপু, শুনলাম তুমি না কি তোমার কোন মামার দোকান থেকে খুব সস্তায় সওদা করে দিচ্ছো লোককে। তা, আমার জন্যে দু প্যাকেট সিগারেট এনে দাও দিকি সুবিধে করে। যা দাম হয়েছে আজকাল—

সিগারেট! কিনতে গেলে কে কী ভাববে?

ভেঁপু একটু নিরুৎসাহের গলায় বলে, আমার মামার নয়, বন্ধুর মামার—

আহা ওই একই কথা। এই নাও। এমনিতে দু টাকা বারোআনা করে, কিন্তু বলছো যখন তোমার চেনা দোকান—

অগত্যাই এনে দিতে হয়।

ভেঁপুর মাসের 'পকেটমানি' পাঁচটি টাকার থেকে কিছু খসে। হরসুন্দর পুলকিত চিত্তে পাড়ায় গল্প করতে বেরোন, পাড়ার 'ভেঁপু' নামের ছেলেটি কী তুখোড়, কী ওস্তাদ! সাত সিকের জিনিস পাঁচ সিকেয় আনতে পারে ও।

পরদিনই পাড়ার ক্লাবের বলুদা হাঁক ছাড়েন, ভেঁপু, তোর নাকি কোন মামার দোকান তোকে সস্তায় মাল দিচ্ছে? তবে তো আর ব্রেড্-ফ্রেড্ অন্য কোথাও থেকে কিনছি না। তুই ব্রাদার আজ থেকে আমার ব্রেডের ভার নে। মানে, যতোদিন যাবত আমার গালে দাড়ি গজাবে, ততোদিন তাবত তুই আছিস, আমি আছি, আর, তোর চেনা মামার দোকান আছে—

কিন্তু ভেঁপু কী আছে?

ভেঁপু তো শুনে 'নেই!'

তবু ভেঁপুকে 'থাকতে' হয়। কারণ পাড়ার মধ্যে ভেঁপুই তো একমাত্র তুখোড় ওস্তাদ আর বাহাদুর ছেলে!

ভেঁপু সকালবেলা বাড়ির জন্যে পাঁউরুটি কিনতে বেরিয়েছে, এবাড়ি-ওবাড়ি থেকে খান চার পাঁচ 'সস্তা করে' পাঁউরুটি এনে দেওয়ার বরাত পড়ে গেল ভেঁপুর। ...কিনে বিলোতে বিলোতে খালি হাতে বাড়ি!

মা অবাক হয়ে বলেন, কই পাঁউরুটি কই?

ভেঁপু উদাসভাবে বলে, নেই! পাঁউরুটির গাড়ি আসেনি আজ!

গাড়িই আসেনি?

মা পাঁউরুটির গাড়ি, তার চালক, তার মালিক সক্কলকে স্বর্গে পাঠিয়ে দিয়ে চিঁড়ে ভাজতে বসেন।

ততক্ষণে ঘনশ্যামবাবুর মেয়ে এসে দাঁড়িয়েছে, ভেঁপুদা, আমায় দুটো লাল নীল পেনসিল এনে দিওতো—

ভেঁপুর পেটে তখনো জল ফল কিছুই পড়েনি, ভেঁপু রেগে গিয়ে বলে, কেন, তোর দাদা পারে না এনে দিতে?

পারবে না কেন? তবে তোমার চেনা দোকান, তাই—

তবে আর কী করা? ভেঁপু লাল নীল পেনসিলের দোকানে ছোটে।

তারপর? গ্রামে গ্রামে সেই বার্তা রটি গেল ক্রমে—

বেবিমাসীমা আহ্লাদে গলায় বলেন, ভেঁপু, আমার যে এক ডজন ক্রুচেট গুলি চাই, বাবা!

ননীকাকীমা খটখটিয়ে বলেন, রাজ্যের লোকের উপকার করছিস ভেঁপু, আর সবচেয়ে আপন লোক আমি কিনা এখনো পুরো দামে সাবান কিনে মরছি?

অতএব সবচেয়ে আপন লোকের জন্যে সাবান কিনতে ছোটে ভেঁপু সব থেকে সস্তায়।

কিন্তু ননীকাকীমার ভাই টেঁপুমামাও কিছু কম আপন নয়, তাছাড়া পাড়াতেই থাকেন যখন। তাঁর জন্যে খান তিনেক রুমাল এনে দিতে পারবে না ভেঁপু সুবিধে করে? আর ও'র ছোট খোকার জন্যে একজোড়া লাল মোজা? পাড়ার ছেলের বন্ধুর মামার দোকান থাকায় তাহলে লাভটা কী?

ভেঁপু স্কুলে যাচ্ছে—

মনীষা বউদি জানলা দিয়ে ডাকছেন, অ ভেঁপু, চট করে তোর চেনা দোকান থেকে আড়াইশো মাখন এনে দিয়ে যাবি, ভাই? তোদের দাদার আবার আজ ফুটবল ম্যাচ! বলে কিনা, মরবার সময় নেই।

না, দশ নম্বর নেই। আজ লিস্ট্ খুব ছোটো। তবে নন্দঠাকুমার নারকেল পাটালি বড়ো জ্বালাচ্ছে। ওটি ও'র প্রতিদিন চাই, আর প্রতিদিনই বলা চাই, কাল তো এর থেকে বড়ো ছিল রে! মামা বুঝি আর ভাগ্নেকে পুঁছছে না?

অতএব, চারআনায় আরো বড়ো আনতে হয়।

বাবার নোটটা হারিয়ে যাওয়ায় আজ ভেঁপুর মনটা খুব উৎফুল্ল আছে। এখন দু চারদিন বেশ ম্যানেজ করা যাবে। আর যদি কেউ বেশী—

ফট্ করে দীপিকাদি আর লাবণ্যমাসীর সঙ্গে দেখা। মা আর মেয়ে কোথায় যেন যাচ্ছেন।

ভেঁপু দাঁড়িয়ে পড়ে।

একগাল হেসে বলে, দীপুদি কোথায় যাচ্ছেন?

দীপিকাও হেসে বলে, এই সিনেমার টিকিট কাটতে!

আরে আপনারা নিজে যাচ্ছেন কেন? ভেঁপু আকাশ থেকে পড়ে, আমায় বলেননি কেন?

আহা তুমি কতো করছো, আবার—

তাতে কী? দিন, বলুন কটা চাই।

আরে তুমি যাচ্ছো বাজারে, আর এটা হলো উল্টো দিকে—

ভেঁপু মৃদু হেসে বলে, সবই একদিকে। ভালো দোকানে পাবলিকের সুবিধের জন্যে সবই রাখতে হয়।

লাবণ্যমাসী গালে হাত দিয়ে বলেন, ওমা কী ভালো দোকান গো! সিনেমার টিকিটও রাখে? তবে দে দীপু!

দীপু পাঁচটি টাকা বার করে দিয়ে বলে, দুখানা দু টাকা চারআনা করে—

ভেঁপু একটি অলৌকিক হাসি হেসে বলে, চার আনাটা লাগবে না, আপনি শুধু চারটে টাকাই দিন।

মা, মেয়ে দুজনেই গালে হাত দেন।

সিনেমার টিকিটও সস্তায় পাও তুমি ভেঁপু?

ভেঁপু মুখে ইলেকট্রিক লাইট জেবলে বলে, তা পাই! খুব চেনা দোকান তো—

ছবি এ'কেছেন সমীর সরকার

লিউইস ক্যারল-এর ধাঁধা

ব্যাপারটা খুবই সহজ। যোগের প্রথম সংখ্যা ১০৬৬ বাদ দিলে দেখবে প্রত্যেক ছাত্রের পর একবার করে সংখ্যা বসিয়েছেন ক্যারল। কৌশল তাঁর সেখানেই। প্রতিবার ছাত্রদের সংখ্যাগুলির তলায় এমনভাবে সংখ্যাগুলি বসিয়েছেন যাতে উপরের প্রতিটি সংখ্যার সঙ্গে তাঁর তলার সংখ্যাটি যোগ করে ৯ হয়। অর্থাৎ, এক-একজন ছাত্রের সঙ্গে তাঁর একেকবারের যোগফল হয় ৯৯৯৯। যেমন—

১।	৩৪৭৮	২।	৭১৫০
	৬৫২১		২৮৪৯
	৯৯৯৯		৯৯৯৯

এখন ৯৯৯৯ মানে ১০,০০০-এর ১ কম। মোট চারজন ছাত্রকে ডেকে চার জোড়া সংখ্যা লিখবেন আগেই ঠিক করা ছিল ক্যারল-এর। ফলে, সেগুলির যোগফল ৪০০০০-এর ৪ কম হবে জানা ছিল তাঁর। তাই প্রথম যে সংখ্যাটি বসাবেন সেটা মনে মনে আগে ঠিক করে নিয়ে—যেমন ১০৬৬—তা থেকে ৪ বাদ দিয়ে ১০৬২ সোজা ৪০০০০ সঙ্গে যোগ করে যোগের আগেই যোগফল ৪১০৬২ লিখে রাখতে পেরেছিলেন বোর্ডে।

কী, খুব সোজা না? ভালো করে বুঝে নিয়ে এবার তোমরাও তো ধাঁধা লাগাতে পারো অন্যদের?

সন্তোষকুমার ঘোষ

আধিভৌতিক
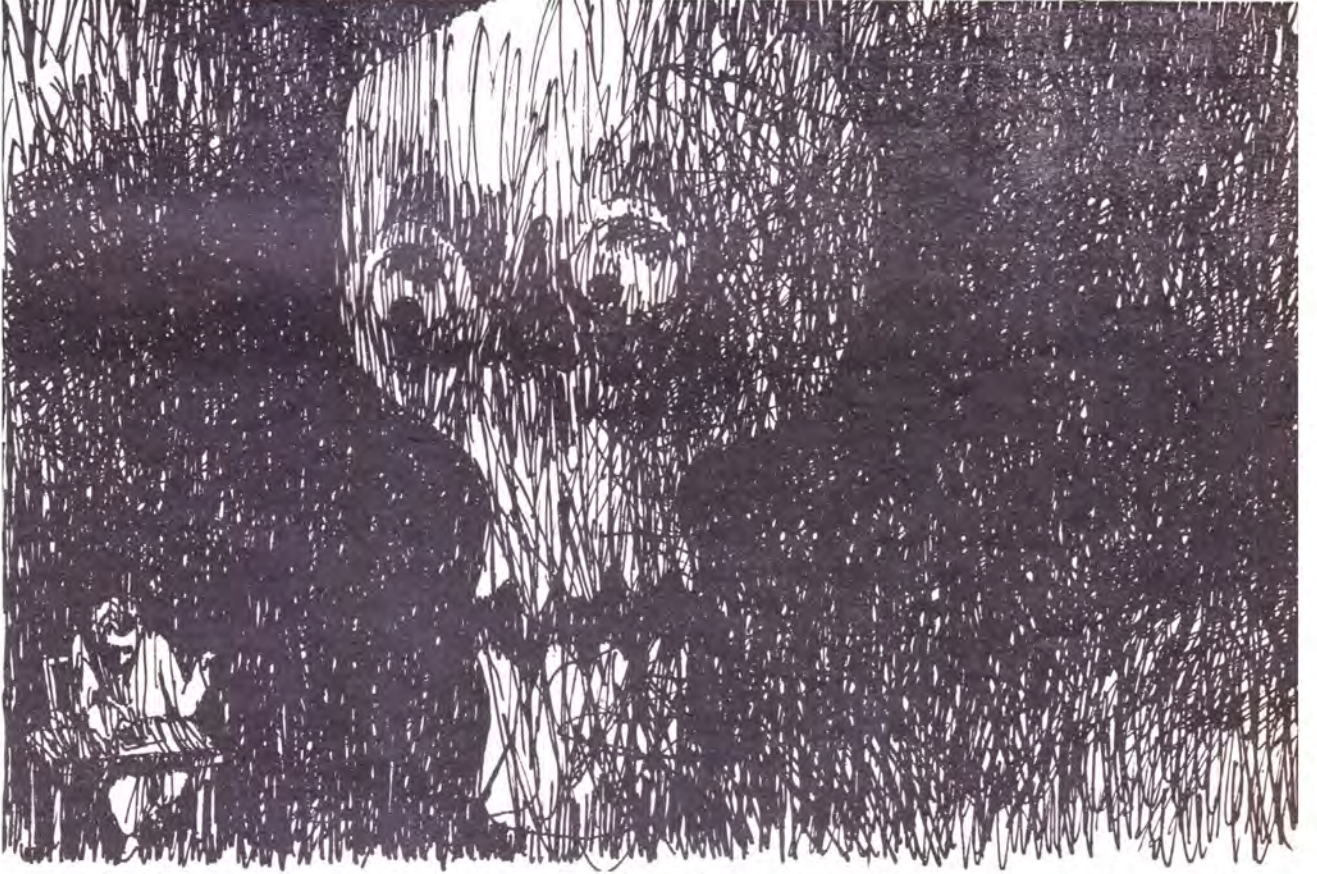
আধিভৌতিক মানে জানো? না জানলে লজ্জা নেই, আমিও জানি না। তবু লেখাটার এই নাম রেখেছি কেন? এই জন্যে যে, এর আধখানার বক্তা ভূত, বাকী অর্ধেক এখনও জ্যান্ত এই আমি। ডিক্শনারিতে দাঁতভাঙা অন্য কোনও মানে লিখে থাকবে।

দিনের বেলায় লিখছি, কারণ নিশাকালে বিশেষত ভূতদের বিষয়ে রচনা নাস্তি নাস্তি, শাস্তরে লেখা আছে। কোন্ শাস্তরে? বোধহয় পুরাণে কি মনুতে; কিংবা জরথুস্ত্রে কোনও পুঁথিতে। অথবা মথিলিখিত সুসমাচারেও "মা-লিখ" বলে থাকতে পারে। ঠিক কোন্টায় জানি না, আমি কোনওটাই পড়িনি, তবে আছে বিশ্বাস করি, মানি। একালে আমরা তো কোন-কিছু পড়ি না, দরকারই হয় না। না পড়েও কোন্টায় কী আছে বলে ফেলতে পারি। স্রেফ শুনে। আজকাল এই নিয়মটাই চলছে।

লিখছি, ঘাড়ের উপর কার নিশ্বাস, টের পেলাম। গরম—টাটকা-ভাজা লুচি থেকে যে-ধোঁয়া বেরোয়, সেই রকম।

"দেখি, কী লিখছ", কেউ বলল। বিকাল বেলার পাতারা যে-গলায় কথা বলে, অবিকল সেই গলা। তার ফড়ফড় করে কাগজ ছেঁড়ার মতো হাসিও শুনলাম।

"হাসছ যে?"

"দিনের বেলা আলো জেলে রাখতে দেখে। যে-জন দিবসে মনের হরষে, পড়োনি?"

কাঁচুমাচু মুখে বললাম, "হরষে তো নয়, ভয়ে।"

"ভয়?" সেই গলা আবার বলল "পাও কেন?"

প্রশ্নটা কঠিন বলেই উত্তরটা চট্ করে দিতে পারলাম।—"পাই বলেই পাই। হঠাৎ এসে যায়, তুমি যেমন এসেছ। ওটা কেড়ে নিও না কিন্তু, পারলে বরং আর খানিক দিয়ে যাও। ছেলেবেলায় মাসিমা যাবার সময়ে হাতে যেমন একটা কি দুটো টাকা গুঁজে দিয়ে যেতেন। সবই তো যাচ্ছে, যা নিয়ে জন্মেছিলাম, বড় হচ্ছিলাম, তার সব। বন্ধুবান্ধব, দ্বিতীয় পক্ষের দাঁত, টো-টো করে ঘোরা, মিঠাইমণ্ডার লোভ, মায় চুলসুদ্ধ উঠে যাচ্ছে। যা আছে তা-ও কাঁচা রাখতে পারছি না।"

"আমার যে সব গেছে?" সে বলল, "অল্প অল্প যাচ্ছে বলেই লাগছে। যেদিন সব যাবে, দেখবে সব ফিরে পেয়ে গেছ।"

"ওরে ব্যস্", আমি বললাম "তুমি যে ফিলজফার ভূত!"

"উহুঁ," সে বলল, "ভূতেদের মধ্যে ফিলজফার মোটে পাঁচটি। রবিবাবু যে পঞ্চভূতের কথা লিখেছেন। যাক, তোমার কী-কী সব যাচ্ছে বলছিলে?"

খেইটা ফের ধরে নিয়ে বললাম, "আগে যা-যা ভালবাসতাম, এখন তার অনেক কিছুই ঘেন্না করি। যেমন বেড়াল। রাতে বিছানায় পাশে নিয়ে শোবার কথা ভাবতেও পারি না। কোন কিছু ভাল লাগাই ক্রমে শক্ত হয়ে উঠছে। দোহাই, ভয়টাও যেন না যায়। অন্তত ওটা যেমন পাচ্ছি, তেমনি পেতে দাও।"

সে বলল, "মিথ্যে কথা। তোমরা ভয় পাও না। বানাও।"

"ভয় বানাই!"

"তা-ই তো। ভয় বানাও, জয় বানাও।"

অবাক, আমি বললাম, "জয় বানানো ব্যাপারটা কী?"

"মানুষ মাত্রেই অল্পস্বল্প যা বানায়। বিশেষ করে যা বানাতেন রথী-মহারথী, ডাকসাইটে দিগ্বিজয়ী সব বীরেরা।"

"চেঙ্গিস, তৈমুর, নাদির?"

সে গলগল করে যোগ করল, "সীজার, আলেকজানডার, নেপোলিয়ন, হিটলার। নাম শোননি?"

বাধা দিয়ে বললাম, "বানাতেন না তো, ওঁরা জয় করতেন।"

ধমক দিয়ে সে বলল, "না। বানাতেন। লোকে গেলাসে সিদ্ধি ঘুঁটে যেরকম বানায়, যুদ্ধে সিদ্ধিও তাই। খেয়ে বুঁদ হয়ে যেতেন। খাঁটি হলে তো টিকত, থাকত। থাকেনি। ওদের ব্যাপারগুলো না সত্যি, না স্থায়ী।"

আবার যে লেকচার ঝাড়ে! হাত জোড় করে বললাম, "প্লীজ! অন্য কথা বলো। লেকচার নয়। ওটা আমাদের অঢেল আছে। মাস্টারমশায়রা ক্লাসে ক্লাসে, নেতারা মাঠে মাঠে, এমন-কী ঘরে আমার যিনি—"

সে বলল, "চুপ! ও-সব কথা একদম নয়। এটা ছেলেদের গল্প, তায় ভূতের, ওসব চলবে না।"

চুপসে গেলাম। ওর কথা মান্য করাই ঠিক। সত্যিই তো, বুড়ো বয়সে এই সাবজেক্টে দিচ্ছি হাতেখড়ি।

তখন তার বুঝি দয়া হল। বলল, "বেশ, জয়-টয়ের খটোমটো কথা বাদ দিচ্ছি। ভয় নিয়ে শুরু হয়েছিল, তাই চলুক। আলো জেবলে লিখছ তবে ভয়?"

ঘাড় কাত করলাম। বললাম, "নিরুপায়, নাচার। আলো নেবালেই ঘরে, দেয়ালে, স্কাইলাইটের নিচে সব নানা আকারের ছায়া তরতর করে নেমে আসে, চলাফেরা করে কিংবা আঁকা থাকে।

"বলো তো সেগুলো কী?"

"কী আবার। কোনটা ঝাঁকড়াচুল বটগাছ, কোনওটা বনমানুষের মাথা, কিংবা বাবুই-বাসা খোঁপা, তা-ছাড়া আইসল্যান্ড, আলাস্কা, আফ্রিকা—সেইসব দেশ-মহাদেশের ম্যাপ, যেখানে কখনও যাব না, যাইনি।"

"তবেই দ্যাখো, ছায়ার কী বিরাট ব্যাপার। এক সঙ্গে বটানি, বায়োলজি, জিওগ্রাফি আর কত-কী জ্ঞান পাচ্ছ।"

চট করে বলে বসলাম, "সেই ছায়ারা তো আসলে তোমরা, তুমি!"

সে রেগে গেল।—"আমরা ছায়া?"

"শুনেছি তাই তো।"

"না। আমরা দেখতে ছায়ার মতো, এই পর্যন্ত। ছায়ার আকার ধরি। তোমরা যেমন তোমাদের যার-যার চেহারার আকার ধরে আছ। কিন্তু তোমরা কি শুধুই তোমাদের চেহারা নাকি?"

অপমান বলে ঠেকল, জোর দিয়ে বলে উঠলাম, "না, আমরা মানুষ।"

সঙ্গে সঙ্গে সে হাততালির মতো আওয়াজ করে বলে উঠল, "তেমনি, আমরা ভূত।"

টেরচা চোখে চেয়ে বললাম, "সবাই?"

সে কী যেন বিবেচনা করল।—"উহুঁ, না, সবাই না। সবাই একবারেই ভূত হতে পারে না, কিছুদিন অপেক্ষা করে থাকতে হয়। যারা অল্প-অল্প ভূত তারা হল অদ্ভুত। মাঝখানে শুধু ভূত। আর যারা ভূতের চেয়েও ভূত, তাদের বলে সম্ভূত।

"আমাদের যেমন বামুন, কায়েত, বদ্যি?"

"কতকটা তাই। তবে আমরা তো জাত-টাত বলি না, আমরা বলি শ্রেণী।"

"আজকাল আমরাও বলি," কতকটা গর্বের সঙ্গে বললাম। ভূতটা যে খালি আমাদের উপর টেক্কা দিতে চাইছে সেটা বরদাস্ত হচ্ছিল না। তাকে কায়দা করে বাগে পেতে বললাম, "শ্রেণীহীন সমাজ-টমাজের কথা তোমরা ভাবো না?"

সে একটু ভেবে নিয়ে বলল, "আজকাল একটু-আধটু

উঠছে। নতুন যারা আসছে, খুব তেড়িয়া ধরনের, তারা তুলছে। আমাদের ভূতনাথ এ-সব একদম বরদাস্ত করেন না। মাঝে মাঝে বম্-ভোলা হয়ে বেহুঁশ হয়ে থাকেন, নইলে তাঁর শাসন খুব কড়া।"

"ভূতনাথ? তোমাদের তল্লাট ভগবান বুঝি শাসন করেন না?"

সে বলল, "দূর! তার দৌড় জানা আছে। ভগবানেরও পরিণতি ভূত। তা-ও সব সময়ে হতে পারেন না, হন খালি মাঝে মাঝে। দশচক্রে পড়লে। নইলে মনে হয় এখনও মাঝের স্তরেই ঠেকে আছেন। তোমরাও তো তাঁর রীতি-নীতিকে বলো অদ্ভুত। বলো না?"

আমার মুখে কথা সরছিল না। সে ফটফট ফটাস করে আঙুল মটকানোর শব্দ করে বলল, "আচ্ছা, আরও সোজা করে বুঝিয়ে দিচ্ছি। আমরা তো ভূত? 'ভূ' মানে কী, বলো দেখি?"

বললাম, "ভূ-ধাতুর মানে তো হওয়া।"

"তা হলেই দ্যাখো, আমরা তোমাদের ওপরে। আমরা ভূত মানে হয়ে গেছি। তোমরা এখনও হচ্ছ, হয়ে যেতে পারনি।"

সন্দেহের গলায় বললাম, "ভূ কথাটার একটা অর্থ তো পৃথিবী।"

টিকটিকির মতো করে সে বলল, "ঠিক ঠিক। অর্থাৎ পৃথিবীটাও আমাদেরই। তোমরা দখল করে বসে আছ।"

অজান্তেই আমার বুক থেকে একটা দীর্ঘশ্বাস বেরিয়ে গেল। বললাম, "আর বেশিদিন না। তোমাদের দখলেই বোধহয় চলে যাচ্ছে বা চলে যাবে। দেরি নেই, দেখতে পাচ্ছি।"

ভবিষ্যৎ ভূতেদেরই, এই ইঙ্গিতে সে বোধহয় উৎফুল্ল হল।

"তা হলে আমাদের শক্তি স্বীকার করছ?"

যেন কোন ম্যাজিশিয়ানের প্রশ্ন—প্রশ্ন তো নয়, আদেশ—আমি আর নিজের কর্তৃত্বে নেই, তাই নিজেকেই বলতে শুনলাম "করছি।"

সে বলল, "না করে উপায় কী। তোমাদের মন্তরেও তো করেছ। যা দেবী সর্বভূতেষু—সব ভূতের যিনি দেবী, তিনি তোমাদেরও শক্তি।"

ততক্ষণে খানিকটা সামলে নিয়েছি। ঘাড় বেঁকিয়ে বললাম. "কী-এমন শক্তি তোমাদের আছে শুনি? থাকো তো অন্ধকারে—"

বিড়বিড় করে সে বলল, "কথাটা ঠিক নয়, ঠিক নয়। তবু তা-ও যদি হয়, আলো আর অন্ধকারের মধ্যে কোন্‌টা বড়, বলো দেখি?"

না ভেবেই বললাম, "আলো। আলোয় সব দেখি, আলোর কত গতি। এমন-কী, আকাশের তারা কত দূরে, আমরা তা-ও আলোকবর্ষ দিয়ে মাপি।"

চুপ করে একটু শুনেই সে বলল, "তা-হলেই দ্যাখো, আলোকবর্ষ। মানে, আলোককে তবু মাপা যায়. অন্ধকারের কোনও বর্ষ নেই। অন্ধকার আসে না, থাকে। তারই মধ্যে আলো এখানে ওখানে একটু চকের গুঁড়ো ছড়িয়ে রাখে।"

"তাই তোমরা শুধু রাত্তিরবেলা থাকো?"

"ও হরি", সে হেসে উঠল, "তাই ভেবে তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে দিনের বেলা লিখতে বসেছ, আলো জেলে? উহুঁ। আমরা দিনেও আছি, রাতেও আছি। সকালে আছি, বিকালেও। উঠতে বসতে, পাশ ফিরতে। সর্বদা যদি না-ই থাকব, তবে লিখেছে কেন যে, ঠিক দুক্কুর বেলা. ভূতে মারে ঢেলা? যে-লোকটা লিখেছে সে জানত। মারি, একটা ঢিল মারি?" বলে সে সত্যিই যেন মুঠোটা পাকিয়ে ধরল।

মাথা বাঁচালাম, আন্দাজে সরে গিয়ে। আমার রাগ হল।—"দ্যাখো, তুমি অন্যায় সুযোগ নিচ্ছ, মেঘনাদ যে-সুযোগ নিত। তুমি আমাকে দেখতে পাচ্ছ, অথচ আমি তোমাকে দেখতে পাচ্ছি না। একি একটা খেলার নিয়ম হল?"

"হল না বুঝি?" সে হালকা গলায় বলল, "তা-হলে মোগল হারেমে বাদশাজাদীদের সঙ্গে সেনাপতিদের জমত কী করে?" বলেই সে কেমন-গলায় বলল "ছি-ছি। এই গল্পে এ-সব চলবে না। খেলার আইনটা আমিই ভঙ্গ করলুম? ছি-ছি। জিভ কাটতে সাধ যাচ্ছে।"

ফশ্‌ করে বললাম, "জিভ্‌ থাকলে তো কাটবে!"

সে যেন ক্ষুণ্ণ হল।—"ভাবছ নেই?"

জবাব দিলাম না। ততক্ষণে আমার সাহস পানা-পুকুরে চান করে আসার পরদিনে জ্বরের মতো চড়চড় করে বেড়ে যাচ্ছিল। যেন আমি আর ও সমান-সমান, এম্‌নি কায়দায় বললাম, "নেই। জিভ্‌, কান, নাক, চোখ—কিচ্ছু নেই!"

"কান আছে," সে বলল, "নইলে শুনছি কী করে? আছে. তবে ফট করে দেখাতে পারি না।"

"তার মানে নেই।" ঠাট্টার সুরে বললাম। সে রীতি-মত রেগে বলল, "তোমার বুদ্ধি নেই?"

"আছে বলেই তো মনে করি।"

"তা-হলে পরীক্ষায় টায়ে-টুয়ে পাস করেছিলে কেন? কিংবা ষাঁড়ে তাড়া করলে ভ্যাবাচ্যাকা খেয়ে যাও কেন? তার মানে যার যা আছে তার দরকারমত তা হাজির হয় না। দেখানো যায় না। নইলে দ্যাখো, আমার নাক আছে, এই তো ফোঁস ফোঁস করে নিশ্বাস ফেলছি। প্রকাণ্ড নাক, পাটাটা ফুলে উঠে উঠে তোমার এই গোটা ঘরটা ভরে ফেলছে, টের পাচ্ছ? চোখ নয়, কিন্তু চাউনিও দেখাতে পারি। ভাটার মতো ধক্‌ধক্‌ জ্বলে, কখনও দ্যাখোনি? সাপের মণি? তার কাছে চন্দ্রসূয্যি হার মেনে যায়, তো সাপের মণি। মাঝরাতে মাঠের মধ্যিখানে সেই চোখ চেয়ে থাকে। কখনও বাঁশঝাড়ের মাথায়, কখনও ঝাউবনের কোণে, কখনও—"

"থাক, থাক," আমি বলে উঠলুম. "ব্যাখ্যানা করে শোনাতে হবে না।" সে তবু বলে গেল. "শুনছ তো আমরা কথাও বলি। আমাদের কত যে রকমারি আওয়াজ, তুমি ভাবতেও পারবে না। শোঁ-শোঁ—মনে হবে হাওয়া বইছে। ঠক-ঠক, মনে হবে কেউ কিছু ঠুকছে। ছপ ছপ—যেন জল ঠেলে কেউ হাঁটছে। এমনি হাজারো রকম, রাত্তিরে ঘুম না এলে যে-সব শব্দ তোমরা শুনেও শোন না, কিংবা বাজে বলে ঝেড়ে ফেলে দাও, আমরা সেইসবই কুড়িয়ে গলায় তুলে রাখি। খস্‌খস্‌, হুমহাম. দুটো পাহাড়ের মাঝখানে ছোটাছুটি করা প্রতিধ্বনি—আরও কত কী!"

"তবে যে," ঘাড়ের যে-জায়গায় নিশ্বাস লাগছিল সেখানটা চুলকে বললাম, "শুনেছিলাম. তোমাদের গলা খোনা?"

সে বলল, "আসলে ওটা তোমাদের ত্রৈলক্য মুখুজ্জে আর হেমেন রায়দেরই মগজে বোনা। আমাদের আদালতে ওদের নামে এখন অনেকগুলো মানহানির মামলা ঝুলছে।"

"মরার পরেও মামলা?"

"বা-রে, মামলা যে! মামলার নিয়মই তো ওই। মামলা মানুষকে মারে, মারার পরেও ছাড়ে না। পেট ফাঁসিয়ে দেবার পরও বুকে-মুখে আরও ছুরি চালায়, মড়াকে একেবারে সারা করে ছাড়ে।"

অনেকক্ষণ কোনও সাড়াশব্দ নেই। লেখা মাথায় উঠে গিয়েছিল। শেষে আমিই তাকে ডাকলাম, "কই? আছ?"

কোথা থেকে সে টোয়েন্টিনাইন খেলার ডাকের মতো গলায় বলল, "আছি।"

"একটা কিছু বলো। তোমাদের কী-কী শক্তি আছে যেন বলছিলে—সে-সব কী। গাছ থেকে হুড়ুং করে নামা. লম্ফঝম্প, ভূমিকম্প, ঘাড় মটকানো, এ-সব বিস্তর শুনেছি। আর? ভালো কিছু করতে পার?"

"ভালো বলতে কী বোঝো আগে তাই বলো।"

"ধরো. যেমন গান?"

"খু-উব", সে বলল, "তোমাদের চেয়ে ঢের ভালো পারি। তোমাদের গলায় তো মোটে একটা কি দুটো সুর লাগে—"

"না," তীব্র প্রতিবাদ করলাম—"সাতটা। আমরা সপ্তসুর বলি।"

"আমরা বলি সংশপ্তক। আমাদের গান আরও গ্রাম্ভারী।"

"সংশপ্তক?" অবিশ্বাসের সুরে বললাম, "কথাটার কি ওই মানে?"

একদম আমল না দিয়ে সে বলে গেল, "আমরা ওই মানেতেই বলি! তা-হলেই হল। আমাদের মানেতে।"

ওর এত লম্বাই-চওড়াই আর বরদাস্ত হচ্ছিল না। বললাম, "তোমার মুখেই শুধু বড়াই। এতই যদি পার, তবে দেখা দিচ্ছ না কেন? ওইটেই তোমার চালাকি, বুঝেছি। ধরা-পড়ার ভয়। আসলে তুমি হয়ত টিংটিঙে

এক তালপাতার সেপাই—"

সে বলল, "উহুঁ, তালগাছের। কিন্তু দেখা দেব কী! তুমি তো ভিতু!"

"দিয়েই দ্যাখো না। দেখতে পেলেই হয়ত আমার ভয় ভেঙে যাবে।"

"দেব তা-হলে?"

"দাও না," বললাম চ্যালেন্‌জের সুরে। বললাম, আর মনে মনে ভাবতে লাগলাম, না-জানি এক্ষুনি কী ঘটে যাবে। হয়ত হল্‌কা হাওয়ার ঝড় উঠবে, আলোটা দপ্‌ দপ্‌ জ্বলবে-নিব্‌বে, দূর থেকে কোনও প্যাঁচার ডাক, কিংবা ককিয়ে ককিয়ে একটা কুকুরের কান্না—আমি তবু বলতে থাকলাম, "দাও, দেখা দাও, দাও, দাও," কিন্তু চোখ বুজে।

"এই দ্যাখো, আমার নাক, এই আমার চোখ, আর এই—"

সে সত্যিই দেখাচ্ছিল কিনা জানি না, আমি তো পিটপিট করে তাকাচ্ছি, আর চোখ বন্ধ করে ফেলছি। না দেখেই ফরমাস করে বসলাম, "এ তো সব আলাদা আলাদা। সব মিলিয়ে তুমি একসঙ্গে, মানে গোটাটা কেমন, একবার সেটা দেখিয়ে দাও দিকি!"

তৎক্ষণাৎ সে যে কেমন হয়ে গেল! ভূতের নিশ্বাস এমনিতেই বেশ দীর্ঘ, দীর্ঘতর শ্বাস পড়ল, হাতি যেন শুঁড় দিয়ে জল ঢেলে দিচ্ছে, সেই ধরনে। শুনতে পেলাম মিইয়ে-যাওয়া সেই ভূত বলছে, "ওইটেই যে পারি না আমরা আলাদা করে অনায়াসে কখনো নাক, কখনো মুখ, হাত কিংবা ঠ্যাং হতে পারি, হয়ে যাই, কিন্তু আস্ত চেহারাটা আর কখনও ফিরে পাই না। পুরোটার মতো দেখতে হয়ে যদিই বা কখনও দাঁড়াই জেনো, সে ওই দেখতেই—বড়োজোর গোটা একটা কঙ্কাল। আমাদের রক্তমাংস দেওয়া হবে বলে কবে থেকে কত কথা শুনে আসছি; কত প্রস্তাব পাস হল, বাজেটের পর বাজেটে কত বরাদ্দ, কত প্ল্যান, কিন্তু যা ছিলাম, তাই আছি—অস্থিসার; ঠকঠক করে বাজে এমন কয়েকটা হাড়। এর বেশি কোথায় পাচ্ছি?"

যে-চোখ কারণে-অকারণে ধক্‌ধক্‌ জ্বলে, সে-চোখেও কি জলও জমে? জানি না। কিন্তু টের পেলাম ভূতের গলা যেন ভিজে। সে যখন কাতর হয়ে বলছিল, "আমরা কখনও পুরো চেহারার ভূত হতে পারি না," তখন গলে গিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বললাম, "আমরাই কি কেউ পুরো মানুষ কখনও হয়েছি, হতে পারি? যাক, ভূত, তুমি এ নিয়ে দুঃখ করো না।"

ওর যে-পিঠ নেই, সেই পিঠে আমি আস্তে আস্তে হাত বুলিয়ে দিতে থাকলাম।

ও কি সুখ পাচ্ছিল, ওর কি সুড়সুড়ি লাগছিল? ভূতের কি সুখ-সুড়সুড়ি এইসব থাকে? বলতে পারব না। ও কি ঘুমিয়ে পড়েছিল? ভূতেদের ঘুম থাকে কিনা,

তা-ও ঠিক জানি না। ও আছে এই ঘরের মধ্যেই, কিন্তু ছোঁয়াছুঁয়ির বাইরে; তাই গা ছমছম করছিল।

ওকে সেটা বুঝতে দিলাম না।

সেই নিশ্বাসটাও আর পড়ছিল না। তবু ও চলে যায়নি, এটা ঠিক। গেলে, গল্পে যেমন পড়েছি, কোথাও কোনও ডাল মড়াৎ করে ভেঙে পড়ার শব্দ হত।

কাঁটা ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে রেডিও-তে যেমন ঠিক মীটার-ব্যান্ডটা ধরে, আমিও তেমনই ওর গলা তখন খুঁজে মরছি। যেন ফোন করছি নম্বরের পর নম্বরে, ডায়াল ঘুরিয়ে। খটখট, খটখট আওয়াজ। কেটে যাচ্ছে। পাচ্ছি না। অনেক পরে, হয়রান হয়ে, আমি যখন কপালের ঘাম মুছছি, তখনই যেন ফিসফাস গলা ফের শুনতে পেলাম "হ্যা—লো!"

ধড়ে যেন প্রাণ ফিরে এল। বললাম, "এই! এতক্ষণ তোমার সাড়াশব্দ পাইনি কেন?"

"ঠিক নম্বরটা ডায়াল করতে পারিনি বলে।"

বললাম, "ভূত! তোমার টেলিফোন নম্বর কত?"

"টেলিফোন?" সে বলল, "আমাদের তো টেলিফোন নেই, খালি টেলিপ্যাথি আছে। খুব প্যাথেটিক ভাবে আমাদের মৃত্যু হয়েছিল কিনা, তাই পরে আলাপ-সালাপ যা, তা টেলিপ্যাথেটিক কায়দাতেই হয়ে থাকে।"

"সে আবার কী?"

"বুকের শিরে-শিরে অনুভব" সে হেসে বলল, "আর কিছু না।"

এই কথা শুনে আমার বুকটাও শিরশির করে উঠল। বললাম, "ভূত, তুমি ছেলে, না মেয়ে?"

টের পেলাম সে আবার হাসল।—"মেয়ে হলেই জানি তোমার জমত বেশি। কিন্তু এটা তো ছোটদের গল্প, তাই ছেলে হলেও ক্ষতি নেই। চলবে।"

বাইরে কার পায়ের শব্দ পাওয়া যাচ্ছিল। তক্ষুণি ভূত উসখুস করে উঠল।—"কে আসছে, আমি চলি।"

"থাকোই না," আমি যেন তার হাত ধরে টানতে গেলাম, "কেউ এলেই তোমাকে বুঝি যেতে হবে? কেন?"

সে বলল, "তাই নিয়ম। যতক্ষণ কোথাও একজন, আমরাও ততক্ষণ। যেই আর-একজন এল, ওমনি আমরা নেই। দু'জনে মিলে একসঙ্গে ভূত দেখেছে, শুনেছ কোথাও? কক্ষনো শুনবে না। এমন কী একটা বাড়িতে একই রাতে দু'জনই হয়ত দেখতে পেল এমন হয়েছে, কিন্তু আলাদা সময়ে, আলাদা ভাবে।"

ভেবে দেখলুম, কথাটা ঠিক বটে। বললাম, "ভয়ও তো তাই।" সে বলল, "একই নিয়মে বাঁধা যে, যত ভয় আর যত ভূত, আমরা সব্বাই!"

চিন্তিত সুরে বললাম, "তুমি বলছ তা-হলে একা হলেই ভূত?"

"একা হলেই।"

বিমর্ষ বোধ করছিলাম। আকুল হয়ে বলে উঠলাম, "ভূত, আমার তা-হলে বোধহয় আর উপায় নেই। দু'জন কেন, দশজনের মাঝখানে থাকলেও আজকাল আমি কেমন একা হয়ে যাই, ভয় লাগে, মনে হয় পাশে কেউ নেই।"

"তা-হলে তুমি মরেছ," সে নিষ্ঠুর করে বলল আর তৎক্ষণাৎ আমি জবাব দিলাম, "যেমন তুমি?"

সে কথাটা গায়ে না মেখে আবার বলল, "তুমিও। তুমি এখন রোজ যা পড়ো, যা নিত্য দ্যাখো, কানে শোনো, মানুষের মুখে যে-সব শুনে চমকে ওঠো, তার কি মানে বোঝো? না। তার মানে, তুমি আর এখন নেই, এখানে নেই, বর্তমান নও, অতীত হয়ে গেছ। অতীত কথাটার একটা মানে তো ভূত? তুমিও তাই—"

"বলতে চাইছ তুমি যে, আমিও সে?"

অনেক রাতের হাওয়া-পাওয়া নদীর মতো ছলছল গলায় সে বলল, "অবিকল।"

চিমটি কাটলাম নিজেকে, হাতের নাড়ি ধরে পরখ করলাম। কাঁপা কাঁপা গলায় বলতে থাকলাম, "ভূত, আমি জানি না, তুমি আগের জন্মে কী ছিলে—"

"কী মনে হয়?"

"ভাষা শুনে কখনও মনে হয় কবি-টবি কিছু। ইতিহাস থেকে মাঝে মাঝে যেমন বুকনি ঝাড়ো, মনে হয় তুমি ছিলে হিস্টরিয়ান। আবার যে-রকম ধোঁয়াটে তোমার কথাবার্তা, তুমি দার্শনিকও হতে পার।"

সে বলল, "না, শুধু ড্যাবডেবে চোখে চেয়ে থাকি—আমরা তাই দর্শন। আকারই যখন ধোঁয়াক্কার, তখন কথা তো একটু ধোঁয়াটে হবেই—হবে না? আমরা মরে গেছি তাই বলতে পার, আমরা মামুলি ঐতিহাসিক নই, এক অর্থে নিজেরাই এক-একটা ইতিহাস। সৃষ্টির গোড়া থেকে আজ অবধি কত জন, ভেবে দ্যাখো। সত্যি বলতে কী, আমরাই তো মেজরিটি, সংখ্যায় তোমাদের চেয়ে অনেক বেশি। যারা দলে ভারী, তারা একটু দাপট দেখাবে না?"

বললাম, "কিছু বুঝতে পারছি না। বলো তো আসলে তুমি কী?"

তৎক্ষণাৎ কাঁচুমাচু হয়ে গিয়ে সে বলল, "আসলে আমি ছিলাম সামান্য একজন মাস্টার।"

"পাত্তা পাও, মানে ওখানে?"

সে বলল, "আগে পেতাম একটু-আধটু। লোকে মান্যিগণ্যি করত। হালে যারা আসছে, শুনছি কেউ বিপ্লবী, কেউ শহীদ, কেউ জওয়ান—কোণঠাসা হয়ে আছি, কোথাও কলকে পাচ্ছি না। এই ভাগ্যটাই মেনে নিয়েছি, ওদের জুলুম-জবরদস্তি মুখ বুজে মেনে যাওয়া। ওদের জোর বেশি। জলে বাস করে কুমিরের সঙ্গে কে বিবাদ করে?"

বললাম, "ভূত, তোমার তো তবে বড়ো দুঃখ! মরেও শান্তি পাচ্ছ না?"

ঘাড় নেড়ে নেড়ে সে বলল, "না।"

"মরার পরেও যদি এই," মাথা চুলকে চুলকে বললাম,

"আচ্ছা, ভূত, তোমাদের, মড়াদের তল্লাটে জ্যান্ত কেউ নেই, সত্যিই নেই? কখনও হয়ে ওঠে না?"

সে বলল, "একদম না। সবাই যা আছে, তাই থাকে, নিয়মে-হুকুমে টিকিতে টিকিতে বাঁধা—"

বাধা দিয়ে বললাম, "একবারও কি কেউ—"

সে বলল, "একবার, হ্যাঁ, একবার। একবারই জ্যান্ত ছানা একজনের হয়েছিল—পান্ত ভূতের। তা তৎক্ষণাৎ সকলে মিলে তাকে পরাভূত করে দিল।"

"সে আবার কী?"

"একঘরে, ঘাড় ধাক্কা দিয়ে নির্বাসিত আর কী। যারা হয়, ভূতেদের ভাষায় আমরা তাকে পরাভূত বলি।"

সব এলোমেলো হয়ে যাচ্ছিল। বললাম, "তুমি খালি হেঁয়ালি করো। এই যে এতক্ষণ কথা বললে, সত্যি বলছি, আমি তার সবটা বুঝতে পারিনি।"

"চেষ্টা করলেই পারবো। মানে হল উঁচু ডালে ফলে-থাকা ফলের মতো। আঁকশি দিয়ে পেড়ে আনতে হয়।"

"পারব" আমি তার সুরে সুর মিলিয়ে বললাম, "আমিও যেদিন মরব। সেদিন হয়ত। মরে গিয়ে তোমাদের ভাষা পাব, সমান হব।"

সে চুপ করে শুনল। টের পেলাম, আবার তার বুক থেকে বাতাস বেরিয়ে যাচ্ছে। বললাম, কী হল? ফের দীর্ঘনিশ্বাস ছাড়ছ যে?"

সে বলল, "কিছু না। তোমার কথা শুনছিলাম। তুমি বললে, মরে গিয়ে আমাদের সমান হবে। কত সহজে বললে। জ্যান্ত কিনা, তাই পার। তোমরা বড় অহংকারী। অথচ কই, আমি তো বলতে পারলাম না যে, বেঁচে উঠে তোমাদের সমান হব?"

"তার মানে বলছ বাঁচা কঠিন, মরার চেয়ে?"

সে বলল, "অনেক। পারলাম না, পারিনি। তাই তো সরে পড়লাম, এলাম পালিয়ে।"

সে হাসছিল, না কাঁদছিল, বোঝা গেল না। যখন হাসে, তখন সে হায়েনা, কিন্তু যখন শুধু তার কান্না?

ইনিয়ে বিনিয়ে সে বলছিল, "যেদিন মরেছিলাম সেদিন ভেবেছিলাম বাঁচলাম। তখন কি জানতাম, ভূত হয়ে আরও অনন্তকাল বাঁচতে হবে, মরার পরও বাঁচা আছে? এই জন্মেও সেই মিনমিনে মাস্টারির জের টানছি, একমাত্র ভূতনাথই জানেন আমার মুক্তি কবে।"

তাকে সান্ত্বনা দিতে বললাম, "ভূত আমাদের হিংসে কোরো না। আমাদেরও অনেক যন্ত্রণা, দেখতে পাও না? আমাদের ভয় কথায় কথায়, ভয় পদে পদে। তোমরা অন্তত ভয় থেকে মুক্ত যে!"

সে বলল, "বরং কাণ্ডকারখানা দেখে এখন আমরাই তোমাদের ভয় পাই।"

এই যে অদ্ভুত ভূত, যে হয়ত দুঃখী, বুঝি দার্শনিকও, একে নিয়ে আমি করব কী। এ যে খালি দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! কোথায় ভেবেছিলাম, ওর কাছ থেকে দু'চারটে রোমহর্ষক কাহিনী শুনে নেব, ধরা যাক, ওরই কোনও কীর্তিকথা, কাঁচা মাছ চুরি করে আনার ব্যাপার-ট্যাপার, ও বলে যাচ্ছে আমি লিখে যাচ্ছি, সাংকেতিক কোনও নাম কিংবা আসন্ন কোনও ভয়ংকর ঘটনার আভাস, প্ল্যানচেটে যেমন লিখে থাকে, লিখতে লিখতে গায়ে কাঁটা, পড়তে পড়তে তোমাদের—তা নয়, এ যে

একেবারে একটা ভেতো ভূত, খালি ফোঁসফোঁস দীর্ঘশ্বাস ছাড়ে! ফল হল এই, লেখাটা বড়রা ছুঁয়েও দেখবে না, আমার কোনও লেখাই দ্যাখে না—ছোটরাও ভয়ে এড়িয়ে যাবে।

তার চেয়ে তোমাদের বরং নামকরা দু' চারটে ভৌতিক গল্প থেকে কিছু পড়ে শোনাই, এই ভেবে "গল্পগুচ্ছ"-খানা তাক থেকে টেনে নামালাম।

"রাত্রে বাতাসে তাহার হাড়গুলা খটখট শব্দ করিয়া নাড়িত...একটি চেতন পদার্থ অন্ধকারে ঘরের দেয়াল হাতড়াইয়া আমার মশারির চারিদিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে—"

পাতা উলটে তারপর

"যেন বহুদিবসের লুপ্তাবশিষ্ট মাথাঘষা ও আতরের মৃদুগন্ধ আমার নাসার মধ্যে...আমি সেই দীপহীন জনহীন প্রকাণ্ড ঘরের প্রাচীন প্রস্তরস্তম্ভশ্রেণীর মাঝখানে ...ঠুন ঠুন ধ্বনি, বারান্দা হইতে খাঁচার বুলবুলের গান, বাগান হইতে পোষা সারসের ডাক আমার চতুর্দিকে একটা প্রেতলোকের রাগিণী সৃষ্টি করিতে লাগিল..."

আর-একটা গল্পে

"সেই কঙ্কালের আট আঙুলে আংটি, করতলে রতনচক্র, প্রকোষ্ঠে বালা...তাহার আপাদমস্তক অস্থিতে অস্থিতে এক-একটি আভরণ..."

আবার :

"অন্ধকারে ময়দানের গাছগুলো ভূতের নিস্তব্ধ পার্লামেন্টের মতো পরস্পর মুখোমুখি দাঁড়াইয়া রহিল, এবং গ্যাসের খুঁটিগুলো যেন সমস্তই জানে অথচ কিছুই যেন বলিবে না..."

"নকল করছ?" সে যেন ঝুঁকে পড়ে বিদ্রূপ করল। টের পেলাম, সে আবার এসেছে।

—এই রকম বাছাই কয়েকটা লাইন টুকে রাখছিলাম তাকে বললাম, "শোন, শোন। তোমাদেরই গল্প। মাস্টারমশাই, মণিহারা, কঙ্কাল, ক্ষুধিত পাষাণ—পড়েছ, নাম শুনেছ?"

ঠোঁট উলটে সে বলল, "দূর দূর, সব বানানো, সব কাব্যি। দুরাশা নামে একটা গল্প আছে না? সেটাও পড়েছি।" বলেই সে একটা খিলখিল হাসি যেন চাপতে চেষ্টা করছিল। গল্পগুচ্ছের মলাটে-লেখা নামটা দেখিয়ে দিয়ে সে বলল, "তোমাদের ওই রবিঠাকুরেরও কী শাস্তি হয়েছে মরে গেলে দেখতে পেতে। বদ্রাওনের ওই নবাবপুত্রী, কেশরলালকে যে ভালবেসে ঠকেছিল? ভালই তো শুধু বেসেছিল, পায়নি তো! কেশরলালকে না পেয়ে সে এখন পাকড়াও করেছে খোদ লেখককে।" "বিয়ে করো, বিয়ে করো বলে তাঁর দাড়ি ধরে ঝুলোঝুলি করছে। সে দৃশ্য যদি দেখতে!"

"কবির কী অবস্থা?" জিজ্ঞাসা করে বাতাসে কান খাড়া করে রাখলাম। ভূতের গলা ভেসে এল, "কেমন অবস্থা আবার! খুব করুণ, এর বেশি আর কী বলব। ভদ্রলোক লুকিয়ে থাকেন, পালিয়ে বেড়ান—ঠিক তাঁর গানে যেমনটি লিখেছেন—পাছে নবাবপুত্রীর খপ্পরে পড়ে যান সেই ভয়ে। সামাজিকতা, নেমন্তন্ন রাখা, সব বন্ধ। গল্প লেখায় কী শাস্তি বলো তো! গোলাম কাদের খাঁর বেটি এখন শোধ তুলছে।"

আমার মনে রবি বর্মার আঁকা বিশ্বামিত্র-মেনকার ছবিটা এসেছিল, দৃশ্যটা অবশ্যই হাস্যকর, কিন্তু তোমাদের জন্যে সেকথা সবিস্তারে লেখা তো যাবে না।

"তাই বলছি," ভূত বলে গেল, "আজেবাজে বানানো কথা একদম লিখবে না। যা জানো তাই লিখবে, নইলে—শুনলে তো? তোমরা লেখো ভুল, সব মিথ্যে, আর দোষ চাপাও ছাপাখানার ভূতেদের কাঁধে। ওরা এমন কিছু ক্ষতি করে না, বরং ভুলভাল ব্যাপারগুলো আরও ভুলে ভর্তি করে ঝাপসা করে দিয়ে উপকারই করে। মাইনাসে মাইনাসে প্লাস—বুঝেছ?"

"মাস্টার মশাই!" আমি মনে মনে ভাবলাম। মুখে বললাম, "স্বভাব যায় না মলে এই কথাটার আপনি দেখছি একটা আস্ত উদাহরণ।"

কেমন অবাক হয়ে সে বলল, "হঠাৎ এত সমীহ যে।"

"সমীহ কোথায় আবার?"

"হঠাৎ খুব খাতির, একেবারে আপনি-টাপনি বলতে শুরু করেছ—"

"আপনি মাস্টার ছিলেন শুনলাম কিনা, তাই।"

"ওঃ, তাই!" সে খুব করে ভাবল, "দ্যাখো, সম্মান-সমীহ ভূতেদের ওসব দেখিও না। সম্মানের ভান বুকে অপমানের মতো বাজে, মড়ার ঘাড়ে খাঁড়ার মতো পড়ে। অশ্রদ্ধা-অবহেলা, হাসি-তামাসা এইসবই বরং সয়ে গেছে। ভূতেরা যেমন আছে থাকতে দাও, তোমাদের যত পুজোর ফুলটুল, তা যে-সব দেবতাদের মন্ত্র মুখস্থ করেছ, তাদের পায়ে ঢেলে দিও। ওঁরা ওতে তুষ্ট হন, আমরা হই না। আমাদের যা প্রণামী দিচ্ছ, সেইটুকু দিয়ে যেও, তা-হলেই যেখানে আছি, যেভাবে আছি, সেইভাবেই বহাল থাকতে পারি।"

মেঘ কেটে গেছে, রাস্তায় লোকজনের সাড়া মিলছিল। মনে হল, উনি এবার সরে যাবেন, যাওয়ার উদ্যোগ করছেন। লম্বা হাই তোলার মতো শব্দ করে বললেন, "যা—ই।"

কেউ গেলেই আজকাল বাঁচি, তবু মিষ্টি কথা বলে বিদায় দিতে হয়, তাই বললাম, "যাবেন নেহাৎই? যান। আসবেন কিন্তু আবার।"

তিনি বললেন, "আসব। কোন উপলক্ষে ডাকলেই দেখবে হাজির।"

বললাম, "বলছেন বটে কিন্তু ঠিক বিশ্বাস করতে পারছি না। ধরা যাক, কোন বিয়ে পৈতে কি শ্রাদ্ধ উপলক্ষে

—কিন্তু আপনি লৌকিকতা, সামাজিকতা এসবের ধার ধারেন কি? আপনি তো অলৌকিক।"

তিনি ভরসা দিলেন, "তবু আসব। খালি শ্রাদ্ধ বাদে। শ্রাদ্ধে আমরা আসি না, যার ব্যাপার তাকে হাতের মধ্যেই পেয়ে যাই কিনা!"

বললাম, "বুঝলাম। কিন্তু মাস্টারমশায়, আপনার ঠিকানা কী, আপনাকে পাব কোথায়?"

"জানো না, সত্যি জানো না?"

আমতা আমতা করে বললাম, "শুনেছি আপনারা থাকেন, শ্মশানে-মশানে, শ্যাওড়া গাছে কি পোড়োবাড়িতে, কিন্তু ভূত মশাই, যাই বলুন সে-সব জায়গায় যেতে সাহস হবে না।"

শ্মশানে-মশানে শুনেই তিনি অট্টঅট্ট হাসতে থাকলেন।—"কে বলেছে? যত্তো সব গাঁজাখুরি।"

"থাকেন না?"

"থাকতাম।" তিনি বললেন, "আজকাল আর থাকি না। আমাদের ওখানে আজকাল ভারী স্পেস শরটেজ যে! তোমাদের এই ঘিঞ্জি শহরের চেয়ে ঢের বেশি। চারধারে

নিত্যি ডজন ডজন অপঘাত, ভূতের দেশে জনসংখ্যা ভীষণ বেড়ে গেছে. পরিবার পরিকল্পনা করেও থৈ পাচ্ছি না।"

"রিফিউজি-র ঢেউয়ের মতন?"

তিনি বললেন, "তার চেয়েও বেশি। শ্মশান-মশান, পোড়োবাড়ি সব ভরে গেছে, আমরা তাই ঠেলে এসেছি লোকালয়ে। সর্বত্র আমাদের পাবে—হাটে বাজারে, ইস্টিশনে, রেলের কামরায়, আফিসে, কলেজে, হরেক পারটির আস্তানায়, দপ্তরে, রাস্তাঘাটের কোণের ছায়ায় ছায়ায়—কোথায় নয়? এমন-কী" তিনি একটু থেমে বললেন, "সর্ষের মধ্যেও আমরা ছেয়ে গেছি।"

হতভম্ব আমার মাথায় আলগা একটা টোকা দিয়ে তিনি বললেন, "সর্ষে কথাটার মানে বুঝলে না? যে-কোনদিন লালবাজারে উঁকি দিয়ে দেখো, কিংবা তোমাদের ওই মহাকরণ না কী বলে সেখানে, তা-হলেই টের পাবে।"

তখন টের পেলাম, মাস্টার নয়, ফিলজফারও নয়, ইনি আসলে এক পলিটিক্যাল ভূত।

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী
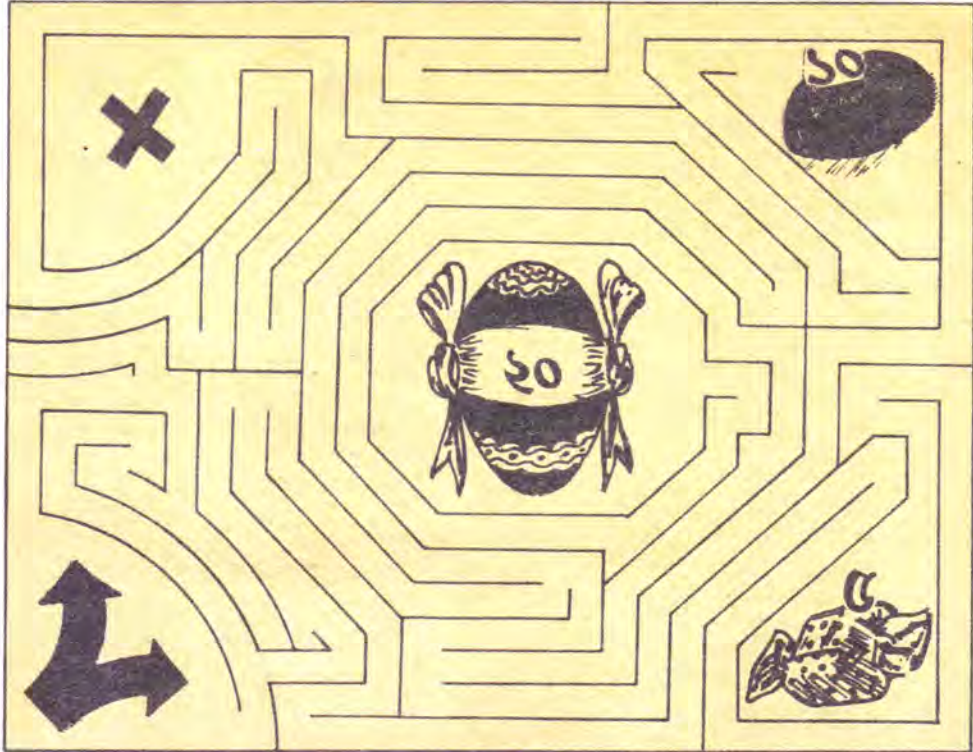
মোট তিনবার পৌঁছবার চেষ্টা করা চলবে নম্বর দেওয়া ঘরগুলিতে—তীর চিহ্ন থেকে। পৌঁছলে তত নম্বর পাওয়া যাবে কিন্তু একবারের বেশি এক ঘরে পৌঁছলে আর নম্বর নেই। × চিহ্ন ঘরে পৌঁছলে এ-পর্যন্ত সব নম্বর কাটা যাবে। মনে থাকে যেন—মোট তিন দান!

ভাসুরকের ভাগ্য

পরিমল গোস্বামী

রাজা ভাসুরক ফরাসে তাকিয়ায় হেলান দিয়ে চোখ বুজে বসে আছেন। তাঁর রাজমস্তকে তেল মালিশ করছেন রাজভৃত্য। রাজার মাথায় কেশরের দারুণ অভাব. দেখতে বিশ্রী, মনে হয় টাক পড়বে। জুনাগড়ের গির জঙ্গলের রাজত্বে তাঁর শ খানেক পুরুষ জ্ঞাতি আছেন, তাঁদের মাথারও ঐ একই অবস্থা। তবু যদি এই নতুন তেলে ঘন কেশর গজায়। রীতিমতো বিজ্ঞাপন দেখে কেনা কিনা, যদি কেশর গজায় তবে জ্ঞাতিকুটুম্বদেরও দেওয়া

যাবে এক বোতল করে। রানীদের মাথায় তো কেশরই নেই, তাদের ভারী সুবিধা।

ভাসুরক আগেও নানা তেল মেখেছেন, কিন্তু সব ধাপ্পা। এবারের নামটা তাঁর বড় পছন্দ, মহাকেশরাজ তৈল নবরত্নভস্ম মেশানো। কেশরাজ মানেই বা কী, আর নবরত্নভস্মই বা কী, ভগবান জানেন।

ভাসুরক চোখ বুজে আরামে ভাবছেন আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা যখন ইউরোপে থাকতেন তখন তাঁদের কেশরের ভাবনা ছিল না। এখন তো সেখানে সিংহই নেই, তাঁরা গিয়ে জুটেছেন আফ্রিকায়। কেশর আমাদের একটা গর্বের জিনিস। হায় হায়, আমাদের, ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা যদি তখন বুদ্ধি করে এই হতভাগা জুনাগড়ে না আসতেন, তাহলে কত ভালই না হত।

রাজভৃত্য বানর তেল মাখাতে মাখাতে ভাবছেন: পশুরাজ কী বোকা! তেলে কখনো কেশর গজায়? কিন্তু সে কথা তো আর মুখে বলা যায় না, বললেই চাকরিটি যাবে।

ভাসুরক ভাবছেন সবাই মিলে এখন আফ্রিকায় চলে গেলে হয় না? কিন্তু...সরকার অনুমতি দেবে না। পাসপোর্ট দেবে না। রিজার্ভ ব্যাংক টাকা দেবে না।... উঃ একেই বলে বেঁধে মারা।

রাজভৃত্য ভাবছেন: বোকা রাজার চাকরিতে কিছুই সুখ নেই, ভাণ্ডার থেকে বড় রকমের চুরিও কিছু করতে পারি না, যা করি তার নাম ছেঁচড়ামি। সেই সেকালে আমাদের ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার ঠাকুর্দারা রামের চাকরিতে কী সুখেই না ছিলেন। সেই রাবণের সঙ্গে যুদ্ধ করা, সেই সীতা উদ্ধারে সাহায্য করা...উঃ সে রামও নেই সে অযোধ্যাও নেই।

ভাসুরকের হঠাৎ মনে হল কেশরাজ মানে কী? এই কথাটা বার বার মনের মধ্যে খোঁচা মারছে, তা হলে তো জানতে হয় মানেটা। তিনি রাজভৃত্য বানরকেই জিজ্ঞাসা করে বসলেন, ওহে মর্কট, তেল তো মাখাচ্ছিস, কেশরাজ মানে কী, জানিস?

রাজভৃত্য বললেন, আমি মূর্খ বান্দর, আমি কি কোনো কিছুর মানে জানি, মহারাজ? আপনি না হয় মন্ত্রী-মশায়কে জিজ্ঞাসা করুন, তিনি নিশ্চয় বলতে পারবেন; বান্দরের কাছে কি কেউ কোনো মানে জিজ্ঞাসা করে?

ভাসুরক বললেন, ওহে বানর, তুই ঠিক বলেছিস, কথাটা আমার ভাল লাগল। এ মাস থেকে তোর মাইনে এক টাকা বাড়িয়ে দিলাম।

রাজমন্ত্রীকে ডাকা হল। রাজমন্ত্রী হনুমান। রামের বন্ধুর বংশধর। তিনি শুনে বললেন, বড় কঠিন প্রশ্ন, মহারাজ। আমার মনে হয়, যে-কেশরাজ নাম মহারাজের এত পছন্দ, তার মানে সহজ হতেই পারে না। সহজ হলে কি ঐ তেল আপনার মাথায় উঠতে সাহস পেত? এর অর্থ বলতে পারবেন সভাপণ্ডিত মশায়।

বুদ্ধিমানের কথা বলেছ মন্ত্রী, খুব বুদ্ধিমানের কথা। এ মাস থেকে তোমার মাইনে দু টাকা বাড়িয়ে দিলাম। ডাক পণ্ডিতকে।

রাজভৃত্য বললেন, আর তেল মাখাব না?

না। আগে মানেটা বুঝি।

সভাপণ্ডিত এলেন। তাঁর মুখ ছুঁচলো, চোখে চশমা, গায়ে সিলকের ফতুয়া, চোখে চটুল দৃষ্টি, ল্যাজ ফাঁপানো, তার ভিতর নানা উপাধি গোঁজা, তাইতে ল্যাজটা মোটা দেখাচ্ছে বেশী। পণ্ডিত এগিয়ে এসে ভাসুরককে প্রণাম করে জিজ্ঞাসা করলেন, ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া?

ভাসুরক বললেন, মাথায় যে তেল মাখছি তার নাম মহাকেশরাজ। এখন বল তো পণ্ডিত, কেশরাজ মানে কী? মানে না জানলে তেলটা মাখা ঠিক হচ্ছে কিনা বোঝা যাচ্ছে না।

পণ্ডিত ভাবলেন, এ তো মহা মুশকিলে পড়া গেল। ভয়ে তাঁর ল্যাজ কাঁপতে লাগল।

দেরি দেখে রাজা গর্জন করে উঠলেন। ভাবছ কি পণ্ডিত, ঝটপট বলে ফেল, নইলে এ মাস থেকে তোমার মাইনে দু-টাকা কমিয়ে দেব।

পণ্ডিত জোর করে একটু হেসে বললেন, ভাবছি না কিছু, ম-ম্মহারাজ।

ভাবছ না, তবে ল্যাজ কাঁপছে কেন?

আনন্দে ম-ম্মহারাজ। অর্থ সোজা। এটা একটা স্বরসন্ধির ব্যাপার। তার মানে, কেশর+আজ=কেশরাজ। তার মানে, আজ মাখলে আজই কেশর গজাবে।

যদি না গজায়?

তা হলে জানা যাবে ঠকিয়েছে।

ঠকিয়েছে? ঠিক তাই। একবেলা ধরে মাখছি, কেশর যা ছিল তাই আছে, একটাও বেশি গজায়নি। তোমরা ঠিকানা দেখে নিয়ে যুদ্ধযাত্রা কর ওদের বিরুদ্ধে। সমস্ত গির রাজ্যে ঘোষণা করে দাও। পাঁচশ গাধাকে যুদ্ধ ঘোষণার কাজে লাগাও। সবাইকে যেতে হবে, আমিও যাব। যারা তেল তৈরি করে ঠকিয়েছে সেই চোরদের ধরে ধরে হাড়সুদ্ধ চিবিয়ে খেতে হবে।

উত্তেজনায় ভাসুরকের সকল গা কাঁপছে। গোঁফ ফুলে ফুলে উঠছে। যে কটা কেশর ছিল মাথায়, তাও খাড়া হয়ে উঠছে থেকে থেকে।

যথাসময়ে যুদ্ধযাত্রা আরম্ভ হবে, এমন সময় ভাসুরকের নামে এক চিঠি এলো। চিঠি পড়ে ভাসুরক ভীষণ গর্জন করে উঠলেন। এর মানে কী?

মন্ত্রী বললেন, কীসের মানে মহারাজ?

এই চিঠির মানে। আদেশ দাও, যুদ্ধযাত্রা এক ঘণ্টার জন্য স্থগিত রইল। সব তৈরী থাক, এক ঘণ্টার মধ্যেই যাত্রা করতে হবে। তারপর মন্ত্রীকে বললেন, এই যে লিখেছে দেশী রাজাদের রাজত্ব আর থাকবে না, সরকার টাকা দেওয়া বন্ধ করবে, আর সব কী লেখা আছে মানে

বুঝি না।...পণ্ডিত! পণ্ডিত!

ক্যা-ক্যা-ক্যা হুয়া ম-ম্মহারাজ?

শোন পন্ডিত, এই যে লেখা আছে সোশ্যালিজম আসছে, এই কথাটার মানে কী? সোশ্যালিজম লোকটা কে? বিদেশি বলে বোধ হচ্ছে না? কিন্তু সে আসছে শুনেই আমাদের টাকা বন্ধ?

পণ্ডিত চিঠি নিয়ে অনেক চিন্তা করে বললেন, এইবার বুঝেছি ম-ম্মহারাজ।

কী বুঝেছ?

ভয়ে বলব, না, নির্ভয়ে বলব?

নির্ভয়ে বল।

তা হলে শুনুন, ম-ম্মহারাজ। সোশ্যালিজম কোনো মানুষ নয়। কথাটিতে কিছু ধাঁধা আছে। ওর প্রথম অক্ষরটি বাদ যাবে। তা হলে থাকবে শ্যালিজম। তার মানে...শেয়ালিজম। ম-ম্মহারাজ, এবারে শেয়ালেরা কিছু করবে মনে হয়।

কী করবে?

সেইটিই তো ভাল বোঝা যাচ্ছে না। বোধ হচ্ছে রাজ্য চালাবে। আর—

মন্ত্রী বাধা দিয়ে বললেন, পণ্ডিতমশায়, রাজাই যদি না থাকে, রাজ্য চালাবে কী করে?

পণ্ডিত বললেন, তা নয়, রাজ্য থাকবে। চালাবে শেয়ালেরা।

এইসব কথা শেষ হতে না হতে কথাটা আগুনের মতো ছড়িয়ে পড়ল শেয়াল সমাজে। ভাসুরকের সকল শেয়াল-প্রজা বনের মধ্যে সমবেত কণ্ঠে গান গাইতে লাগলেন 'আমরা সবাই রাজা আমাদের এই শেয়াল রাজত্বে।'

ভাসুরক ভীষণ গর্জন করে উঠলেন, পণ্ডিত, এ কী শুনি? শেয়াল রাজত্ব মানে কী?

পণ্ডিত মাথা নিচু করে রইলেন।

মন্ত্রী বললেন, পণ্ডিতমশায়, আপনি সোশ্যালিজমের ভুল অর্থ করেছেন।

ভাসুরক উত্তেজিত ভাবে বললেন, ভুল অর্থ করেছে? তাহলে ওর মাইনে এ মাস থেকে অর্ধেক কমিয়ে দেওয়া হোক। বল মন্ত্রী, তাড়াতাড়ি বল, যুদ্ধে যেতে হবে।

মন্ত্রী বললেন, আপনি রাজা না থাকলে শেয়ালও রাজা থাকতে পারবেন না।

ভাসুরক বললেন, পরে কী হবে চুলোয় যাক, রাজ্য চুলোয় যাক, টাকা চুলোয় যাক। কিন্তু আমি এখনও রাজা আছি তো?

অবশ্য আছেন। এবং আমি মন্ত্রী আছি। যখন শেষ আদেশ আসবে, তখন দেখা যাবে কী করা উচিত। এখন তো যুদ্ধে যাওয়া যাক।

ভাসুরকের আদেশে সেনাদল এক পা তুলেছে এমন সময় একটা পাখি এসে রাজার কানে কানে বললেন, মহারাজ কীসের বিরুদ্ধে যুদ্ধ?

চুরির বিরুদ্ধে, প্রতারণার বিরুদ্ধে।

পাখি বললেন, সৈন্যদের থামতে বলুন।

ভাসুরক এই পাখিটাকে বড়ই ভালবাসতেন। পাখির কথায় যুদ্ধযাত্রা আরো আধ ঘণ্টার জন্য স্থগিত রইল। সৈন্যরা থেমে গেল, কিন্তু প্রস্তুত হয়ে রইল, আদেশ পেলেই আবার মার্চ করবে।

ওটি একটি টিয়া পাখি। পাখি বললেন, মহারাজ, বাইরের চুরি থামাতে যাচ্ছেন, কিন্তু আপনাকে যারা ঘিরে আছে, যাদের আপনি বিশ্বাস করেন, তাদের চুরির কী হবে? আগে কাছের চোরদের ধরুন।

তারা কে বল তো?

বলছি একে একে। এই শেয়ালদের কথাই ধরুন। তারা সবচেয়ে বড় চোর। আপনাদের জন্য যত মাংস আসে তার অর্ধেক ওরা চুরি করে।

আমার সভাপণ্ডিত তো শেয়াল, সে-ও কি চোর?

সেই তো প্রধান চোর।

বলতে না বলতে দেখা গেল, পণ্ডিত এবং সেনাদলে যত শেয়াল ছিল, তার একটারও টিকি দেখা যাচ্ছে না। সব পালিয়েছে।

ভাসুরক স্তম্ভিত। জিজ্ঞাসা করলেন, আমার মন্ত্রী? সে-ও চোর?

আপনার ভাণ্ডারের অর্ধেকের বেশি কলা আপনার ঐ মন্ত্রীর হাত দিয়ে তাঁর স্বজাতির মধ্যে চালান হয়ে যায়। যে রাজভৃত্য আপনার মাথায় তেল মালিশ করে, চাবিটা তার হাতে কে দেয়? আপনার ঐ মন্ত্রী।

বলতে না বলতে মন্ত্রী এবং মর্কট যাঁরা ছিলেন সব কোথায় যে গা ঢাকা দিলেন, বোঝা গেল না। সেনাদলে দেখা গেল একটা বানরও নেই। বোধ হয় মন্ত্রী সমেত তাঁরা গাছে উঠে ডালে ডালে লাফিয়ে রাজ্যের বাইরে চলে গেলেন।

ভাসুরক পাখিকে বললেন, তুমি ঠিক বলেছ টিয়া, যাদের বিশ্বাস করেছি এতদিন, তারা সবাই চোর। কিন্তু আমার জ্ঞাতিরা, তারা তো ভাল?

না মহারাজ, তাদেরও চুরির শেয়ার আছে। প্রত্যেকে ভাগ পায়।

ভাসুরক সব শুনে তো পাথর হয়ে গেলেন। একবেলা ঠায় একই জায়গায় বসে থেকে সন্ধ্যার দিকে ধীরে ধীরে উঠে সমুদ্রের দিকে চলতে লাগলেন। মন বড়ই খারাপ। পশুরাজের মন কি না, তাই আমাদের চেয়ে অনেক বেশি খারাপ।

ভাসুরক দূর থেকে দেখতে পেলেন, সমস্ত চোরাই জিনিস বিদেশে চালান হয়ে যাচ্ছে। স্বয়ং সভাপণ্ডিত ল্যাজ পেতে বসে মালের হিসাব লিখছেন। অন্যান্য শেয়ালরা খুব ব্যস্তভাবে নানা জিনিস এনে সেখানে জড়ো করছেন। তাঁদের প্রত্যেকের ল্যাজের সংগে একটি করে দু-চাকার চোকো টানা গাড়ি। আর স্বয়ং মন্ত্রীমশায়কে

দেখা গেল মস্ত একটা বোঝা পিঠে তুলে নিয়ে হুশ্ করে আকাশপথে উধাও হয়ে গেলেন।

ভাস্বরক সব দেখে শুনে একাই খুব হাসতে লাগলেন। হঠাৎ সব উলটে যেতে দেখলে কার না হাসি পায়? কিন্তু রাজহাসি বেশিক্ষণ থাকে না। এটাই নিয়ম। ভাস্বরকও গম্ভীর হয়ে গেলেন। তিনি হিংস্র হয়ে উঠলেন। তিনি ছুটে গিয়ে পণ্ডিত মশায়ের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন—পণ্ডিত মশায়ের গলা থেকে এবারে আর ক্যা হুয়া নয়, শুধু একটি ক্যাঁক শব্দ বেরুল মাত্র।

ভাস্বরক যখন তাঁর সভাপণ্ডিতের গলা থেকে দাঁত তুলে নিলেন তখন আর তিনি বেঁচে নেই।

পন্ডিতের জ্ঞাতিগোষ্ঠী সবাই তীরবেগে যে যেদিকে পারলেন পালিয়ে গেলেন। ভাস্বরক আর রাজ্যে ফিরলেন না। কোথায় যে তিনি চলে গেলেন তা কেউ বলতে পারল না।

পরে জানা গেছে তিনি জলন্ধরের এক পাগলা গারদে বাস করছেন, আর থেকে থেকে 'মন্ত্রী, তোমার মাইনে দু টাকা কমিয়ে দিলাম,' 'পণ্ডিত তোমার মাইনে একটাকা কমিয়ে দিলাম.' 'কোটাল তোমাকে বরখাস্ত করলাম'—বলে হুংকার ছাড়ছেন। তাঁর গলায় মস্ত এক মাদুলি বাঁধা। তাঁর মাথায় এখন রাজবৈদ্যরা তেল মালিশ করছেন।

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

প্রাপ্তিযোগ

লীলা মজুমদার

গুপির ছোটমামা বললেন, গোপালপুর বহরমপুর এ-সব জায়গায় গেছিস্ কখনো? একবার—

পানু বলল, হ্যাঁ, সেবার দাদুরা মুর্শিদাবাদ বহরম—, ছোটমামা হাসলেন, কীসে আর কীসে! এ সে বহরমপুর নয়। দক্ষিণ ভারতের রেল ধরে গঞ্জামের দিকে যেতে হয়। শেষ রাতে বাঁয়ে চিল্কার হ্রদ পেরিয়ে, বহরমপুরে নামতে হয়। চারদিক ভোঁ ভাঁ। ট্রেনটা ছেড়ে গেলে মনে হবে গোবি মরুভূমির মধ্যিখানে দাঁড়িয়ে আছিস। যদি কপাল ভালো থাকে এক-আধটা মেছো ট্রাক্ পেলেও পেতে পারিস। নয়তো সেই ভোরের বাস্ ছাড়া গতি নেই। আগে চল্ সেখানে, তারপর বাকিটা বলব।

এতো মহা গেরো। গুপি-পানুকে মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে দেখে, ছোটমামা আরো বললেন, কবে আমার কোন কথাটা শুনে কার এতটুকু ক্ষতি হয়েছে তাই বল্। বরং আমার অনেক সুবিধাই হয়ে গেছে। জানিস্-ই তো ছোটবেলায় অন্ধকার রাতে বাদুড়ের ডানার ঝাপটানি খেয়ে অবধি আমি আর সে-আমি নেই। তাই তোদের ডাকা। নইলে নিজেই তো পরম সুখে জীবন কাটাতে পারতাম। যাক্ গে, যার যেমন কপাল! এই বলে ছোটমামা এত জোরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেললেন যে টেবিলের ওপরকার কাগজ-চাপাটা একটু সরে গেল।

পানু বলল, কোথায় থাকা হবে? ছোটমামা যেন আকাশ থেকে পড়লেন। ওমা, তোদের বুঝি আসল কথাটাই বলা হয় নি? গোপালপুরের শহরতলিতে আমার মায়ের জ্যাঠামশাইয়ের একটা টিলার মাথায় বাড়ি আছে। সেখানে আমার প্রাপ্তি-যোগ আছে।

শুনে গুপি-পানু অবাক। প্রাপ্তি-যোগ আবার কী? কীসের প্রাপ্তি? ছোটমামা রেগে গেলেন. কীসের প্রাপ্তি কী করে বলব। সেটা কিছু একটা সমস্যাই নয়—। গুপি বলল এক যদি না পঞ্চত্ব প্রাপ্তি হয়। ছোটমামা কটমট করে একবার তাকিয়ে, বলে যেতে লাগলেন, এখন মুস্কিল হয়েছে যে বড়দাদু আমার মাসতুতো ভাই নাদুকেও ঠিক ঐ কথাই বলেছেন। কাজেই বোঝা যাচ্ছে, আমাদের মধ্যে যে আগে গিয়ে জিনিসটা খুঁজে বের করবে, প্রাপ্তি-যোগটা তার-ই হবে। অতএব আর সময়

নষ্ট করা নয়, আমরা আজ-ই রাতের গাড়িতে রওনা হচ্ছি।

হল-ও তাই। পরদিন থেকেই পুজোর ছুটি, কাজেই কারো বাড়ি থেকে কোনো আপত্তির কথা উঠল না। বরং এত কম খরচে এত দিনের জন্য ছেলে দুটো বাড়ি ছাড়া হচ্ছে জেনে বাড়ির সকলে যেন একটু খুশীই হল।

থার্ড ক্লাসে যাওয়া হল। যেখানে শত্রুপক্ষের প্রতিযোগিতার ভয় আছে, সেখানে ভিড়ের মধ্যে লুকিয়ে থাকাই ভালো। ছোটমামা বললেন, আর শুধু নাদু কেন, আরো কতজনকে ঐ কথা বলেছেন কে জানে। এককালে সারা পৃথিবী জাহাজে করে চষে বেড়িয়েছেন নানান জায়গা থেকে নানান জিনিস সংগ্রহ করেছেন। মাঝে মাঝে দেশে ফিরে, আমার মার কাছে পরম আদরে দু তিন মাস কাটিয়ে, আবার একদিন কাকেও কিছু না বলে হাওয়া হয়ে গেছেন। তা মা আদর করবেন না-ই বা কেন? ছোটবেলা থেকে শুনে এসেছি বড়দাদুকে বেচলে ও'র নিজের ওজনের সোনা পাওয়া যাবে। বুড়ো হয়ে অবধি গোপালপুরের ঐ টিলার মাথায় দূরবীণ হাতে দিন কাটিয়েছেন, নাকি সমুদ্রের গন্ধ না পেলে ও'র ঘুম হয় না!

পানু বলল, এখন তিনি কোথায় আছেন? নাকি মরে গেছেন? ছোটমামা চটে কাঁই। মরবেন কেন? পঁচাশী বছর বয়স হলেই মরতে হবে, এমন কোনো আইনের কথা তো শুনিনি। আছেন আমার মায়ের কাছেই। নাদুর মা-ও কম চেষ্টা করেন নি ভাগিয়ে নিতে। তা মা ছাড়লে তবে তো যাবেন। রোজ মাসী গিয়ে তাই বড়দাদুর পায়ের কাছে বসে থাকেন, যেন ভাজা মাছটি উল্টে খেতে জানেন না!

পানু বলল, পায়ের কাছে কেন?

আহা, মাথার কাছটি আমার মা ছাড়লে তবে তো সেখানে বসবেন! সে যাই হক, নাদুর আগেই হয়তো আমরা গিয়ে পৌঁছব। কারণ মা কাকে দিয়ে ওর বড় সায়েবকে ধরিয়ে ওকে টুরে পাঠাবার ব্যবস্থা করেছেন। এই বলে ছোটমামা একটু মুচকি হেসে চুপ-করলেন।

গুপি একবার ভিড়ের দিকে তাকিয়ে বলল, প্রকাশ্যে এত কথা বলা তোমার ঠিক হয় নি, ছোটমামা।

ছোটমামা বললেন, আরে, তাতে হয়েছেটা কী? সে ব্যাটা এতক্ষণে হয়তো পাণ্ডুয়ার জন-পরিসংখ্যান করছে!

শেষ রাতে ওরা বহরমপুরে নামল। সেখান থেকে মাইল পনেরো ষোল দূরে সেই টিলার উপরে বাড়ি। ভাগ্য ভালো একটা মেছো লরি সত্যিই পাওয়া গেল। মাথা পিছু এক টাকা দিয়ে তাতে চেপে ওরা রওনা দিল। নামল যখন পুব আকাশ তখন ফিকে হয়ে এসেছে। কানে এল একটা শোঁ-শোঁ শব্দ। এই শব্দ না শুনলে হয়তো ছোটমামার বড়দাদুর মন খারাপ হয়।

ছোটমামা কেবলি তাড়া দেন, চল্, চল্, সবার আগে পৌঁছনো দরকার। গিয়েই খোঁজা শুরু করে দেব। একটা ইংরিজি বইও এনেছি, তাতে গুপ্তধন পাবার একশো একান্নটা উপায় লেখা আছে। তবে একটা অসুবিধা হল যে সদর দরজার চাবি নাদুর কাছে, বড়দাদুর শোবার ঘরের চাবি আমার কাছে। এই রকম ভাগাভাগি করেছে বুড়ো। এখন ঢুকবটা কী করে তাই ভাবছি।

গুপি বলল, সে আবার একটা কথা হল ছোটমামা? আমি ঢুকিয়ে দেব। যতই তাড়াতাড়ি করার দরকার হোক না কেন, এইখানে একটা শেয়ালের বাচ্চা হঠাৎ ঝোপ থেকে বেরিয়ে, নাক ফুলিয়ে, ছোটমামার দিকে শুঁকতে থাকাতে, তিনি অমনি আঁউ-আঁউ শব্দ করে, হাত-পা এলিয়ে মুচ্ছো গেলেন। পানুর জলের বোতল থেকে মাথায় জল ছিটিয়ে, মুখে রেলের টাইমটেবলের হাওয়া দিয়েও, কিছুতেই তাঁকে খাড়া করা যেত না, যদি না গুপি হঠাৎ বলে বসত, এইরে, আমাদের আগেই কেউ এ পথে এসেছে! গেটটা দেখছি খোলা!

বলামাত্র তড়াক করে লাফিয়ে উঠে ছোটমামা হাঁচড় পাঁচড় করে, খোলা গেট দিয়ে ঢুকে, আঁকা-বাঁকা পথ ধরে, ওপর দিকে দৌড়তে লাগলেন। গুপি-পানুও পেছন পেছন ছুটল। ছোট টিলা, কিন্তু বড় বড় ঝাউ গাছে ঢাকা থাকাতে ওপরের দোতলা বাড়িটা দেখা যাচ্ছিল না। ওপরে উঠে ওদের চক্ষু স্থির! দরজা জানলা সব খোলা। ঘরের আসবাবপত্র তচনচ। তারি মধ্যে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, দেরাজ টেনে, টেবিলের টানা উল্টে, দেয়ালের ছবি নামিয়ে, রান্নাঘরের বাসনপত্র বাইরে এনে ছড়াছড়ি করে, দুটো লোক সে যা কান্ড বাধিয়েছে, তা আর কহতব্য নয়।

তার ওপর লোক দুটো সমানে পরস্পরকে যা-নয়-তাই বলে যাচ্ছে। পানু তো অবাক। আর ছোটমামা থপ্ করে সিঁড়ির ধাপে চোখ উল্টে বসে পড়লেন। গুপি বলল, এ কী নাদুমামা, হাঁদুমামা, এ কী কান্ড? তারা তখুনি ঝগড়া থামিয়ে উঠে এল। বুড়ো বুঝি তোদেরও পাঠিয়েছে? চাঁদুমাস্টারেরও কি প্রাপ্তি-যোগ আছে নাকি? ভালো চাস্ তো ওপরের ঘরের চাবি বের কর্, চাঁদু।

ছোটমামা পকেট থেকে একটা চাবি বের করে ছুঁড়ে দিতেই, গুপি সেটা ধরে ফেলে, দোতলায় চলল। ছোটমামা আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ালেন। নাদু, হাঁদু চটে কাঁই। বুড়োর চালাকি দেখে বলিহারি! আমাদের দিয়ে সারা বাড়ি খুঁজিয়ে, পেয়ারের নাতি চাঁদুমাস্টারকে শোবার ঘরের চাবি দিয়েছে!

দোতলায় একটি মাত্র ঘর। গুপি তার দরজা খুলে, চারটে জানলাও খুলে দিল। ভোরের ফিকে আলোয় অমনি ঘর ভরে গেল। নাকে এল সোঁদা সোঁদা সাগরের গন্ধ, কানে এল সমুদ্রের গর্জন। ঘরে কিন্তু একটি তক্তাপোষ, কাগজপত্রে বোঝাই একটি লেখার টেবিল, তাকের উপর একটি লম্প আর একটি হাত-বাক্স, খাটের

পাশে একটি মোড়া আর খাটের তলায় সমুদ্রের শামুক ঝিনুক ভরা ডালাশূন্য একটা পুরনো তোরঙ্গ ছাড়া আর কিছু ছিল না। আর ছিল সব জায়গায় রাশি রাশি বালি।

বালি দেখেই ছোটমামার হাঁচি উঠল। নাকে রুমাল চেপে তিনি তক্তাপোষে বসে পড়লেন। নাদুও টেবিলের কাগজপত্র মাটিতে নামিয়ে, আসন পিঁড়ি হয়ে বসে পড়ল। হাঁদু একটা তার দিয়ে হাত-বাক্সটা খুলে ফেলেই পেয়েছি, পেয়েছি, বড়দাদুর ভল্টের চাবি! ইউরেকা! এই বলে ঝড়ের মতো ঘর থেকে বেরিয়ে, ধুপধাপ করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে, আঁকাবাঁকা পথ দিয়ে দৌড়ে চলে গেল।

নাদু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে আরো কতকগুলো কাগজ এক পাশে সরিয়ে বলল, পেয়েছে না আরো কিছু! ভল্টের গয়না-গাঁটি কোন্‌কালে বুড়ো একে ওকে দান করেছে না! কিন্তু—কিন্তু এটার কথা আলাদা। এই বলে নাদুমামা একটা ছোট হলদে কাগজের কুচি হাতে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এই লটারির টিকিটেই আমার প্রাপ্তি-যোগ! ঘরদোর গুছিয়ে রাখিস্‌, চাঁদু, বুড়ো নইলে চটে গিয়ে, উইল ছিঁড়ে ফেলে দেবে, তা হলে তুই আর বাড়িটা পাবি না! এই বলে ধীরে সুস্থে নাদুমামাও ঘর থেকে বেরিয়ে, সিঁড়ি দিয়ে থুপথুপ করে নেমে চলে গেল। ছোটমামার হাতে-পায়ে খিল ধরে থাকবে, তাই তক্তাপোষে লম্বা হয়ে শুয়ে পড়ে বললেন, যা হয় কিছু খাবারের ব্যবস্থা করে, তোরা দুজন ঘরদোর গুছিয়ে ফেলিস্‌। আমার বেজায় দুর্বল লাগছে।

গুপি রেগেমেগে ভাঙ্গা তোরঙ্গটাকে উল্টে ফেলল। হুড়মুড় করে শামুক ঝিনুক আর আঁসটে গন্ধে ঘর ভরে গেল। শামুকের ভিতর মরা পোকার গন্ধ। পানু সঙ্গে আনা পুঁটলি খুলে লুচি, বেগুন ভাজা, মাংসের বড়া, সন্দেশ আর ক্ষীরের বরফি বের করল। ছোটমামা অমনি উঠে বসলেন।

খাওয়া-দাওয়ার পর হাই তুলে বললেন, নিদেন বাড়িটা যখন আমিই পাব, নাদু যেমন বলছে, তখন এটাকে তো এভাবে ফেলে রেখে চলে যাওয়া যায় না। তোরা উঠে সব গুছিয়ে ফেল। আমি শামুক-ঝিনুক-গুলো তুলে রাখি।

গুপি-পানুর এখানে কদিন থাকার মতলব। তারা তাই ছোটমামাকে চটাতে চাইল না। খুব বেশী জিনিসও ছিল না। সব যথা স্থানে তুলতে ঘণ্টা দুই লাগল। স্টোভ ছিল, তেল ছিল, চাল ডাল ছিল, মসলা ছিল। একটা কালো রোগা লোক মাত্র এক টাকায় এই বড় একটা চিংড়ি মাছ নিয়ে এসে, কেটেকুটে দিয়ে গেল। টিলার নিচে একটু দূরে ছোট্ট দোকান থেকে আলু পেঁয়াজ কেনা হল। তখন ছোটমামা উঠে বললেন, যা, তোরা সমুদ্রের ধারে বেড়িয়ে আয়, আমি চিংড়ি দিয়ে খিচুড়ি রাঁধব।

সমুদ্রের ধারটা উঁচু-নিচু, ঢেউগুলোও তখন অনেক শান্ত। গুপি একটা খুদে সমুদ্রের ঘোড়া পেল। কুড়িয়ে নিতেই সেটা কিলবিল করে উঠল। অমনি গুপি সেটাকে ছুঁড়ে ভাঁটার জলে ফেলে দিয়ে, ধপ করে বালির উপর বসে পড়ে বলল, ছোটমামার কপালটাই মন্দ। নাকের ডগা দিয়ে নাদুমামার, হাঁদুমামার প্রাপ্তি-যোগ ঘটে গেল আর ও-বেচারা কিচ্ছু পেল না!

পানু বলল, কিচ্ছু পেল না আবার কী? ও-বাড়িতে একটা কিষেণ-ভোগ আমের গাছ, একটা কাঁঠাল গাছ, ঝাউ গাছের শব্দ আর সমুদ্রের গন্ধ আছে। গুপি কাষ্ঠ হেসে বলল, আর আছে এক বাক্স বোঝাই শামুক ঝিনুক।

তাই শুনে পানু হঠাৎ লাফিয়ে উঠল, গুপি, চল্‌, ছোটমামার প্রাপ্তি-যোগটা বোধ হয় হয়ে গেল! আর কিছু না বলে পানু হনহনিয়ে বাড়ি ফিরল। বাড়িময় ভুরভুর খিচুড়ি আর চিংড়ি মাছের গন্ধ। সেদিকে ভ্রূক্ষেপ না করে, পানু সটাং দোতলার ঘরে ঢুকে, শামুক-ঝিনুকের বাক্স আবার উল্টে ফেলল। আবার এক ঝলক দুর্গন্ধ নাকে এল। পানু বড় বড় গোল গোল কালোপানা ঝিনুক-গুলোকে আলাদা করতে লাগল। গুপি অবাক হয়ে দেখল ঝিনুকগুলো আস্ত রয়েছে। ভিতরে নিশ্চয় পোকা মরে ঘুঁটে হয়ে আছে, তারি দুর্গন্ধ।

পকেট থেকে সাত ফলা ছুরি বের করে পানু একটা ঝিনুক খুলে ফেলল। কালো পচা পোকা শুকিয়ে ঘুঁটে। তারি বুকে নিটোল একটি মুক্তো জ্বলজ্বল করছে। চল্লিশটা ঝিনুক খুলে সাঁইত্রিশটা মুক্তো পাওয়া গেল। কোনোটা ছোট, কোনোটা বড়, কোনোটা সাদা, কোনোটাতে একটু গোলাপী ভাব। গুপি আর পানু পা ছড়িয়ে হাঁ করে তাই দেখতে লাগল। নিচে থেকে ছোট-মামার হাঁকডাকে কেউ কোনো সাড়া দিল না দেখে, শেষ পর্যন্ত ছোটমামা ছুটতে ছুটতে ওপরে এসে দরজার কাছ থেকে ঝিনুকের খোলার স্তূপ আর মুক্তোর খুদে ঢিপি দেখে বিনাবাক্যব্যয়ে সত্যি করে মূর্ছো গেলেন। গুপির ধমকেও উঠলেন না। শেষটা নিচে গিয়ে পানু স্টোভ থেকে তৈরি খিচুড়ি নামাল, আর এক ঘটি জল এনে ছোটমামার মাথায় ঢালতে বাধ্য হল। ছোটমামা চোখ খুলতে গুপি বলল, তোমার প্রাপ্তি-যোগ হয়েছে, এই কি মূর্ছো যাবার সময় নাকি?

শকের চোটে ছাটমামার জিবটিব জড়িয়ে একাকার। শেষটা ঢোক গিলে বললেন, এতে কী এমন ক্ষতি হল তোদের, তাই বল?

শেষটা মুক্তোগুলোকে রুমালে বেঁধে তক্তাপোষের তোষকের তলায় গুঁজে, কুয়োর জলে স্নান করে, ওরা খাওয়া-দাওয়া সারল। সাত দিন পরে কলকাতায় ফিরে ছোটমামা মুক্তোর পুঁটলি নিয়ে বড়দাদুকে প্রণাম করতেই, তিনি বললেন, আমাকে কেন? ওটা তোর। বলিনি ও-বাড়িতে তোর প্রাপ্তি-যোগ আছে?

গুপি বলল, আর নাদুমামাকে হাঁদুমামাকেও যে সেখানে পাঠালে, তাদের কী প্রাপ্তি হল? বুড়ো বলল, কেন, শিক্ষা প্রাপ্তি হল।

ছবি এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়
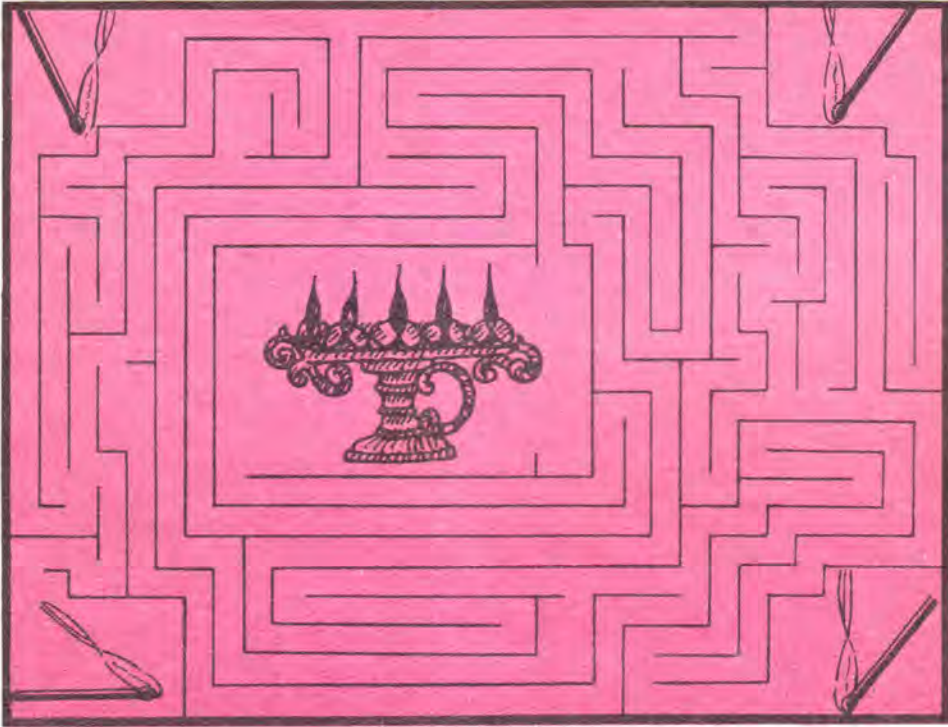
পথের সব ক'টি মোমবাতি জ্বালিয়ে দিয়ে গিয়ে তারপর ধরাতে হবে পঞ্চপ্রদীপ। দেশলাই কাঠির কোনটি দিয়ে শুরু করলে আদৌ সম্ভব হবে, ভাবতে হবে প্রথমে। বলা বাহুল্য পেছু ফেরা চলবে না।

পরী-মেয়ের মিমনি

কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

আমি যে-বাড়িতে থাকি সেটা তিনতলা। সেই তিন-তলায় দুটো ফ্ল্যাট। আর সেই ফ্ল্যাট দুটোর মাঝখানে এক চিলতে ছাত।

আমার যেটা ফ্ল্যাট সেটা পুব দিকে মুখ ফিরিয়ে রয়েছে। অন্য ফ্ল্যাটটা দক্ষিণ-মুখো।

এতো সাত কাহনি গোড়াতেই গাইবার কারণ : আমার অবস্থা, আমার ফ্ল্যাটের অবস্থা তোমাদের ভালো করে বোঝাবার জন্যে।

তোমাদের গোড়াতেই ভালো করে বুঝিয়ে দিতে চাই যে, আমি একটা গো-বেচারা মানুষ। আমি কারুর সাতেও থাকতে চাই না, কারুর পাঁচেও থাকতে চাই না। কারণ সাত আর পাঁচ—শুধুই বা সাত-পাঁচ কেন—কোনো রকম অঙ্কের মধ্যেই থাকতে চাই না।

আমি হেন লোক, যে সাতকেও ভালোবাসে না, পাঁচকেও ভালোবাসে না—তারই জীবনে এমন একটা সর্বনেশে কান্ড ঘটেছে, যেটা তোমরা ভালো করে না দেখলে বিশ্বাস করতেই পারবে না।

আমার যে দক্ষিণ-মুখো ফ্ল্যাট সেটা খালি ছিলো।

হঠাৎ একদিন সকালে, তোমাদের জন্যে যখন গল্প লিখতে বসেছি, দেখলাম সেই দক্ষিণ-মুখো ফ্ল্যাটের জানলা-দরজা ফটফট করে খুলছে। দেখলাম জোয়ান-জোয়ান চেহারার মানুষ মালপত্র বইছে। দেখলাম রূপ-কথার পরীর মতো সুন্দরী একটি মেয়ে যেন প্রজাপতি হয়ে উড়ে বেড়াচ্ছে।

তোমরা তো অনেক পরীর গল্প শুনেছো। আর নিশ্চয়ই পরীর গল্প শুনতে ভালোবাসো। আমিও তোমাদেরই মতো অনেক পরীর গল্প শুনেছি—পরীর গল্প শুনতে খুবই ভালোবাসি। তাই আমাদের বাড়ির দক্ষিণ-মুখো ফ্ল্যাটে হঠাৎ একটি পরী হাজির হলে—আমার তো খুব খুশী হবারই কথা। আর খুবই খুশী হয়েছিলাম। কিন্তু হায়! সেই পরীই আমার জীবনকে এমন যে উস্‌খুস-খুস্‌খুস করে ছাড়বে—সে-কথাটা সেই প্রথম দিন বুঝিনি।

লেখায় মন দিয়েছিলাম। মানে যতটা না লিখছিলাম

তার বেশী কাটছিলাম। এমন সময় আমার স্ত্রী সেই পরী-মেয়েটিকে আমার ফ্ল্যাটে নিয়ে একেবারে আমার সামনে হাজির করলেন। আমি ব্যস্ত হয়ে, লেখা-টেখা থামিয়ে, দাঁড়িয়ে উঠলাম। আর ব্যস্ত হয়ে উঠলেই চশমাটা খুলে কোথায় যে রাখি!

পরীকেও ভালো করে দেখতে চশমা লাগে!

তাই আমার স্ত্রী লেখার টেবিলের পাশের মোড়া থেকে চশমা-জোড়া হাতে তুলে দিয়ে বললেন, কে এসেছে—দ্যাখো। এ হচ্ছে বুলবুলি। তোমার লেখার খুব ভক্ত। চশমা আঁটো। ভালো করে দ্যাখো।

চশমা আঁটলাম।

খুব ভালো করেই দেখলাম।

দেখলাম : বাস্তবিকই পরী। কিন্তু তার কোলে—

পরী হেসে বললো, আমি কিন্তু আপনার দারুণ ভক্ত। আর এই মিমনিটাও। রোজ রাতে আপনার গল্প না শোনালে এ ঘুমোয় না। এই দেখুন আমার নতুন অটোগ্রাফ বই।

তারপর পরীর মতো আবদেরে গলায় বললো, একটা খুব ভালো অটোগ্রাফ আপনাকে লিখে দিতেই-দিতেই-দিতেই হবে। নইলে আমি দারুণ-দারুণ-দারুণ রাগ করবো। আর মিমনিটাও দারুণ-দারুণ-দারুণ রাগ করবে। শুধু সই হলে কিন্তু চলবে না। একটা ছড়া লিখে দিন। যে-ছড়াটা শোনালে মিমনি ঘুমোবে।

তোমরা তো জানো আমি আর যাই পারি আর তাই পারি—বেড়ালের জন্যে কোনো ঘুম-পাড়ানি ছড়া লিখতে পারি না। এমন কি সেই বেড়াল-ছানা যদি কোনো সত্যিকারের সুন্দরী ফুরফুরে পরীরও হয়।

তবু তো কিছু একটা করতেই হয়। তাই সেই পরীর অটোগ্রাফের খাতায় লিখলাম :

"মিমনি গো মিমনি
কেটে পড় চটপট
বেয়ে ঐ চিমনি ।।"

যে চিমনিটার কথা অটোগ্রাফের খাতায় লিখলাম সেটা একটা ময়দা-কলের চিমনির কারখানার। সেটা আমি দু-চক্ষে দেখতে পারি না। পরীর মিমনিকেও আমি দু চক্ষে দেখতে পারিনি—এমনকি চশমা পরেও নয়। তাই ভাবলাম যদি মিমনি ওই চিমনিটার মধ্যে যায়, তা হলে আমার জীবনের যেটা এখন সবচেয়ে বড় সমস্যা, সেটার একটা সুরাহা হয়।

অটোগ্রাফ পড়ে তো পরী-মেয়ে দারুণ খুশী। বললো, আপনি জিনিয়াস্। এক সেকেন্ডে—কী ফাস্ট-কেলাস ছড়া লিখলেন! আবার কিন্তু কাল আসছি!

পরী-মেয়ে তার মিমনিকে নিয়ে চলে গেলো। আমি ভারি ক্লান্ত হয়ে, লেখার প্যাড-ট্যাড বন্ধ করে, আমার স্ত্রীকে বললাম : একটু চা কর। কিস্সু ভালো লাগছে না।

পরের দিন সকালে দেখি কে আমার লেখার প্যাডটা ছিঁড়ে টুকরো-টুকরো করে দিয়েছে। চশমা পরে ভালো করে এদিক-ওদিক তাকাতে-তাকাতে দেখি সেই গত-কালের মিমনি আমার লেখার টেবিলের তলা থেকে বেরিয়ে—চার হাত-পায়ে আড়মোড়া ভেঙে—প্রকাণ্ড একটা হাই তুলে—আমার দিকে খুব একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব করে—ঘর থেকে বেরিয়ে যাচ্ছে।

যে-এক চিলতে ছাতের কথা আগে বলেছি তার পাশেই আমার লেখার ছোট্ট ঘর। তাতে একটা জানলা। দিনে আলো আর রাতে হাওয়া আসার জন্যে রাত-দিন সেটা খোলাই থাকে। বুঝলাম সেই জানলা দিয়ে আলো-হাওয়ার মতোই কোনো এক সময় মিমনি সেঁধিয়ে আমার লেখার প্যাডের বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

কিন্তু পরী-মেয়ের সঙ্গে তো সামান্য একটা বেড়াল নিয়ে ঝগড়া করা যায় না। তাই ছুটলাম আমার এক বন্ধুর বাড়ি। তার লোহা-লক্কড়ের কারবার আছে। আমার বিপদের কথা শুনে সে বললো, কিস্সু ভাবিস্ না। জানলা তোকে বন্ধ করতে হবে না। তোর জানলায় এমন একটা লোহার গ্রিল মানে জাফরি-ফ্রেম আটকে দোবো, যার মধ্যে দিয়ে কোনো বেড়াল সেঁধুতে পারবে না।

দুপুরে মিস্ত্রি জানলায় সেই লোহার গ্রিল ফিট করে দিয়ে গেলো। আর বিকেলে সেই ফুরফুরে পরী-মেয়ে সেজেগুজে আমাদের ফ্ল্যাটে এলো বেড়াতে। চশমার ভেতর থেকে চোখ গোল-গোল করে দেখলাম তার এক কোলে মিমনি আর এক কোলে আর একটা বেড়াল।

শুনলাম আমার স্ত্রীকে সেই পরী-মেয়ে মিষ্টি-মিষ্টি আধো-আধো পরী-পরী গলায় বলছে, জানেন দিদি! মিমনিটার ভারি একলা-একলা লাগে। তাই মাসীর বাড়ি থেকে এই হুলোটাকে নিয়ে এলাম! বলে বেড়াল দুটোকে আমার লেখার ঘরের লাগোয়া-বারান্দায় ছেড়ে দিয়ে মোড়ায় আমার স্ত্রীর সঙ্গে চা খেতে বসলো। আর সে কত গল্প! যেন শেষ হতেই চায় না।

ভোরে উঠে বারান্দায় বসে চা খেতে-খেতে খবরের কাগজ পড়া আমার বহুকালের পুরনো অভ্যেস।

পরের দিন সকালে উঠে দেখি বারান্দায় খবরের কাগজটা টুকরো-টুকরো। ভোরে ঠিকে ঝি সেখানে হরিণঘাটার দুধের বোতল নামিয়ে বাজার করতে চলে যায়। দেখি দুধের বোতলটা ভাঙা। মেঝেয় দুধ থৈথৈ করছে। আর মিমনি আর তার ফ্রেন্ড সেই দুধ চেটে চেটে খাচ্ছে। আমাকে তারা মানুষ বলেই গ্রাহ্য করলো না। চেটেপুটে খেয়ে তারা দু'জন চার আর চার আট হাত-পায়ে আড়মোড়া ভেঙে আমার দিকে খুব একটা তুচ্ছ-তাচ্ছিল্যের ভাব করে সেই দক্ষিণ-মুখো পরী-মেয়ের ফ্ল্যাটের দিকে মর্ণিং-ওয়াক করার ভঙ্গীতে চলে গেলো।

আমার আর খবরের কাগজ পড়া, চা খাওয়া হোলো না। ছুটলাম সেই বন্ধুর কাছে, যার লোহা-লক্কড়ের

কারবার আছে।

আমার নতুন বিপদের কথা শুনে সে বললো, কিস্‌সু ভাবিস্‌ না। আমি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি। তোর খোলা-বারান্দার পুরো সামনের দিকে আমি লোহার জাফরি-ফ্রেম আটকে দোবো, যার মধ্যে দিয়ে কোনো বেড়াল সেঁধুতে পারবে না।

দুপুরে মিস্ত্রিরা অনেকক্ষণ ধরে গোটা বারান্দাটায় লোহার জাফরি-ফ্রেম ফিট করে দিয়ে গেলো। আর বিকেলে সেই ফুরফুরে পরী-মেয়ে সেজেগুজে আমাদের ফ্ল্যাটে এলো বেড়াতে। চশমার ভেতর থেকে আবার চোখ গোলগোল করে দেখলাম তার এক কোলে মিমনি, অন্য কোলে সেই হুলো আর পিছনে আরো দুটো বেড়াল।

আমার স্ত্রী বাড়ি ছিলেন না। বারান্দার সেই লোহার জাফরি-ফ্রেমের দরজাটা না খুলেই বললাম, আপনার দিদি তো বেরিয়েছেন—

সেই মিষ্টি-মিষ্টি আধো-আধো পরী-পরী গলায় পরী-মেয়ে বললো, ও, তাই নাকি! এসেছিলুম দিদিকে মিমনির আর হুলোর আরো দুটো নতুন বন্ধুকে দেখাতে।

তারপর অবাক-অবাক বড় বড় চোখ তুলে চারদিকে তাকিয়ে বললো, কিন্তু এ কী করেছেন? আপনাদের ফ্ল্যাটটাকে দেখে মনে হচ্ছে ঠিক যেন চিড়িয়াখানার খাঁচা!

তারপর হঠাৎ গাল ফুলিয়ে বললো, ও, বুঝেছি! আপনি আমার মিমনিকে ভালোবাসেন না। তাই লিখেছিলেন ওই চিমনি দিয়ে কেটে পড়তে।

পরী-মেয়ে চলে গেলো। বুঝলাম তার খুব রাগ হয়েছে। কিন্তু তার মিমনি আর বন্ধুরা গেলো না। আমার বারান্দার সামনে তারা পায়চারি করতে লাগলো।

পরী-মেয়ে আমাদের ফ্ল্যাটে আর আসে না। সেটা দুঃখের কথা সন্দেহ নেই। কিন্তু সেটা খুব কিছু একটা বিপদের কথা নয়। কিন্তু যেটা বিপদের কথা সেটা এই: আমার এতো দিনের খোলামেলা ফ্ল্যাটটা এখন বাস্তবিকই একটা খাঁচার মতো। লোহার জাফরি-ফ্রেমের দরজা বন্ধ করে তার মধ্যে চব্বিশ ঘণ্টা আমাকে থাকতে হয়। আর বাইরে সব সময়ই আমার দিকে আড় চোখে তাকাতে-তাকাতে দেখি অগুন্তি বেড়াল পায়চারি করে বেড়ায়। কারণ মিমনি দারুণ পপুলার। রোজই তার বন্ধুর সংখ্যা বাড়ছে।

যদি বিশ্বাস না হয় তা হলে একদিন আমার ফ্ল্যাটে এসে স্বচক্ষে দেখে যেয়ো আমার কী হাল হয়েছে।

ছবি এঁকেছেন পৃথ্বীশ গঙ্গোপাধ্যায়

কম্বোডিস্ব-চাকারুকা কাহিনী

ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য

হঠাৎ খবর পেলাম সুবন্ধু দেশে ফিরেছে।

খবরটা উল্লেখযোগ্যই বটে। আজ তিরিশ বছরের ওপর সে দেশ-ছাড়া। কোথায় ছিল কেউ জানে না, কখনও একটা চিঠি লিখেও খবর দেয় নি। হঠাৎ কী মনে করে ফিরে এল সে?

অথচ এই সুবন্ধু আমার কলেজের অন্তরঙ্গ সহ-পাঠী। এমন একদিনও গেছে যেদিন দিনের মধ্যে খাবার আর ঘুমোবার সময়টুকু ছাড়া আমরা কখনও একে অপরের কাছছাড় হতাম না।

জুয়লজিতে এম্-এস্-সি পাশ করার পর আমি একটা প্রাইভেট কলেজে প্রফেসারি পেয়ে যেন হাতে স্বর্গ পেলাম। সুবন্ধু কিন্তু তাতে খুশী নয়। ওর ইচ্ছে বিলেতে গিয়ে রিসার্চ্-টিসার্চ্ করে, আরও বড় হয়। কিন্তু সেইখানেই ছিল মস্ত বাধা। সুবন্ধুদের পরিবারটা ছিল ভারী রক্ষণশীল। বিশেষ করে ওর ঠাকুরদা ছিলেন ভারী সেকেলে মতের। তিনি বললেন, "তা হয় না। নৈকষ্য কুলীন আমরা, আমাদের ঘরের ছেলে কখনও কালাপানি পার হবে না, ম্লেচ্ছের ছোঁয়া খেয়ে জাতজন্ম খোয়াবে না। এ সব শাস্ত্রের বারণ।" এখন এ-সব শুনলে আমাদের হাসি পায়, কিন্তু ৩০।৩৫ বছর আগে যখন বিলেত যাত্রাটা এত সহজ ছিল না তখন এ-ধরনের মতের লোক অনেক পরিবারেই কিছু কিছু ছিল।

যাই হোক, সুবন্ধু কিন্তু ঠাকুরদার মতে সায় দিতে পারে নি, তাই একদিন গোপনেই গৃহত্যাগ করতে হয়েছিল ওকে। যাবার আগে বালিশের নিচে একটা চিঠি লিখে রেখে গিয়েছিল—সে সত্যিই বিলেত যাচ্ছে। কলকাতা থেকেই একটা জাপানী জাহাজে সটান কলম্বো হয়ে যাবার ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। ভোর রাত্রেই জাহাজ ছাড়বে। কেউ যেন তার খোঁজ করে বা তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করে সময় নষ্ট না করে।

তারপর? তারপর সত্যি আর কেউ সুবন্ধুর খোঁজ করেনি, সুবন্ধুও তার কোন খবর দেয়নি। এমন কি, আমার সঙ্গে তার যে এত বন্ধুত্ব ছিল—আমাকেও না।

সেই সুবন্ধু এতকাল পরে দেশে ফিরেছে ভাবতেও কেমন লাগছিল।

ডাকটা কিন্তু সুবন্ধুর কাছ থেকেই এল। আমাদের পৈত্রিক বাড়ি, বহুদিনের বাসিন্দা আমরা সেখানে। সুবন্ধু তা জানত।

আচমকা টেলিফোন।—"সতু, আমি ফিরে এসেছি। আপাতত ৬ নম্বর নিউ পার্কে আছি। এখনও সব কিছু গুছিয়ে উঠতে পারিনি। কিন্তু তোদের সঙ্গে দেখা করার জন্যে প্রাণ ছট্ফট্ করছে। সন্ধের সময় তোর ওখানে যাব। সাড়ে সাতটার সময় বাড়ি থাকিস কিন্তু..."

সাড়ে সাতটার একটু আগেই ও এসে গেল। তিরিশ বছর আগেকার দেখা সেই তরুণ মুখ,—তার সঙ্গে এখানকার পঞ্চাশোর্ধ্ব সুবন্ধুর চেহারায় কোনই মিল নেই। গালে কাঁচা-পাকা ফ্রেনচ কাট দাড়ির ভেতর দিয়েও বেশ বোঝা যায় ওর গায়ের রং অনেক ময়লা হয়ে গেছে। অল্প বয়সে ও বেশ সুপুরুষ ছিল কিন্তু এখন বয়সের ভারে আর সে লালিত্য নেই। কিন্তু ও যে সেই সুবন্ধুই আছে তা বোঝা গেল ওর চিরপরিচিত হাসিটি দেখে। ঘরে ঢুকেই সেই হাসি। তারপর পকেট থেকে একটা মোটা চুরুট বার করে ধরাতে ধরাতে বলল, "তারপর? চুটিয়ে ম্যাস্টারি করছিস্ তো? চেহারাও তো বেশ খোলতাই হয়েছে দেখছি! বেশ মুটিয়েছিসও!"

দেখলাম, কথাবার্তার ধরন ওর বিশেষ বদলায় নি, তবে উচ্চারণটা যেন একটু বদলেছে। একটু দাঁতে চেপে চেপে কথা বলে। অনেক দিনের অনভ্যাস তো!

বললাম, "আমার কথা পরে হবে, আগে তোর কথা বল্। কোথায় ছিলি, কী করছিলি এতদিন? হঠাৎ চলেই বা এলি কেন? ওদেশে থাকলে রং তো বেশ ফরসা হয় জানি, তুই তো কালো হয়ে গেছিস দেখছি!"

"ফরসা হয় ইয়োরোপে থাকলে। আমি আর ইয়োরোপে ক-বছর ছিলাম? বড় জোর বছর পাঁচেক।

গত পঁচিশ বছর তো আফ্রিকার জঙ্গলে জঙ্গলেই ঘুরছি।"

"তার মানে?"

আজ্ঞে হ্যাঁ। এক সময় যাকে বলা হতো ডার্ক কনটিনেন্ট অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাদেশ, সেইখানেই ডেরা বেঁধেছিলাম। এখন অবশ্য দেশটা অতটা ডার্ক নেই, তবে যখন প্রথম গিয়েছিলাম তখন সত্যিই ডার্ক বলা যেত সেটাকে। এ ক-বছরে কম অভিজ্ঞতা হয়নি।"

তারপর সুবন্ধু সংক্ষেপে তার কাহিনী বলে গেল। কিছুদিন ইংল্যাণ্ডে জুয়লজি নিয়ে গবেষণা করে ও যায় আমেরিকায়। তারপর ডক্টরেট নেবার পর যখন চাকরি হল তখন চলে এল আফ্রিকায়। কারণ তার মতে জুয়লজিস্ট—বিশেষ করে এনটমোলজিস্ট্ অর্থাৎ কীট-তত্ত্ববিদ্‌দের স্বর্গরাজ্য হল আফ্রিকা। এত অগুণতি রকমারি জীবজন্তু, পোকামাকড়ের নমুনা ওখানে ছাড়া আর কোথায় পাওয়া যাবে?

"গোটা দেশটা একরকম চষেই বেড়িয়েছি বেশ কিছুদিন। অবশ্য চাকরিটা ছিল তোরই মতো প্রফেসারি। তবে ওখানে তো মাইনেটাইনে ভালোই দেয়, কোন অসুবিধে হয়নি। কাজের ফাঁকে ফাঁকে এখানে ওখানে ঘুরে বেড়াতেও অসুবিধে হতো না,—সেটাও তো ছিল কাজেরই অঙ্গ! সঙ্গে অনেক সময় ছাত্রদেরও নিয়ে নিতাম। তারপর দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর—ভালো কথা, একটু কফি খাওয়াতে পারিস? বড্ড কফির নেশা আমার।"

"নিশ্চয় নিশ্চয়।"—লজ্জিত হয়ে তখনই বাড়ির ভেতর খবর পাঠালাম। কফি এল। লম্বা একটা চুমুক দিয়ে সুবন্ধু আবার সুরু করল :

"শোন্, স্বর্গরাজ্য থেকে কেন চলে এলাম তাই ভাবছিস তো? তা হলে একটা গল্প বলি, তা হলেই সব বুঝবি। আমারই জীবনের গল্প।"

পেয়ালার সমস্ত কফি এক চুমুকে শেষ করে দিয়ে সুবন্ধু বলতে আরম্ভ করল :

"তখন সবে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ শেষ হয়েছে। আফ্রিকার দেশগুলিও একে একে স্বাধীন হচ্ছে। দেশের লোকগুলোও লেখাপড়া শিখে সভ্য মানুষ হবার চেষ্টা করছে। নানা জায়গায় কলেজ খুলছে, ইউনিভার্সিটি হচ্ছে। এমনি সময়ে আমার ডাক পড়ল—মধ্য আফ্রিকার কম্বোডিম্ব ইউনিভার্সিটি থেকে।"

"কম্বোডিম্ব? কই, সে নাম তো শুনিনি কখনও!"

"আমিও শুনি নি, এখুনি বানিয়ে বললাম। আসলে মধ্য আফ্রিকার একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। নামটা বলতে চাই না, তাই একটা বানিয়ে দিলাম। ধরে নে না, ঐ হচ্ছে দেশটার নাম। তাতে তো আর মহাভারত অশুদ্ধ হবে না। তা ছাড়া ওখানকার নামগুলো ঐ রকমেরই হয় কিনা!

"ছোট্ট একটা রাষ্ট্র। সবটাই প্রায় পাহাড়। ফলে চাষবাস খুব কমই হয়। খাদ্যের জন্য অন্য দেশের ওপর অনেকটা নির্ভর করতে হয়। কিন্তু হলে কী হবে, ওখানকার যে প্রেসিডেন্ট—প্রিন্স গুবাম্বা—সে লোকটি ভারী কর্মিতকর্মা। অল্প বয়স থেকে বিলেতে লেখাপড়া শিখেছে। দেশের অবিসম্বাদী নেতা। ধরতে গেলে তারই জন্য কম্বোডিম্ব একটা স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে। নইলে ওর পাশেই যে রাজ্যটা, ধর সেটার নাম চাকারুকা, সেটা তো গোড়া থেকেই ওকে গ্রাস

করবার জন্য তৈরী হয়ে ছিল।

"যাক, গুবাম্বার চেষ্টায় কম্বোডিম্বের লোকেরা অল্প দিনেই বেশ উন্নত হয়ে উঠছিল। এটা চাকারুকার সহ্য হচ্ছিল না। সেটাও একটা স্বাধীন রাষ্ট্র কিনা! আর সমতল উর্বর দেশ বলে সেখানকার চাষবাসও খুব ভালো হতো। কিন্তু হলে কী হবে, সেখানকার প্রেসিডেন্ট নফ্‌রুরা ছিল ভারী হিংসুটে। বিশেষত গুবাম্বাকে সে দু-চোখে দেখতে পারত না।"

"কারণ?"

"প্রধান কারণ, ওরা দুজনে এমন দুটি গোষ্ঠীর লোক যাদের মধ্যে বহু দিনের প্রবল শত্রুতা। আফ্রিকায় এ-রকম বহু গোষ্ঠী আছে তা নিশ্চয়ই জানিস—যাদের একটা আর একটার নাম পর্যন্ত শুনতে পারে না। গুবাম্বার ঠাকুরদা ছিল তাদের গোষ্ঠীর সর্দার, আর নফ্‌রুরার ঠাকুরদাও ছিল তাদের গোষ্ঠীর মোড়ল। আর দুজনের সম্পর্ক ছিল আদায় কাঁচকলায়। অর্থাৎ, ঝগড়াটা তিন পুরুষের।

"যাই হোক, গুবাম্বার চেষ্টা ছিল কী করে নিজের দেশকে বড় করে তোলা যায়, আর নফ্‌রুরার চেষ্টা ছিল কী করে তাকে বাধা দেওয়া যায়। গুবাম্বা তার দেশের সমস্ত সম্পদ দেশের উন্নতির জন্য খরচ করত, আর নফ্‌রুরার একমাত্র লক্ষ্য ছিল কী করে দেশটার সমরশক্তি বাড়ানো যায়। দেশের সমস্ত সম্পদ তার বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র কিনতেই খরচ হয়ে যেত।

"যাক ও-সব কথা। আমি তো ওখানকার ইউনি-ভার্সিটিতে বায়োলজি বিভাগের ভার নিয়ে চলে এলাম। গুবাম্বার সঙ্গে আমার বহু দিনের পরিচয়—সেই বিলেতে পড়াশোনার সময় থেকে। সে পরিচয় তখন অনেকটা বন্ধুত্বে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কম্বোডিম্বতে এসে আবার সেই ঘনিষ্ঠতা বেড়ে গেল।

"আমি লক্ষ করলাম, ঠিক পাশাপাশি দেশ বলে কম্বোডিম্বকে তার খাদ্যশস্যের জন্য অনেকটা নির্ভর করতে হয় চাকারুকার ওপর। নিজেদের পাহাড়ী দেশে তাদের বিশেষ কিছু ফলে না। চাকারুকাও তা খুব ভালো করেই জানে এবং জানে বলেই অত্যন্ত চড়া দর আদায় করে ও-সবের জন্য। তা ছাড়া আরও নানা রকম অসঙ্গত সুযোগ-সুবিধা আদায়েরও চেষ্টা করে কম্বোডিম্ব থেকে।

"এই নিয়ে দু-দেশের মধ্যে মন কষাকষি চলছিল অনেক দিন থেকেই। আমি গিয়ে পরামর্শ দিলাম, ওদের

কাছ থেকে খাবার কেনা বন্ধ করে গ্বাম্বা যদি অন্য কোন দেশ থেকে, এমনকি মিশর থেকেও তা আমদানি করে, তা হলেও হয়তো লাভ ছাড়া লোকসান হবে না। উপরন্তু ওরাও জব্দ হবে।

"গ্বাম্বাও কিছ্বদিন থেকে সেই কথা ভাবছিল। লাগোয়া রাজ্য বলে চাকার্কা থেকে মালপত্র আমদানিতে মেহনত কম, আর বহ্বদিন থেকেই, দেশ স্বাধীন হবার অনেক আগে থেকেই, এই ব্যবস্থা চলে আসছিল বলে ওরা এটা নিয়ে এতদিন বিশেষ কিছ্ব আপত্তি করে নি। কিন্তু ওদের ব্যবহার ক্রমেই অসহ্য হচ্ছে দেখে অগত্যা সে আমার পরামর্শ মতো অন্য ব্যবস্থাই করতে আরম্ভ করল। চাকার্কাকে একদম বয়কট করা হল।

"ফলে নফ্র্রা গেল আরও ক্ষেপে। তার সমরশক্তি তখন প্রচন্ড। যে কোনো ম্হ্র্তে কম্বোডিম্ব আক্রমণ করে দখল করে নেওয়া তার পক্ষে খ্ব কঠিন হবে না এ কথাও সে জানত।

"একটা সামান্য অজ্বহাত দেখিয়ে সে কম্বোডিম্ব আক্রমণ করার জন্য তৈরী হল।

"গ্বাম্বা ম্শকিলে পড়ল। য্দ্ধের জন্য সে ঠিক তৈরি ছিল না, আর য্দ্ধে নামলে তার সাধের রাষ্ট্রের উন্নতি যে বহ্ব বছর পিছিয়ে যাবে তাও তার অজানা ছিল না। এখন কী করা? নিজেদের সম্মান হানি না করে ওদের থামানো যায় কী ভাবে?

"সারা দেশ তখন থম থম করছে। কখন কী ঘটে কেউ বলতে পারে না। কয়েকদিন থেকে লক্ষ করছি, গ্বাম্বা কেমন মনমরা হয়ে গেছে। আমি ভাবলাম, আমি কি এ ব্যাপারে কোন সাহায্য করতে পারি না? কিন্তু কী ভাবে করব ভেবে কোন ক্লকিনারা পেলাম না। ওদিকে জোর গ্জব কালই হয়তো লড়াই লেগে যাবে।

"আমার একটা অভ্যাস ছিল, প্রায়ই ছাত্রদের নিয়ে পাহাড়ে পাহাড়ে ঘ্রে বেড়ানো। নতুন কোনো জাতের কীটপতঙ্গ চোখে পড়লে তা সংগ্রহ করে আনা, বা অন্তত পক্ষে তাদের সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করা।

"সেদিনও কয়েকটি ছাত্র নিয়ে বেরিয়েছি। চলতে চলতে আমরা একটা বড় পাহাড়ের ওপর উঠে পড়েছি। পাহাড়টা ঢাল্ব হয়ে অনেকটা নেমে গেছে—আর সেই ঢাল্ব জায়গাটা শেষ হবার পরই চাকার্কা রাজ্য। পাহাড়ের ওপর থেকেই দেখা যায় ওদের মাঠগ্বলো গমের গাছে ভর্তি হয়ে আছে। গম পাকবার সময় হয়ে গেছে প্রায়। সত্যি, ওরা কী স্খী!

"কয়েকটি ছাত্র পাহাড়ের ঢাল বেয়ে একট্ব নেমে গিয়েছিল। ওদিকটায় বেশি পাথর নেই, বালি আর কাঁকরই বেশি। মাঝে মাঝে মাটিও আছে। ওখানে কি কোন পোকামাকড় থাকতে পারে? কে জানে!

"হঠাৎ কয়েকটি ছাত্র দৌড়তে দৌড়তে এসে বলল, 'স্যার, ওদিকটায় আশ্চর্য কান্ড! বালির মধ্যে কারা যেন অসংখ্য গর্ত করে চোঙ্গা প্ব'তে রেখেছে। নিশ্চয়ই এটা চাকার্কার লোকদের কাজ। আমাদের আক্রমণ করার জন্য কোন একটা ফাঁদ পেতেছে ওখানে। নইলে এক সঙ্গে অতগ্বলো চোঙ্গা প্ব'তবার কোনো অর্থ হয় না।'

"শ্বনে আমিও নেমে এলাম। চোঙ্গাগ্বলো দেখে আমারও কেমন সন্দেহ হল। মনে হল এ-রকম রাশি রাশি চোঙ্গা আমি আগেও একবার দেখেছি, বহ্বদিন আগে, কিন্তু কোথায় হঠাৎ মনে করতে পারলাম না। যাই হোক, তখনকার মতো ওখান থেকে তাড়াতাড়ি চলে এলাম। গ্বাম্বাকে খবরটা জানানো দরকার।

"বাড়ি এসেই কিন্তু মনে পড়ল ও চোঙ্গা আগে কোথায় দেখেছি এবং সঙ্গে সঙ্গে আমার মাথায় এক ব্দ্ধি এসে গেল। চেষ্টা করলে এ লড়াই হয়তো আমরাই জিততে পারব।

"তখনই ছ্বটলাম গ্বাম্বার কাছে। বললাম, 'লড়াই আমাদের দিকে। তুমি আজ রাত্রের মধ্যে যত পার শ্বকনো কাঠ জোগাড় করে ওই পাহাড়ের ধারে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করো।'

"গ্বাম্বা অবাক হয়ে আমার ম্খের দিকে চেয়ে রইল। আমার মাথা ঠিক আছে কিনা সেই সন্দেহই বোধ হয় হচ্ছিল তার মনে। আমি বললাম, 'কম্বোডিম্বকে বাঁচাবার এছাড়া আর পথ নেই। পরে সব খ্লে বলব। কিন্তু যা বললাম তা এখনই করা চাই।'

"আমার ওপর গ্বাম্বার বোধ হয় প্রচুর আস্থা ছিল। সে আর বাক্যব্যয় না করে বলল, 'বেশ, তাই হবে।'

"সেই রাত্রেই ব্যবস্থা হয়ে গেল। অন্ধকারে শত শত টন শ্বকনো কাঠ—শহরের যেখানে যার কাছে যা ছিল—এনে জড় করা হল সেই পাহাড়ে। আমি ছাত্রদের সঙ্গে নিয়ে গিয়েছিলাম। গ্বাম্বার লোকেরাও ছিল। সেই চোঙ্গাগ্বলোর তিন দিক ঘিরে উঁচু করে স্ত্পাকার কাঠ সাজিয়ে দেওয়া হল। খোলা রইল শ্ধ্ব ঢাল্ব দিকটা—যে দিকটা চাকার্কার মাঠের দিকে নেমে গেছে।

"সে রাত্রে পাহাড়ের ওপরই তাঁব্ব ফেলে আমরা অপেক্ষা করতে লাগলাম। বলা রইল, সবাই সতর্ক থেকো; সময় হলেই, আমি যখন বলব, ওই সব কাঠে আগ্বন লাগিয়ে দিতে হবে। আমার কয়েকটি ছাত্রকে ব্যাপারটা ব্ঝিয়ে দিলাম। তারা গিয়ে খানিকক্ষণ পর পরই চোঙ্গাগ্বলো পরীক্ষা করে আসতে লাগল।

"হঠাৎ এক সময় একটি ছাত্র দৌড়ে এসে বলল, 'স্যার্, একটা চোঙ্গা থেকে কিল্‌কিল্ করে কতকগ্বলো পোকা বেরিয়ে আসছে। ফড়িং জাতীয় পোকা মনে হচ্ছে, কিন্তু উড়তে পারে না।'

"হেসে বললাম, 'এখন পারছে না, কিন্তু একট্ব পরেই পারবে।'

"অল্পক্ষণের মধ্যেই প্রায় সব ক'টা চোঙ্গা থেকেই পোকা বের্তে স্র্ব করল, আর তাদেরই কতকগ্বলো

গ‌ুঁড়ি মেরে পাহাড়ের গা বেয়ে উঠবার চেষ্টা করতে লাগল।

"আর দেরি নয়। আমি ইশারা করতেই গ‌ুবাম্বার লোকেরা সমস্ত কাঠে আগ‌ুন লাগিয়ে দিল। দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল সেই হাজার হাজার মণ কাঠ।

"আর, তার কিছ‌ু পরেই, আশ্চর্য কাণ্ড! সবাই অবাক হয়ে দেখল পোকাগ‌ুলোর পাখা গজিয়েছে। ফড়িংএর মতো পোকাগ‌ুলো লাফিয়ে লাফিয়ে আকাশে উঠছে আর এদিকটায় আগ‌ুন দেখে এদিকে না এসে সব এগিয়ে চলেছে চাকার‌ুকার দিকে—যেখানে মাঠ ভরা থই থই করছে গমের সম‌ুদ্র।

"একটা নয়, দ‌ুটো নয়, হাজার হাজার—লাখে লাখে পোকা বেরিয়ে আসতে লাগল চোঙ্গা থেকে। কে জানে, হয়তো কোটি কোটিও হতে পারে। ফড়িংএর মতো দেখতে, অল্প একট‌ু বড়। শাঁ শাঁ করে পাখা মেলে তারা উড়ে চলল চাকার‌ুকার মাঠের দিকে। তাদের পাখার শব্দে কানে তালা লাগবার জোগাড়। তখন বেশ বেলা হয়ে গেছে, কিন্তু ঐ পতঙ্গদের পাখার আড়ালে স‌ূর্যদেব বেমাল‌ুম ঢাকা পড়ে গেছেন।

"ততক্ষণ চাকার‌ুকার লোকেরাও টের পেয়ে গেছে। কিন্তু তখন আর কিছ‌ু করার নেই। হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি পঙ্গপাল—হ্যাঁ, এই পোকাগ‌ুলি পঙ্গপালই বটে,—ছ‌ুটে চলেছে তাদের দেশে। সদ্যোজাত হলে কী হবে, রাক্ষ‌ুসে তাদের খিদে। সামনে যে গাছ পাচ্ছে তার একটি পাতাও তারা ছেড়ে দিচ্ছে না সব খেয়ে উজাড় করে দিচ্ছে। এমনকি, গাছের শিকড়গ‌ুলো পর্যন্ত। দিগন্তব্যাপী গমের খেত কয়েক মিনিটের মধ্যে নিশ্চিহ্ন করে দিয়ে তারা উড়ে চলেছে আরও ভেতরে—চাকার‌ুকার যেখানে যে গাছপালা, ফলশস্য আছে সব তাদের চাই—তাদের আস‌ুরিক খিদে মেটাতে।

"হই হল্লা, আর্তনাদ কিছ‌ুরই কোন বাধা মানল না তারা, সঙ্গে সঙ্গে প্রেসিডেন্ট নফ‌্র‌ুরার য‌ুদ্ধযাত্রা বানচাল করে দিয়ে গেল তারা। তখন দেশজোড়া হাহাকার, নিজেদের কে দেখে তার ঠিক নেই। এ অবস্থায় কি কেউ লড়াই করতে পারে?

"ব‌ুঝতে পারছিস তো? ঐ চোঙ্গাগ‌ুলো আর কিছ‌ুই না, ওগ‌ুলো ছিল পঙ্গপালের ডিম। ঐ ভাবেই ওরা ডিম পাড়ে বালি, কাঁকর বা মাটির মধ্যে গর্ত খ‌ুঁড়ে। এক-একটা চোঙ্গা-ডিম থেকে ৬।৭ শ' বাচ্চা বেরোয়। প্রথমটা তারা উড়তে পারে না বটে, কিন্তু তখন থেকেই

তাদের রাক্ষ‌ুসে খিদে স‌ুর‌ু হয়ে যায়। তারপর, যখন পাখা গজায়, উড়তে আরম্ভ করে, তখন আর তাদের বাধা দিতে পারে এমন সাধ্য কারো নেই। একমাত্র আগ‌ুনকে ওরা একট‌ু ভয় পায়, কিন্তু আগ‌ুন দেবে কে? আফ্রিকার নানা জায়গায় এরকম পঙ্গপালের আক্রমণ প্রায়ই শোনা যায়। ওদের ডিম আমি বহ‌ু বছর আগে একবার মাত্র দেখেছিলাম তাই প্রথমবার দেখেই ঠিক মনে করতে পারি নি। তারপর যখন মনে পড়ল তখনই ব‌ুঝলাম, লড়াই এবার কম্বোডিম্বের হাতে চলে গেল। ঐ পঙ্গপালের সাহায্যেই তারা চাকার‌ুকাকে এবারের মতো খতম করে দিতে পারবে।"

আমি স্তম্ভিত হয়ে শ‌ুনছিলাম। স‌ুবন্ধ‌ু বলল, "এরপর কম্বোডিম্বের লোকেরা আমাকে দেবতার মতই খাতির করতে আরম্ভ করে। কিন্তু চাকার‌ুকার লোকদের ওভাবে শায়েস্তা করে আমার মনে একট‌ু অন‌ুশোচনাও হয়েছিল। বাস্তবিক, দেশশ‌ুদ্ধ লোকেরই তো আর দোষ ছিল না। নফ‌্র‌ুরার জন্য ওদেশের সমস্ত লোককে শাস্তি দেওয়া ঠিক হল কি?

"এরপর ভাবলাম, আর ওখানে নয়, দেশেই ফিরে যাই। কী হবে বিদেশের রাজনীতির মধ্যে নিজেকে জড়িয়ে ফেলে? গ‌ুবাম্বা অবশ্য সহজে আসতে দিতে চায় নি, কিন্তু আমি জোর করেই চলে এলাম। ওরা অবশ্য কৃতজ্ঞতার ম‌ূল্যস্বর‌ূপ আমাকে অনেক কিছ‌ুই দিতে চেয়েছিল, তাও নিতে পারিনি। আমার নিজের জমানো টাকাই যথেষ্ট। তাই নিয়েই ফিরে এসেছি দেশে। ভাবছি এবার দেশেই থেকে যাব বরাবরকার মতো। আর এদেশের পোকামাকড় নিয়েও তো অনেক কিছ‌ু গবেষণা করবার আছে। ভালো কথা, আর এক পেয়ালা কফি হলে মন্দ হয় না, গলাটা শ‌ুকিয়ে এসেছে।"

স‌ুবন্ধ‌ুর ম‌ুখে আবার সেই চিরপরিচিত হাসি।

ছবি এঁকেছেন স‌ুব্রত ত্রিপাঠী

ছুম আর ছবি

শৈলেন ঘোষ

ছুম ছবি আঁকতে পারে।

অবিশ্যি ছুম যে খালি ছবিই আঁকে, তা নয়। ও যেমন ছোট্ট. তেমনি ওর একটা ছোট্ট ঘোড়া আছে, টুট্টু। যখনই মন চায় ও টুট্টুর পিঠে চাপে। তারপর টগবগ টগবগ ছুটতে ছুটতে হারিয়ে যায়। ওই যেখানে আকাশটা মাটিতে এসে মিশেছে, আকাশের নীল আর মাটির সবুজ এক হয়ে গেছে, ওর ভারি ইচ্ছে ঐখানে যায়। আকাশটা ছুঁয়ে আসে। দাদু কত বলবে, "যাস না যাস না ছুম।" ছুম শুনবেই না।

যখন বেলা বাড়ে, একলা দাদু ঘরে বসে বসে আনচান করে আর মোটা কাঁচের চশমাটা চোখে লাগিয়ে মাঠের রাস্তাটার দিকে তাকিয়ে থাকে, তখনও ছুম ফিরবে না। ফিরবে, যখন সাঁঝ নামবে, একটু একটু আঁধার আসবে। আঁধার নামলে তো আর পথ চেনা যায় না। অগত্যা ফিরে আসতেই হয়। ভারি রাগ ছুমের ঐ সাঁঝের ওপর। ঐ তো যত নষ্টের গোড়া। কোনদিনই ও ছুমকে আকাশের কাছে যেতে দেবে না।

কেমন করে যে ছুম ছবি আঁকতে শিখেছিল, তা ও নিজেও জানে না। খুব সকালে ঢেউ ঝিলমিল নদীর ওপারে আকাশ ভরে যখন সোনা ছড়িয়ে পড়তো, ওর চোখ দুটি নেচে উঠত দেখতে দেখতে। ও বলতো, "ছবি আঁকি।"

মস্ত গাছটার সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে, তুকতুকে ছানা-পাখিগুলো যখন কিচমিচ করে ডাকতো আর মায়ের মুখ থেকে ঠুকরে ঠুকরে খাবার খেতো, দেখতে দেখতে খুশিতে ওর ঠোঁট দুটি কেঁপে উঠতো, মন বলতো, "ছবি আঁকি।"

শিউলি গাছের নিচে নিচে, খুব সকালে, ঝুম-ঝুম-ঝুম মল বাজিয়ে ফুলের মতো ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা যখন আঁচল ভরে শিউলি কুড়ুতো, তখন ওর চোখ বলতো, "ছবি আঁকি।"

ছুম কোনদিন মাকে দেখেনি। মা বলে কাউকে ডাকেওনি। তবু সেদিন অবধি বাবাকে দেখেছে। তারপর বাবা যে সেই সওদাগরের জাহাজে চেপে বাণিজ্য করতে গেলো, আর ফিরলো না। সেদিন থেকে দাদুও কেমন যেন অনেক বুড়ো হয়ে গেছে। এই এ্যাত্তখানি চওড়া বুক, ভেঙে বেঁকে গেছে। নইলে ছুম দেখেছে, দাদু সারাদিন রোদে রোদে ক্ষেতে ক্ষেতে ঘুরেছে আর ফসল ফলিয়েছে। সবুজের ছোঁয়ায় উপচে গেছে ওদের ছোট্ট মাটির ঘর, দালান, উঠোন। আজ আর কিচ্ছু নেই।

কিচ্ছু নেই দাদুর, আছে শুধু ছুম। ছুমকে নিয়েই দাদুর যত ভাবনা, যত কল্পনা। কিন্তু ও যে এখনও

ছোট্ট। দাদু তো বুড়ো হয়েছে। ক-দিন বাঁচবে আর? কেমন করে ছুমকে মানুষ করে যাবে দাদু? শরীর যে ভাঙছে। ভাঙতে ভাঙতে একদিন শেষ হয়ে গেলে?

না, শেষ হবে না। শেষ হতে দেবে না দাদু। একটি একটি বছর কাটে, একটি একটি শীত যায়, আর দাদু ভাবে, আহা! আর একটা শীত যেন কাটে!

এমনি করে কত বছর কেটে গেছে। আর এখন? শরীর যেন বইতে চায় না। ভয় লাগে!

একদিন ঘুম আসছিল না দাদুর চোখে। দাদুর পাশে ছুমও শুয়ে। ছুমের চোখেও ঘুম নেই। ছুম আজ শুয়ে শুয়ে ভাবছে, একদিন, না, দু-দিন পরে রাজার জন্মদিন। রাজার জন্মদিন তো ছুম কখনও দেখেনি। শুনেছে সে নাকি এক এলাহি ব্যাপার। রাজধানী-শহরে উৎসব আর আনন্দ। কত আলো, কত রঙ। হাসি আর মজা। আহারে! একবার যদি রাজধানী যেতে পায় ছুম।

"ছুম।" আচমকা দাদু ডাকলো।

"এ্যা।" ভাবতে ভাবতে চমকে সাড়া দিলো ছুম।

"ঘুম পাচ্ছে না?" জিগ্যেস করলে দাদু।

"ঘুম আসছে না।" উত্তর দিল ছুম। তারপর দাদুর বুকের মধ্যে একটি ছোট্ট পাখির মতো কুঁকড়িয়ে লুকিয়ে পড়লো। দাদু জড়িয়ে ধরলো ছুমকে। আদর করলো দাদু। জিগ্যেস করলে, "তুই কবে বড় হবি ছুম?"

ছুম উত্তর দিলে, "কেন, আমি তো বড় হয়ে গেছি। আর তো কদিন পরে আমি দশ-এ পা দেবো। এখন আমি সব বলতে পারি। বলো না, কী করতে হবে!

দাদু বললে, "দেখছিস তো, আমি বুড়ো হয়ে গেছি। খাটতে পারি না। পয়সা নেই। তোকে কী খেতে দেব?"

ছুম দাদুর গলাটি জড়িয়ে ধরলে। বললে, "সে তুমি ভেব না দাদু। আমি টুট্টুর পিঠে চেপে রাজধানী থেকে ঘুরে আসি, তারপর দেখবে কী করি।"

"রাজধানী!" চমকে উঠলো দাদু।

"হ্যাঁ। রাজার জন্মদিনের উৎসব দেখতে যাবো। জানো দাদু, আমি রাজার জন্যে একটা ছবি এ'কেছি।"

"কী ছবি?" দাদু যেন একটু ব্যস্ত হয়েই জিগ্যেস করলে।

ছুম বললে, "মাছ। কাল তোমায় দেখাবো। শুনেছি রাজা নাকি মাছ ভালবাসে।"

যেটুকু ঘুম দাদুর চোখে ছুঁই-ছুঁই করছিল, তাও যেন হারিয়ে গেল। বেবাক হয়ে গেলো দাদু। একটা ভাবনাই মনকে ছেয়ে ফেললে। ভাবনা, ছুম যা ভেবেছে তাতো করবেই!

ছুম জিগ্যেস করলে, "দাদু, বলছো না কিছু?"

দাদু বললে, "ছুম, আমি ভাবছি টুট্টু-কে বেচে দেবো।"

"এ্যাঁ!" আঁতকে উঠলো ছুম। তারপর দাদুর বুকের মধ্যে মুখ লুকিয়ে কে'দে উঠলো, "না-আ-আ।"

দাদু আবার বললে, "কী করি বল? পয়সা নেই, ঘরে খাবার নেই। কাল সকালেই লোক ডাকবো। একশোটা টাকা পেলেই বেচে দেবো।"

ছুমের মুখ দিয়ে আর কথা বেরুলো না। টুট্টুকে ছেড়ে ছুম যে কেমন করে থাকবে, ভাবতেই পারে না। টুট্টু যে ওর বন্ধু। ওর ঐ ছোট্ট ঘোড়াটাই যে সব। দাদুর কাছে ছুম কত রাজরাজড়ার গল্প শুনেছে। শুনেছে ঘোড়ার পিঠে চেপে তারা কত যুদ্ধ জয় করেছে। ছুমও ভেবেছে, একদিন সেও টুট্টুর পিঠে চেপে, তরোয়াল ঘুরিয়ে লড়াই করবে। রাজ্য জয় করবে। তারপর রাজপুত্তুরের মতো মাথায় পাগড়ি এ'টে, গলায় পান্না-চুনির মালা পরে, নাম-না-জানা রাজকন্যার খোঁজে বেরুবে। কোথায় থাকে সে রাজকন্যা? সে-দেশ কোথা? কে জানে কোথা! হয়তো কত পাহাড় ডিঙুতে হবে। কত নদী পেরুতে হবে। মরুর দেশে পাড়ি দিতে হবে। আঃ! ভাবতেই গা শিউরে ওঠে। ছুম আর ছবিট

না, না, সে কিছুতেই টুট্টুকে বেচতে দেবে না। কিছুতেই না।

দাদু ঘুমিয়ে পড়েছে। ঘুম পাচ্ছে না ছুমের। ঘরের জানলা দিয়ে বাইরের আকাশটা স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে ছুম। রাতের আকাশে ছোট্ট ছোট্ট তারার টিপ পারিয়ে কে যেন অবাক-অবাক ছবি এ'কে রেখেছে। আকাশটা যেন আশ্চর্যের হাতছানি। আকাশের বুকে যেন লুকিয়ে আছে কত গল্প, কত অজানা কাহিনী।

দাদু এখন নিশ্চিন্তে ঘুমুক। খুব চুপিসাড়ে বিছানা ছেড়ে উঠে পড়লো ছুম। না, টের পায় নি দাদু। অন্ধকার ঘরে আকাশ থেকে আলোর ছায়া যতটুকু নুয়ে পড়েছে, তাতেই ও নিজের জামাটা দেখতে পেলে। গায়ে দিলো। মাছের ছবিটা জামার পকেটে রাখলো। নিঃসাড়ে ঘরের দোর ঠেলে বেরিয়ে পড়লো ছুম। ছুটলো টুট্টুর কাছে। ওর পিঠে চাপলো, বললো, "চ।"

রাত অন্ধকার। কোথা যাবে ছুম জানে না। তবু ছুটলো টুট্টু, টগবগ, টগবগ।

গাছে গাছে পাখিগুলো ঘুম দেয়।
টগবগ, টগবগ।
ডালে ডালে ফুলকুঁড়ি দোল খায়।
টগবগ, টগবগ।
দূরে দূরে শেয়ালেরা হাঁক দেয়।
টগবগ, টগবগ।
তারাগুলো মিটিমিটি চোখ চায়।
টগবগ, টগবগ।

ছুটতে ছুটতে কখন যে তারাগুলো টুপ টুপ নিভে গেল, খেয়াল করতে পারলো না ছুম।

শেয়ালেরা হে'কে হে'কে ,কখন যে চুপ করে গেল

বুঝতে পারলো না ছুম।

ডালে ডালে ফুলকুঁড়ি কখন যে দুলে দুলে ফুটে উঠলো, দেখতে পেলো না ছুম।

পাখিগুলো ঘুম ভেঙে কখন যে গাছে গাছে গেয়ে উঠলো, জানতে পারলো না ছুম।

সোনা-সোনা ভোরের আকাশ। ঝুরু ঝুরু মিষ্টি হাওয়া। আঃ! সকাল হয়ে গেছে। তবু টুটু ছুটছে, টগবগ, টগবগ।

আর ছুটতে হবে না। রাজধানী এসে গেছে। আঃ! কী সুন্দর! চোখ ধাঁধিয়ে গেলো ছুমের। মস্ত মস্ত বাড়ি। হাজার রকম গাড়ি। নানান সাজের মানুষ।

কী সুন্দর সাজিয়েছে আজ রাজধানীকে। যেদিকে চাও, দেখবে রঙিন-রঙিন পতাকা। আকাশে বেলুন। ইয়া বড় বড় পুতুল, রাক্ষস-খোক্কস, বাঘ-সিংহি। রাস্তার সকালের রোদে ঝিলমিল করছে। কেন এত সাজের ঘটা? আজই তো রাজার জন্মদিন! একটু পরে রাজার মিছিল বেরুবে। রাজা মিছিল করে মন্দিরে যাবেন। ঠাকুরকে প্রণাম করে আসবেন। বলে নাকি. সে-মিছিল দেখলে চোখ ঝলসে যায়। মিছিল দেখার আগেই ছুমের যা অবস্থা! দেখলে না জানি কী হয়।

ছুমের তো বুকখানা খুশিতে ভরে গেলো। কোথা যেতে কোথায় এসে পড়েছে। ভালই হয়েছে। ভাগ্যিস বেরিয়ে পড়েছিলো! তা না হলে রাজার মিছিল দেখাই হতো না। যখন মিছিল বেরুবে, একটা বেশ জুতসই জায়গা দেখে দাঁড়াবে ছুম। একটু উঁচু যেখান থেকে সব দেখা যাবে। তারপর যেই রাজা তার সামনে দিয়ে যাবে, ও ছুট্টে গিয়ে রাজার হাতে ছবিটা—

থমকে গেলো ছুম। ছবিটা আছে তো! বুকটা ধক করে চমকে উঠলো। তাড়াতাড়ি জামার পকেটে হাত দিলে। উঃ! খুব রক্ষে! আছে! একদম মনে ছিলো না ছুমের।

ছুম টুটুর পিঠে বসে বসেই হাঁটছিলো। হাঁটছিলো, দেখছিলো। আর ভাবছিল। মনে হচ্ছে টুটুর একটু একটু কষ্ট হচ্ছে। টুটুর আর দোষ কী। সারারাত ছুটছে। কষ্ট তো হবেই। না, একটু জিরিয়ে নেওয়া ভালো।

হাঁটতে হাঁটতে টুটু যেদিকটা এলো সেখানটা যে

একেবারে নিরিবিলি, নিঃঝুম, তা নয়। তবে লোকজন অনেকটা কম। টুটুর পিঠ থেকে নেমে পড়লো ছুম। সামনে একফালি সবুজ ঘাস ভর্তি মাঠ। বেশ খোলামেলা। ছেড়ে দিলো টুটুকে সেখানে। খিদে পেয়েছে টুটুর। ঘাস চিবুতে লাগলো।

ছুম কী করবে? ঐ নরম ঘাসের ওপর শরীরটা একটু এলিয়ে দেবে, না ঘুরে ঘুরে দেখবে? দেখতেই ইচ্ছে করেছে। বললেই তো আর শহরে আসা যায় না! সব দেখে নেওয়াই ভালো।

আরে! সামনে ও আবার কে? রাস্তায় বসে বসে যেন কী করছে! এগিয়ে গেলো ছুম। সত্যিই তো! দেখে, বসে বসে রাস্তার ওপর খড়ি দিয়ে ছবি আঁকছে! কী ছবি দেখিতো! একটা কুকুর! কী সুন্দর!

আঁক দেখতে দেখতে তার সামনে বসে পড়লো ছুম উপুড় হয়ে। অবাক-চোখে দেখতে লাগলো। ছবিও দেখছে, লোকটাকেও দেখছে। লোকটা যেন কেমন-কেমন! কাপড়টা ছেঁড়া-ছেঁড়া। ফতুয়াটা ময়লা-ময়লা। পাশে একটা পুঁটলি। তাতে সাত সতের ভর্তি কী সব। হয়তো ওর সম্পত্তি। পুঁটলিটার পাশে কটা রঙের খড়ি। একটা লাল, একটা নীল, একটা বাদামী, একটা কালো। ছড়িয়ে ছড়িয়ে এদিক ওদিক পড়ে আছে। ছুম ভাবলে, আঁক শেষ হলে নিশ্চয়ই রঙ করবে। তখন কুকুরটা আরও সুন্দর দেখতে লাগবে। দেখি না কী করে!

একটু পরেই তো আঁক শেষ হলো। কই রঙ তো দিল না। ও কী! এ'কেজুকে, পুঁটলিটা মাথায় দিয়ে, দিব্যি শুয়ে পড়লো লোকটা টান টান হয়ে। ছুমের একবার মনে হলো জিগ্যেস করে, কই রঙ দিলে না? সাহস হলো না। কিন্তু ছুমের মনটা বড় ছুঁক ছুঁক করছে। মনে হচ্ছে কুকুরের গাটা যদি বাদামী হতো আর গা ভর্তি কালো-কালো ছোপ, ভারি মানাতো। ছুমের হাত নিসপিস করছে! করলেই বা কী! ছবিটা তো ওর নয়। রঙগুলোও নয়। পরের জিনিসে হাত দিয়ে কাজ কী বাবা!

হঠাৎ যেন বাজনা শোনা যাচ্ছে! হ্যাঁ, হ্যাঁ, রাজার মিছিল বেরিয়েছে। এদিক দিয়েই যাবে। এগিয়ে আসছে। কিন্তু লোকটার যেন কোন গ্রাহ্যই নেই। চোখ বুজে কেমন পড়ে আছে দেখো! ঘুমিয়ে পড়লো নাকি!

শীল—

ছুম একদিষ্টে চেয়ে চেয়ে দেখতে লাগলো লোকটার দিকে। হ্যাঁ, ঘুমিয়েই পড়েছে। কেমন ফুরফুর করে নাক ডাকাচ্ছে! ছুমেরও মন ছটফট করে উঠলো। ও আর থাকতে পারলো না। বাজনার শব্দ ওর মনকে যেন খুশিতে ভরিয়ে দিলো। হাত বাড়ালো ছুম। চট করে বাদামী খড়িটা কুড়িয়ে নিয়ে, কুকুরের গায়ে বুলিয়ে বুলিয়ে ভরিয়ে দিলে। কালো-রঙের খড়ি নিয়ে বাদাম-গায়ে ছোপ দিলে। ভারি সুন্দর দেখতে হয়েছে! কিন্তু চোখ দুটো? তাই তো! চোখে কী দেয়, কোন রঙটা? নীল রঙটা।

আর দেখতে! যেই না দুটি চোখে নীল পড়েছে, আর অমনি কুকুরটা ঘেউ-ঘেউ করে ডেকে উঠেছে। ছুম একেবারে থতমত খেয়ে গেছে! কুকুরটা ডেকে উঠেই দাঁড়িয়ে পড়েছে! কী কাণ্ড! ছবির কুকুর জ্যান্ত হয়ে গেছে! দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ল্যাজ নাড়ছে আর জিব ভেঙাচ্ছে!

ছুম একেবারে হাঁদারাম! কী করবো, কী করবো ভাবতে ভাবতেই কুকুরটা মারলে দৌড়, "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ।" ছুমও কিছু ভেবে না পেয়ে দৌড় দিলে পেছনে পেছনে।

কুকুরটা দৌড়ুচ্ছে, "ঘেউ, ঘেউ।"

আর ছুম ডাকছে, "কুকুর, কুকুর, দাঁড়া, তুতু।"

বয়ে গেছে।

রাজার মিছিল দেখতে রাজপথে লোক গিসগিস। কুকুরটা ছুটতে ছুটতে, ডাকতে ডাকতে একেবারে ভিড়ের মধ্যে সেঁদিয়ে পড়েছে। এই রে! তাড়া লাগিয়ে ডেকে উঠল, "ঘেউ, ঘেউ" ব্যস! ছুট, ছুট, ছুট! যে যেদিকে পারলো একেবারে দিশেহারা হয়ে ছুটতে লাগলো। ছুটতে ছুটতে ধাক্কা-ধাক্কি। কেউ পড়লো, কেউ উঠলো। গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলো, "পাগলা কুকুর, পাগলা-কুকুর।"

ভিড়ের মধ্যে ঠেলাঠেলিতেও ছুমও নাস্তানাবুদ। লোকে চেঁচায়, "পাগলা কুকুর, পাগলা কুকুর।"

ছুম চেঁচায়, "কুকুর, কুকুর, আঃ তুতু!"

কে শুনছে! সামনে ছোটে লাল-শাড়ি মেয়েটা। কুকুর ছুটলো তার পেছনে। মেয়েটা "মা গো" বলে ভ্যাঁ!

ডাইনে ছোটে মেজ-পিসির ছেলেটা। কুকুর ডাকলো তার পেছনে। ছেলেটা "বাবা গো" বলে চিৎপটাং।

ছুটোছুটিতে ঠেলাঠেলিতে যেন কুরুক্ষেত্র!

এদিকে রাজার মিছিল এগিয়ে এসেছে। এইরে! কুকুরটা সব ছেড়ে এবার মিছিলের মধ্যে ঢুকে পড়েছে। কী হবে?

বাজনদার বাজনা ফেলে দে চম্পট।

ঢাকী ঢাক ছেড়ে পগারপার।

হাতিগুলো ভয়ে ভয়ে নাচছে। উটগুলো ছুটছে। ঘোড়াগুলো ডাকছে আর পল্টনগুলো এদিক ওদিক কাটছে।

কুকুর ডাকছে, "ঘেউ ঘেউ।"

ছুম ছুটছে, "আঃ তুতু।"

রথের চাকা ছিটকে গেলো। এক্কাগাড়ি উল্টে গেলো। বীর সেনারা পালিয়ে গেলো।

মিছিলের পিছু পিছু ঘোড়ার পিঠে রাজা আসছিলেন। খোস মেজাজে। হঠাৎ রাজার চমক ভাঙলো। ভুরু কুঁচকিয়ে জিগ্যেস করলেন, "কী ব্যাপার? এত হৈচৈ কেন?"

একজন হন্তদন্ত হয়ে বললে, "আজ্ঞে, পাগলা কুকুর তাড়া করেছে।"

বলতে বলতেই কুকুরটা একেবারে রাজার পেছনে "ঘ্যাঁক" করে ঘোড়ার পায়ে কামড়ে দিয়ে, "ঘে-ও, ঘে-ও" করে ডেকে উঠলো।

রাজা ভয়ে চমকে উঠে, "কে-ও কে-ও" বলে হাঁক দিলেন। ব্যস! তারপর ঘোড়ার কী তিড়িং বিড়িং লাফানি। লাফাতে লাফাতে জোড় কদমে ছুট।

কুকুরও ছাড়বে না। ঘোড়া ছোটে, সে-ও ছোটে। তাই না দেখে রাজা চেঁচায়, "বাঁচাও, বাঁচাও!"

কে বাঁচাবে? কোথায় পল্টন আর কোথায় সিপাই! রাজার যেন কান্না পেয়ে গেলো! বাবা! আচ্ছা রাজাতো! কুকুরের তাড়া খেয়েই এই দশা! না-জানি বাঘ-ভাল্লুক হলে কী হতো!

দেখে শুনে মনে হচ্ছে, এ-কুকুরটা বাঘ-ভাল্লুকের বাড়া। "ঘেউ, ঘেউ, ঘেউ," ডাকছে, আর রাজার ঘোড়ার পিছু ছুটছে। একেবারে নাছোড়বান্দা। এই দেখো, ঘোড়ার পায়ে আবার বুঝি কামড়ে দেয়!

"ঘ্যাঁক!" কী হলো? কামড়ে দিলো?

না, না, লাফ দিলো। এই সব্বনাশ! লাফ দিয়ে ঘোড়ার ল্যাজটা কামড়ে ধরে ঝুলে পড়েছে যে! বাপরে! বাপরে! কী কান্ড! ঘোড়ার ল্যাজে কুকুর ঝোলে!

অমনি ঘোড়াটা চিৎকার সুরু করে দিলে, "চিঁহিঁহিঁ।" চার পা তুলে লম্ফঝম্প লাগিয়ে দিলে।

যতই লাফাও আর যতই চেঁচাও, কুকুর কিন্তু ল্যাজ ছাড়ছে না। ঠিক ঝুলবে।

দেখে তো রাজার চক্ষু চড়কগাছ। রাজা "ভ্যাঁ" করে কেঁদে ফেললেন। হাত ফস্কে ঘোড়ার পিঠ থেকে মাটিতে ধপাস!

ঘোড়াটা চার পা তুলে লাফাচ্ছে।

মাটিতে রাজা পড়ে কোঁকাচ্ছে।

আর কুকুরটা ল্যাজ কামড়ে হাঁপাচ্ছে।

ছুটতে ছুটতে ছমও সেখানে হাজির। ছম ঘোড়ার লাফানি আর কুকুরের হাঁপানি দেখে না পারছে এগোতে, না পারছে পেছতে। সব্বনাশ! কী হবে এখন? ছম ভাবলে, কুকুরটা নিশ্চয়ই ক্ষেপে গেছে। ক্ষ্যাপাকে ঠান্ডা করি কেমন করে? কাছে পিঠে লাঠিও দেখছি না, বাড়িও দেখছি না যে দুঘা বসিয়ে দিই।

কী বরাত! ঠিক সেই সময়, জলভর্তি কলসি কাঁখে, সেখান দিয়ে একটা বুড়ি ছুটে পালাচ্ছিলো। ছম এদিক ওদিক দেখে, ছুটে গিয়ে, বুড়ির কাঁখ থেকে কলসিটা ছিনিয়ে নিলে। নিয়ে জলশুদ্ধ কলসিটা হুড় হুড় করে কুকুরের গায়ে উল্টে দিলে।

যাঃ চলে! এ কী হলো?

কী হলো?

কোথায় কুকুর!

মানে?

একেবারে চক্ষের নিমেষে কুকুর উধাও। না, উধাও না; তবে? মাথায় জল পড়তেই কুকুরটা হুস করে গলে গেলো! ঐ তো, ঘোড়ার ল্যাজ থেকে টুপ টুপ করে রঙ ঝরছে! বাদামী-বাদামী রঙ, কালো-কালো রঙ, নীল-নীল রঙ। মাটি দিয়ে গড়িয়ে যাচ্ছে।

ছমের চক্ষু কপালে! ছম গালে হাত দিয়ে দেখছে আর ভাবছে, এ কী হলো! ছবির কুকুর জ্যান্ত হলো, আবার জল ঢালতে গলেও গেলো! তাজ্জব কান্ড তো!

কুকুরটা জলে ধুয়ে যেতেই, ঘোড়াটার চিৎকার থামলো। ঘোড়ার চিৎকার থামতে রাজারও কান্না বন্ধ হলো। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে ঝেড়েঝুড়ে উঠে পড়লেন রাজা। এদিক ওদিক দেখলেন। কেউ কোত্থাও নেই। যাক, কেউ দেখে ফেলেনি এই রক্ষে! কেবল দেখলেন, ছম দাঁড়িয়ে আছে। ঘোড়ার ল্যাজ দিয়ে তখনও টুস টুস করে রঙ গড়িয়ে পড়ছে। সেই রঙ দেখতে দেখতে ছমের কাছে এগিয়ে এলেন রাজা। ছম তো ভয়ে কাঠ! রাজা ছমের চোখের দিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে এমন আচমকা হেসে উঠলেন হো হো হো করে যে চমকে উঠলো ছম। হাসতে হাসতেই ছমকে দু হাত দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরে চেঁচিয়ে উঠলেন, "সাবাস!"

দেখতে দেখতে পল্টনগুলো কোত্থেকে আবার ছুটে এলো। সেপাইগুলো পড়ি-মরি দৌড়ে এলো। আবার ভেঁপু বাজালো। ঢাকে কাঠি পড়লো।

সঙ্গে সঙ্গে রাজা গর্জে উঠলেন, "বাজনা বন্ধ করো এ-মিছিল আর চলবে না।" বলে রাজা ছমকে কোলে নিয়ে ঘোড়ার পিঠে চড়ে বসলেন। ঘোড়া রাজবাড়ির দিকে ছুট দিলো।

রাজার কোলে বসে বসে ছম ভাবছে, "বেশ তো মজা!"

রাজবাড়িতে এসে, ছমকে নিয়ে, দরবার-ঘরে হাঁটা দিলেন রাজা। হুকুম দিলেন, "এখনই সভা বসবে।"

তক্ষুনি পাত্র-মিত্র মন্ত্রী-অমাত্য সবাই হন্তদন্ত হয়ে হাজির। নিজের পাশে ছমকে বসিয়ে, রাজা রাজ-সিংহাসনে বসলেন। ছম তো অবাক! শুধু ফ্যাল ফ্যাল করে সোনার সিংহাসন আর রাজার ঝলমলে পোশাকের দিকে দেখতে লাগলো হাঁ করে।

একটু পরেই দরবার-ঘর লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। রাজা তখন সিংহাসন ছেড়ে উঠলেন। বললেন, "আজ আমার বেশ শিক্ষা হয়েছে। যে দেশের সেপাই-সেনা, পল্টন-পেয়াদা কুকুর দেখে ভয় পায়, সে দেশের সেনাদের যে কত মুরোদ, তা আমি আজ নিজের চোখে দেখেছি। এই যে ছেলেটিকে দেখছেন, এই ছেলেটি আজ অসাধ্য সাধন করেছে। আমার রাজ্যে সবচেয়ে সাহসী যদি কেউ থাকে, তবে সে এই ছেলেটি। নিজের জীবন তুচ্ছ করে, এই ছোট্ট ছেলেটি আমাদের জীবন বাঁচিয়েছে। সুতরাং আমার জন্মদিনে এই ছেলেটিকে আমি সবচেয়ে বড় খেতাব বীরচক্র দান করছি।" বলে, রাজা ছমের জামায় একটি সোনার তকমা এঁটে দিলেন। নিজের গলার সবচেয়ে দামী মণি-মুক্তার মালাটি খুলে ছমের গলায় পরিয়ে দিলেন। তারপর ছমকে বুকে জড়িয়ে ধরে একটি সোনার বাক্স

হাতে দিয়ে বললেন, "এই বাক্সে লক্ষ মোহর আছে। আজ থেকে আমার রাজত্বে তোমার আর কোন দুঃখ থাকবে না। তোমার জন্যে আমার ভাণ্ডার সব সময় খোলা।"

ছুমের হাত দুটি কেঁপে উঠলো। হতভম্বের মতো চেয়ে রইলো, সোনার বাক্সটার দিকে।

রাজা ওর কপালে একটি চুমু দিলেন। বললেন, "তুমি কিছু বল।"

ছুম একেবারে থ হয়ে গেছে। কী বলবে, কী না-বলবে কিছুই ভেবে পাচ্ছে না। হঠাৎ মনে পড়ে গেলো, তাইতো! তার পকেটে মাছের ছবি আছে। সোনার বাক্সটা নামিয়ে রেখে, চট করে ছবিটা পকেট থেকে বার করলো ছুম। কিন্তু লজ্জা করছে। কেমন করে এই বিচ্ছিরি ছবিটা রাজাকে দেয় সে!

রাজা জিগ্যেস করলেন, "কী ওটা?"

অত লজ্জাতেও ছুম রাজার দিকে হাতটি বাড়িয়ে দিলো। ভয়ে-ভয়ে ধরা-ধরা গলায় বললে, "রাজামশাই, আপনার জন্মদিনে আমার উপহার। আমি এঁকেছি।"

"মাছের ছবি।" রাজা খুশিতে চিৎকার করে উঠলেন। মাছের ছবি হাতে নিয়ে হেসে উঠলেন, "হো-হো-হো।"

রাজার হাসি দেখে ছুমও হেসে উঠলো। খুশিতে ভরিয়ে দিল রাজ-দরবার। তারপর সোনার বাক্সটি হাতে তুলে নিলো ছুম। পা দুটি ওর নেচে উঠলো। হাসতে হাসতে রাজ-দরবার থেকে বাইরে ছুট দিলো ছুম।

রাজা জিগ্যেস করলেন, "কোথা যাও? কোথা যাও?"

ছুম বললে, "আসছি রাজামশাই।"

মন্ত্রী চেঁচালেন, "ওকে আটকাও, ওকে আটকাও।"

রাজা হুকুম করলেন, "না, ওকে যেতে দাও!"

ছুটতে ছুটতে ছুম একেবারে রাস্তায়। এদিক ওদিক দেখতে দেখতে সট্টান টুট্টুর কাছে। টুট্টু এখনও ঘাস চিবুচ্ছে। দেখতে পেয়ে আনন্দে টুট্টুর গলাটি জড়িয়ে ধরলো ছুম। ওকে আদর করতে করতে লুটোপুটি খেতে লাগলো। হাসতে হাসতে টুট্টুর পিঠে লাফিয়ে বসলো। না, আর দেরি নয়। এক্ষুনি ঘরে ফিরে যেতে হবে। দাদু বুড়ো-মানুষ, নিশ্চয়ই খুব ভাবছে ছুমের জন্যে। আহা! এতদিন ছুমের জন্যে কত কষ্ট করেছে দাদু। আর এখন? আর কোন কষ্ট থাকবে না। একদম না। আজ থেকে দাদুর ছুটি!

চোখ দুটি ছলছল করে উঠলো ছুমের। প্রথম, আজই প্রথম দাদুর জন্যে ওর চোখ দুটি কেঁদে ফেলেছে।

রাজার মুক্তা মালাটি ছুমের গলায় দুলছে আর রোদের ছোঁয়ায় ঝিকমিক করছে। ভালো লাগছে না দেখতে?

আর?

দাদুর জন্যে ছুমের চোখ দুটি আজ ছলছলিয়ে টলমল করছে। কী সুন্দর লাগছে বলো তো?

কিন্তু কোনটি সবচেয়ে সুন্দর লাগছে? রাজার মালাটি, না ছুমের জল-টলমল চোখ দুটি? কে বলতে পারে?

কেউ না, কেউ না।

ছবি এঁকেছেন পূর্ণেন্দু পত্রী

ভয়ংকর সুন্দর

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়

লীদার নদীর তীরে

আর সবাই পাহাড়ে গিয়ে কত আনন্দ করে, আমাকে সারাদিন বসে থাকতে হয় গজ ফিতে নিয়ে। পাথর মাপতে হয়। ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন কাকাবাবু, আর একটা দিক ধরে টানতে টানতে আমি নিয়ে যাই, যতক্ষণ না ফুরোয়।

আজ সকাল থেকে একটুও কুয়াশা নেই। ঝকঝক করছে আকাশ। পাহাড়গুলোর মাথায় বরফ, রোদ্দুরে লেগে চোখ ঝলসে যায়। ঠিক মনে হয় যেন সোনার মুকুট পরে আছে। যখন রোদ্দুর থাকে না, তখন মনে হয়, পাহাড় চূড়ায় কত কত আইসক্রিম, যত ইচ্ছে খাও, কোনোদিন ফুরোবে না।

আমার ডাক নাম সন্তু। ভালো নাম সুনন্দ রায়চৌধুরী। আমি বালিগঞ্জের তীর্থপতি ইনসটিটিউশানে ক্লাস এইট-এ পড়ি। আমার একটা কুকুর আছে তার ডাক নাম রকু। ওর ভালো নামও অবশ্য আছে একটা। ওর ভালো নাম রকুকু। আমার ছোটমাসীর বাড়িতে একটা পোষা বিড়াল আছে। আমি সেটার নাম রেখেছি ন্যড়াবি। আমি ওকে তেমন ভালবাসি না, তাই ওর ডাক নাম নেই। আমার কুকুরটাকে সঙ্গে আনতে পারিনি বলে মাঝে মাঝে আমার মন খারাপ হয়। আমি গত বছর ফাইনাল পরীক্ষায় সেকেন্ড হয়েছি, কিন্তু স্পোর্টসে চারটে আইটেমে ফার্স্ট হয়েছিলুম। কাকাবাবু এই জন্য আমাকে খুব ভালবাসেন।

আজ চমৎকার বেড়াবার দিন। কিন্তু আজও সকালবেলা কাকাবাবু বললেন, চলো সন্তু, আজ সোনমার্গের দিকে যাওয়া যাক্। ব্যাগ দুটোতে সব জিনিস পত্তর ভরে নাও!

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, সোনমার্গে তো আগেও গিয়েছিলাম। আবার ওখানেই যাবো?

হ্যাঁ, ঐ জায়গাটাই বেশী ভালো। ঐখানেই কাজ করতে হবে।

আমি একটু মন খারাপ করে বললাম, কাকাবাবু, আমরা শ্রীনগর যাবো না?

না, না, শ্রীনগরে গিয়ে কী হবে? বাজে জায়গা। খালি জল আর জল! লোকজনের ভিড়!

আজ চোদ্দ দিন হলো আমরা কাশ্মীরে এসেছি। কিন্তু এখনও শ্রীনগর দেখিনি। একথা কেউ বিশ্বাস করবে? আমাদের ক্লাসের ফার্স্টবয় দীপঙ্কর গত বছর বেড়াতে এসেছিল কাশ্মীরে। দীপঙ্করের বাবা বলে রেখেছেন, ও পরীক্ষায় ফার্স্ট হলে, ওকে প্রত্যেকবার ভালো ভালো জায়গায় বেড়াতে নিয়ে যাবেন। সেইজন্যই তো দু' নম্বরের জন্য সেকেন্ড হয়েও আমার দুঃখ হয়নি। কাশ্মীর থেকে ফিরে গিয়ে দীপঙ্কর কত গল্প বলেছিল। ডাল হ্রদের ওপর কতরকমের হাউস বোট। সেই হাউস বোটে থাকতে কী আরাম। রাত্তিরবেলা যখন সব হাউস বোটে আলো জ্বলে ওঠে তখন মনে হয় জলের ওপর মায়াপুরী বসেছে। শিকারা নামে ছোট ছোট নৌকো ভাড়া পাওয়া যায়, তাইতে চড়ে যাওয়া যায় যেখানে ইচ্ছে সেখানে। মোগল গার্ডেনস, চশমাসাহী, নেহরু পার্ক—এইসব জায়গায় কী ভালো ভালো সব বাগান।

দীপঙ্করের কাছে গল্প শুনে আমি ভেবেছিলাম, যে শ্রীনগরই বুঝি কাশ্মীর। এবার কাকাবাবু যখন কাশ্মীরে আসবার কথা বললেন, তখন কী আনন্দই যে হয়েছিল আমার! কিন্তু এখনো আমার কাশ্মীরের কিছুই প্রায় দেখা হলো না। চোদ্দ দিন কেটে গেল। কাকাবাবুর কাছে শ্রীনগরের নাম বললেই উনি বলেন, ওখানে গিয়ে কি হবে? বাজে জায়গা! শুধু জল! জলের ওপর তো আর ফিতে দিয়ে মাপা যায় না। তাই বোধহয় কাকাবাবুর পছন্দ নয়।

অবশ্য এই **পহলগাম** জায়গাটাও বেশ সুন্দর। কিন্তু যে-জায়গাটা এখনও দেখিনি, সেই জায়গাটাই কল্পনায় বেশী সুন্দর লাগে। **পহলগামে** বরফ মাখা পাহাড়-গুলো এত কাছে যে মনে হয় এক দৌড়ে চলে যাই। একটা ছোট্ট নদী বহে গেছে **পহলগাম** দিয়ে। ছোট হলেও নদীটার দারুণ স্রোত, আর জল কী ঠান্ডা!

পহলগামে অনেক দোকান পাট, অনেক হোটেল আছে। এখান থেকেই তো তীর্থযাত্রীরা অমরনাথের দিকে যায়। অনেক সাহেব মেমেরও ভিড়। আমরা কিন্তু হোটেলে থাকি না। আমরা থাকি নদীর এপারে, তাঁবুতে। এই তাঁবুতে থাকার ব্যাপারটা আমার খুব পছন্দ। দীপঙ্করেরা শ্রীনগরে জলের ওপর হাউস বোটে ছিল, কিন্তু ওরা তো তাঁবুতে থাকেনি! দমদমের ভি-আই-পি রোড দিয়ে যেতে যেতে কতদিন দেখেছি, মাঠের মধ্যে সৈন্যরা তাঁবু খাটিয়ে আছে। আমারও খুব শখ হতো তাঁবুতে থাকার।

আমাদের তাঁবুটা ছোট হলেও বেশ ছিমছাম। পাশা-পাশি দুটো খাট, কাকাবাবুর আর আমার। রাত্তিরবেলা দু' পাশের পর্দা ফেলে দিলে ঠিক ঘরের মতন হয়ে যায়। আর একটা ছোট ঘরের মতন আছে এক পাশে, সেটা জামা কাপড় ছাড়ার জন্য। অনেকে তাঁবুতে রান্না করেও খায়, আমাদের খাবার আসে হোটেল থেকে। তাঁবুতে শুলেও খুব বেশী শীত করে না আমাদের, তিন খানা করে কম্বল গায় দিই তো! কত রাত পর্যন্ত শুয়ে শুয়ে নদীর স্রোতের শব্দ শুনতে পাই। আর কী একটা রাত-জাগা পাখি ডাকে, চি-আও! চি-আও!

মাঝে মাঝে অনেক রাত্তিরে তাঁবুর মধ্যে মানুষজনের কথাবার্তা শুনে ঘুম ভেঙে যায়। আমার বালিশের পাশেই টর্চ থাকে। তাড়াতাড়ি টর্চ জেবলে দেখি। কাশ্মীরে চোর-ডাকাতের ভয় প্রায় নেই বললেই চলে। এখানকার মানুষ খুব অতিথিপরায়ণ। টর্চের আলোয় দেখতে পাই, তাঁবুর মধ্যে আর কেউ নেই। কাকাবাবু ঘুমের মধ্যে কথা বলছেন। কাকাবাবুর এটা অনেক দিনের স্বভাব। কাকাবাবু ঘুমিয়ে ঘুমিয়েও কার সংগে যেন তর্ক করেন। তাই ওঁর দু'রকম গলা হয়ে যায়। কথাগুলো আমি ঠিক বুঝতে পারি না, কিন্তু আমার এই সময় একটু ভয় ভয় করে। তখন উঠে গিয়ে কাকাবাবুর গায়ে একটু ঠেলা মারলেই উনি চুপ করে যান।

সকালবেলা মুখ হাত ধুয়ে, চা-টা খেয়ে আমরা বেরিয়ে পড়লুম। তাঁবুতে থাকার একটা সুবিধে এই, দরজায় তালা লাগাতে হয় না। তাঁবুতে তো দরজাই থাকে না। দরজার বদলে শক্ত পর্দা, সেটা দড়ি দিয়ে বেঁধে রাখলেই হয়। আমাদের কোনো জিনিস পত্তর কোনোদিন চুরি হয়নি, কাশ্মীরে চোর নেই। অবশ্য ডাকাত আছে। সেটা আমরা পরে টের পেয়েছিলুম।

ছোট্ট ব্রীজটা পেরিয়ে চলে এলুম নদীর এদিকে। এই সকালেই রাস্তায় কত মানুষজনের ভিড়। ঝাঁক ঝাঁক সাহেব মেম এসেছে আজ। ঘোড়াওয়ালা ছেলেরা ঘোড়া ভাড়া দেবার জন্য সবাই এক সংগে **চিল্লামিল্লি** করছে। আমরা কিন্তু এখন ঘোড়া ভাড়া নেব না। আমরা বাসে করে যাবো এখন সোনমার্গ। তারপর সেখান থেকে ঘোড়া ভাড়া নিয়ে পাহাড়ে উঠবো।

কাকাবাবুর ঘোড়ায় চড়তে খুব কষ্ট হয়। তাই আমরা ঘোড়ায় বেশী চড়ি না। প্রথম ক'দিন আমাদের একটা জিপ গাড়ি ছিল। এখানকার গভর্নমেন্ট থেকে দিয়েছিল। গভর্নমেন্টের লোকেরা কাকাবাবুকে খুব খাতির করেন। কিন্তু আমার কাকাবাবু ভারী অদ্ভুত। তিনি কোনো লোকের সাহায্য নিতে চান না। দু'তিন দিন বাদেই তিনি জিপ গাড়িটা ফেরৎ পাঠিয়ে দিয়েছেন। খোঁড়া পা নিয়েই তিনি কষ্ট করে চড়বেন ঘোড়ায়। এই যাঃ, বলে ফেললাম! আমার কাকাবাবুকে কিন্তু অন্য কেউ খোঁড়া বললে আমার ভীষণ রাগ হয়। আমি তো শুধু একবার মনে মনে বললাম। কাকাবাবু তো জন্ম থেকেই খোঁড়া নন্। মাত্র দু'বছর আগে কাকাবাবু যখন আফগানিস্তানে গিয়ে-ছিলেন তখন কাবুলের থেকে খানিকটা দূরে ওঁর গাড়ি উল্টে যায়। তখনই একটা পা একেবারে চিপ্‌সে ভেঙে

গিয়েছিল।

কাকাবাবুকে এখন ক্রাচে ভর দিয়ে হাঁটতে হয়। এখন আর একলা একলা নিজে সব কাজ করতে পারেন না বলে কোথায় গেলে আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমারও বেশ মজা, কত জায়গায় বেড়াই। গত বছর পুজোর সময় গিয়েছিলাম মথুরা, সেখান থেকে কালিকট। হ্যাঁ, সেই কালিকট বন্দর, যেখানে ভাস্কো-ডা-গামা প্রথম এসেছিলেন। ইতিহাস-ভূগোলে যে-সব জায়গার নাম পড়েছি, সেখানে সত্যি সত্যি কোনোদিন বেড়াতে গেলে কী রকম যে অদ্ভুত ভালো লাগে, কী বলবো!

ক্রাচে ভর দিয়েও কিন্তু কাকাবাবু খুব তাড়াতাড়ি হাঁটতে পারেন। দু' হাতে দুটো ব্যাগ নিয়ে আমি পাল্লা দিতে পারি না। এত তাড়াতাড়ি এসেও কিন্তু আমরা বাস ধরতে পারলুম না। সোনমার্গ যাবার প্রথম বাস একটু আগে ছেড়ে গেছে। পরের বাস আবার একঘণ্টা বাদে। অপেক্ষা করতে হবে।

কাকাবাবু কিন্তু বিরক্ত হলেন না। আমার দিকে তাকিয়ে মুচকি হেসে বললেন, কী সন্তু, জিলিপি হবে নাকি?

আমি লজ্জা পেয়ে মাথা নিচু করলুম। কাকাবাবু যে এক এক সময় মনের কথাটা ঠিক কী করে বুঝতে পারেন! পহলগামে যারা বেড়াতে যায়নি, তারা বুঝতেই পারবে না, এখানকার জিলিপি'র কী অপূর্ব স্বাদ! খাঁটি ঘিয়ে ভাজা মস্ত বড় মৌচাক সাইজের জিলিপি। ভেজাল ঘি কাশ্মীরে পাওয়া যায় না, ডালডা তো বিক্রিই হয় না।

সোনার খোঁজে, না, গন্ধকের খোঁজে?

বাস স্ট্যান্ডের কাছেই সোহনপালের বিরাট মিষ্টির দোকান। ভেতরে চেয়ার টেবিল পাতা, দেয়ালগুলো সব আয়না দিয়ে মোড়া। খাবারের দোকানের ভেতরে কেন যে আয়না দেয় বুঝি না। খাবার খাওয়ার সময় নিজের চেহারা দেখতে কারুর ভালো লাগে নাকি? জিলিপিতে কামড় বসাতেই হাত দিয়ে রস গড়িয়ে পড়লো।

কী প্রোফেসার সাহেব, আজ কোনদিকে যাবেন?

তাকিয়ে দেখি আমাদের টেবিলের সামনে দাঁড়িয়ে আছে একজন বিশাল চেহারার মানুষ। চিনি এ'কে, নাম সুচা সিং। প্রায় ছ' ফিট লম্বা, কব্জি দুটো আমার উরুর মতন চওড়া, মুখে সুবিন্যস্ত দাড়ি। সুচা সিং এখানে অনেকগুলো বাস আর ট্যাক্সির মালিক, খুব জবরদস্ত ধরনের মানুষ। কী কারণে যেন উনি আমার কাকাবাবুকে প্রোফেসার বলে ডাকেন, যদিও কাকাবাবু কোনোদিন কলেজে পড়াননি। কাকাবাবু আগে দিল্লিতে গভর্নমেন্টের কাজ করতেন।

এখানে একটা কথা বলে রাখি। কাশ্মীরে এসে প্রথম কয়েকদিনেই অবাক হয়ে লক্ষ্য করেছিলুম, এখানে অনেকেই ভাঙা ভাঙা বাংলা বলতে পারে। বাংলাদেশ থেকে এত দূরে, আশ্চর্য ব্যাপার, না? কাকাবাবুকে জিগ্যেস করেছিলুম এর কারণ। কাকাবাবু বলেছিলেন, ভ্রমণকারীদের দেখাশুনো করাই তো কাশ্মীরের লোকদের প্রধান পেশা! আর, ভারতীয় ভ্রমণকারীদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যাই বেশী—বাঙালীরা খুব বেড়াতে ভালোবাসে—তাই বাঙালীদের কথা শুনে শুনে এরা অনেকেই বাংলা শিখে নিয়েছে। যেমন, সাহেব মেম অনেক আসে বলে এরা ইংরেজিও জানে বেশ ভালোই। এখানেই একটা ঘোড়ার সহিসকে দেখেছি, বাইশ-তেইশ বছর বয়েস, সে কোনোদিন ইস্কুলে পড়েনি, নিজের নাম সই করতেও জানে না—অথচ ইংরেজি, বাংলা, উরদু বলে জলের মতন।

সুচা সিং ভাঙা ভাঙা উরদু আর বাংলা কথা মিলিয়ে বলেন। কিন্তু উরদু তো আমি জানি না, তন্দুরস্তি, তাকাল্লুফ এই জাতীয় দু' চারটে কথার বেশী শিখতে পারিনি—তাই ওর কথাগুলো আমি বাংলাতেই লিখবো।

কাকাবাবু সুচা সিংকে পছন্দ করেন না। লোকটির বড্ড গায়ে পড়া ভাব আছে। কাকাবাবু একটু নির্লিপ্তভাবে বললেন, কোনদিকে যাবো ঠিক নেই। দেখি কোথায় যাওয়া যায়!

সুচা সিং চেয়ার টেনে নিয়ে বসে পড়ে বললেন, চলুন, কোনদিকে যাবেন বলুন, আমি আপনাকে পৌঁছে দিচ্ছি!

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, তার দরকার নেই। আমরা একটু কাছাকাছি ঘুরে আসবো।

আমার তো গাড়ি যাবেই, নামিয়ে দেব আপনাদের।

না, আমরা বাসে যাবো।

সোনমার্গের দিকে যাবেন তো বলুন। আমার একটা ভ্যান যাচ্ছে। ওটাতে যাবেন, আবার ফেরার সময় ওটাতেই ফিরে আসবেন।

প্রস্তাবটা এমন কিছু খারাপ নয়। সুচা সিং বেশ আন্তরিক ভাবেই বলছেন, কিন্তু পাত্তা দিলেন না কাকাবাবু। হাতের ভঙ্গি করে সুচা সিং-এর কথাটা উড়িয়ে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, না, কোনো দরকার নেই।

কাকাবাবু এবার পকেট থেকে চুরুট বার করলেন। আমি এর মানে জানি। আমি লক্ষ্য করেছি, সুচা সিং সিগারেট কিংবা চুরুটের ধোঁয়া একেবারে সহ্য করতে পারেন না। কাকাবাবু ওঁকে সরাবার জন্যই চুরুট ধরালেন। সুচা সিং কিন্তু তবু উঠলেন না—নাকটা একটু কুঁচকে সামনে বসেই রইলেন। তারপর হঠাৎ ফিসফিস করে জিগ্যেস করলেন, প্রোফেসার সাব, কিছু হদিস পেলেন?

কাকাবাবু বললেন, কী পাবো?

যা খুঁজছেন এতদিন ধরে?

কাকাবাবু অপলকভাবে একটুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, না, কিছুই পাইনি। বোধহয় কিছু পাওয়া যাবেও না!

তাহলে আর খোঁড়া পা নিয়ে এত তকলিফ করছেন কেন?

তবু খুঁজছি, কারণ খোঁজাটাই আমার নেশা।

আপনারা বাঙালীরা বড় অদ্ভুত। আপনি যা খুঁজছেন, সেটা খুঁজে পেলে তো গভর্নমেন্টেরই লাভ হবে। আপনার তো কিছু হবে না। তাহলে আপনি গভর্নমেণ্টের সাহায্য নিচ্ছেন না কেন? গভর্নমেন্টকে বলুন, লোক দেবে, গাড়ি দেবে, সব ব্যবস্থা করবে—আপনি শুধু গাইডেন্স দেবেন।

কাকাবাবু হেসে এক মুখ ধোঁয়া ছাড়লেন সুচা সিং-এর দিকে। তারপর বললেন, এটা আমার খেয়াল ছাড়া আর কিছু তো নয়! গভর্নমেন্ট সব ব্যবস্থা করবে, তারপর যদি কিছুই না পাওয়া যায়, তখন সেটা একটা লজ্জার ব্যাপার হবে না?

লজ্জা কী আছে, গভর্নমেণ্টের তো কত টাকারই শ্রাদ্ধ হচ্ছে। কম্পানিকা মাল, দরিয়ামে ডাল্!

কাকাবাবু আবার হেসে বললেন, আপনি ঠিকই বলেছেন সিংজী! বাঙালীরা অদ্ভুত জাত। তারা এসব পারে না।

একটা কথা আগে বলা হয়নি, কাকাবাবু কাশ্মীরে এসেছেন গন্ধকের খনি খুঁজতে। কাকাবাবুর ধারণা, কাশ্মীরের পাহাড়ের নিচে কোথাও প্রচুর গন্ধক জমা আছে। কাশ্মীর সরকারকে জানিয়েছেন সে কথা। সরকারকে না জানিয়ে তো কেউ আর পাহাড় পর্বত মাপামাপি করতে পারে না—বিশেষত কাশ্মীরের মতন সীমান্ত এলাকায়। আমি আর কাকাবাবু তাই গন্ধকের খনি আবিষ্কার করার কাজ করছি।

সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, ওসব গন্ধক টন্ধক ছাড়ুন। আমি আপনাকে বলে দিচ্ছি, এখানে পাহাড়ের নিচে সোনার খনি আছে। সেটা যদি খুঁজে বার করতে পারেন—

কাকাবাবু খানিকটা নকল আগ্রহ দেখিয়ে বললেন আপনি জানেন, এখানে সোনা পাওয়া যাবে?

ডেফিনিটলি। আমি খুব ভালো ভাবে জানি।

আপনি যখন জানেনই যে এখানে সোনা আছে, তাহলে সেটাই আবিষ্কার করে ফেলুন না!

আমার যে আপনাদের মতন বিদ্যে নেই। ওসব খুঁজে বার করা আপনাদের কাজ। আমি তো শুনেছি, টাটা কম্পানির যে এত বড় ইস্পাতের কারখানা, সেই ইস্পাতের খনি তো একজন বাঙালীই আবিষ্কার করেছিল!

কিন্তু সিংজী, সোনার খনি খুঁজে পেলেও আপনার কী লাভ হবে? সোনার খনির মালিকানা গভর্নমেন্টের হয়। গভর্নমেন্ট নিয়ে নেবে।

নিক না গভর্নমেন্ট! তার আগে আমরাও যদি কিছু নিতে পারি! আমি আপনাকে সাহায্য করবো। এখানে মুস্তাফা বশীর খান বলে একজন বুড়ো আছে, খুব ইমানদার লোক। সে আমাকে বলেছে, মার্তণ্ডের কাছে তার ঠাকুর্দা পাহাড় খুঁড়ে সোনা পেয়েছিল।

আপনিও সেখানে পাহাড় খুঁড়তে লেগে যান।

আরে শুনুন, শুনুন, প্রোফেসারসাব—

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে বললেন, ওঠ্ সন্তু। আমাদের বাসের সময় হয়ে এসেছে! তোর খাওয়া হয়েছে?

আমি বললাম, হ্যাঁ। একটু জল খাবো।

খেয়ে নে। ফ্লাস্কে জল ভরে নিয়েছিস তো?

তারপর কাকাবাবু সুচা সিং-এর দিকে তাকিয়ে বললেন, তোমার কি ধারণা, মাটির তলায় আস্ত আস্ত সোনার চাঁই পাওয়া যায়? পাথরের মধ্যে সোনা পাওয়া গেলেও তা গালিয়ে বার করা একটা বিরাট ব্যাপার। তাছাড়া সাধারণ লোক ভাবে সোনাই সবচেয়ে দামী জিনিস। কিন্তু তুমি ব্যবসা করো—তোমার তো বোঝা উচিত, অনেক জিনিসের দাম সোনার চেয়েও বেশী—যেমন ধরো কেউ যদি একটা পেটরলের খনির সন্ধান পেয়ে যায়—সেটার দাম সোনার খনির চেয়েও কম হবে না। তেমনি, গন্ধক শুনে হেলাফেলা করছো, কিন্তু সত্যি সত্যি যদি প্রচুর পরিমাণে সালফার ডিপোজিটের খোঁজ পাওয়া যায়—

সে তো হলো গিয়ে যদি-র কথা। যদি গন্ধক থাকে। কিন্তু আমি আপনাকে বলছি, কাশ্মীরে সোনা আছেই!

তাহলে তুমি খুঁজতে লেগে যাও! আয় সন্তু—সুচা সিং হঠাৎ খপ করে আমার হাত ধরে বললেন, কী খোকাবাবু, কোনদিকে যাবে আজ?

সুচা সিং-এর বিরাট হাতখানা যেন বাঘের থাবা, তার মধ্যে আমার ছোট্ট হাতটা কোথায় মিলিয়ে গেছে। আমি উত্তর না দিয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালাম। কাকাবাবু বললেন, আজ আমরা দূরে কোথাও যাবো না, কাছাকাছিই ঘুরবো।

সুচা সিং আমাকে আদর করার ভঙ্গি করে বললেন, খোকাবাবুকে নিয়ে একদিন আমি বেড়িয়ে আনবো। কী খোকাবাবু, কাশ্মীরের কোন কোন জায়গা দেখা হলো?

সুচা সিং-এর হাত ছাড়িয়ে আমরা দোকান থেকে বেরিয়ে এলাম। সুচা সিং-ও এলেন পেছনে পেছনে। আমরা তখন বাস স্ট্যাণ্ডের দিকে না গিয়ে হাঁটতে লাগলাম অন্যদিকে।

কাকাবাবু সুচা সিংকে মিথ্যে কথা বলেছেন। আমরা যে আজ সোনমার্গে যাবো, তা তো সকাল থেকেই ঠিক আছে। কাকাবাবু সুচা সিংকে বললেন না সে কথা। গুরুজনরা যে কখনো মিথ্যে কথা বলেন না, তা মোটেই ঠিক নয়, মাঝে মাঝে বলেন। যেমন, আর একটা কথা, কাকাবাবু অনেককে বলেছেন বটে যে তিনি এখানে গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে এসেছেন—কিন্তু আমার সেটা বিশ্বাস হয় না। কাকাবাবু অন্য কিছু খুঁজছেন। কিন্তু সেটা যে কী তা অবশ্য আমি জানি না। সুচা সিংও

কাকাবাবুকে ঠিক বিশ্বাস করেননি। সুচা সিং-এর সরকারি মহলের অনেকের সঙ্গে জানাশোনা, সেখান থেকে কিছু শুনেই বোধহয় সুচা সিং সুযোগ পেলেই কাকা-বাবুর সঙ্গে ভাব জমাবার চেষ্টা করেন। সুচা সিং-এর কি ধারণা কাকাবাবু গন্ধকের নাম করে আসলে সোনার খনিরই খোঁজ করছেন? আমরা কি সত্যিই সোনার সন্ধানে ঘুরছি?

সুচা সিং-এর দৃষ্টি এড়িয়ে আমরা চলে এসেছি খানিকটা দূরে। রোদ উঠেছে বেশ, পথে এখন অনেক বেশী মানুষ। আজ শীতটা একটু বেশী পড়েছে। আজ সুন্দর বেড়াবার দিন।

হঠাৎ আমি চেঁচিয়ে উঠলাম, আরেঃ, স্নিগ্ধাদি যাচ্ছে না? হ্যাঁ, হ্যাঁ, ওই তো, স্নিগ্ধাদি, সিদ্ধার্থদা, রিণি—

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, কে ওরা?

উত্তর না দিয়ে আমি চিৎকার করে ডাকলাম, এই স্নিগ্ধাদি!

এক ডাকেই শুনতে পেল। ওরাও আমাকে দেখে অবাক। এগিয়ে আসতে লাগলো আমাদের দিকে। আমি কাকাবাবুকে বললাম—কাকাবাবু, তুমি ছোড়দির বন্ধু স্নিগ্ধাদিকে দেখোনি?

উৎসাহে আমার মুখ জ্বলজ্বল করছে। এত দূরে হঠাৎ কোনো চেনা মানুষকে দেখলে কী আনন্দই যে লাগে। কাকাবাবু কিন্তু খুব একটা উৎসাহিত হলেন না। আড়চোখে ঘড়িতে সময় দেখলেন।

স্নিগ্ধাদি আমার ছোড়দির ছেলেবেলা থেকে বন্ধু। কতদিন এসেছে আমাদের বাড়িতে। ছোড়দি-র বিয়ে হবার ঠিক এক মাসের মধ্যে বিয়ে হয়ে গেল স্নিগ্ধাদির। সিদ্ধার্থদাকেও আমরা আগে থেকে চিনি, ছোড়দিদের কলেজের প্রফেসার ছিলেন, আমাদের পাড়ার ফাংশনে রবীন্দ্রনাথের 'আফ্রিকা' কবিতাটা আবৃত্তি করেছিলেন। আর, রিণি হচ্ছে স্নিগ্ধাদির বোন, আমারই সমান, ক্লাস এইট-এ পড়ে। পড়াশুনোয় এমনিতে ভালোই, কিন্তু অঙ্কে খুব কাঁচা। কঠিন অ্যালজেব্রা তো পারেই না, জিওমেট্রি এত সোজা—তাও পারে না। তবে, রিণি বেশ ভালো ছবি আঁকে।

স্নিগ্ধাদি কাছে এসে এক মুখ হেসে বললেন, কীরে সন্তু, তোরা কবে এলি? আর কে এসেছে? মাসীমা আসেননি? বনানীও আসেনি?

কাকাবাবুর কথা শুনে ওরা তিনজনেই পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করলো কাকাবাবুকে। চাকরি থেকে রিটায়ার করার আগে কাকাবাবু তো দিল্লিতেই থাকতেন বেশীর ভাগ—তাই স্নিগ্ধাদি দেখেননি আগে।

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে বললেন, আমি আপনার নাম অনেক শুনেছি। আপনি তো আরকিওলজিক্যাল সারভে-তে ডেপুটি ডাইরেকটর ছিলেন? আমার এক মামার সঙ্গে আপনার—

কাকাবাবুর কথাবার্তা বলার যেন কোনো উৎসাহই নেই। শুকনো গলায় জিগ্যেস করলেন, তুমি কী করো?

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমি কলকাতার একটা কলেজে ইতিহাস পড়াই।

কাকাবাবু বললেন, ও, বেশ ভালো। আচ্ছা, তোমাদের সঙ্গে দেখা হয়ে ভালোই লাগলো। এবার আমাদের যেতে হবে। চল্ সন্তু—

সিদ্ধার্থদা বললেন, আপনারা কোনদিকে যাবেন? চলুন না, এক সঙ্গেই যাওয়া যাক।

আমি অধীর আগ্রহে কাকাবাবুর মুখের দিকে তাকালাম। কাকাবাবু যদি রাজী হয়ে যান, তাহলে কী ভালোই যে হয়! রোজই তো পাথর মাপামাপি করি, আজ একটা দিন যদি সবাই মিলে বেড়ানো যায়! তা ছাড়া, হঠাৎ স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল।

কাকাবাবু একটু ভুরু কুঁচকে দাঁড়িয়ে রইলেন। তারপর বললেন, নাঃ, তোমরাই ঘুরে টুরে দ্যাখো। পহলগাম বেশ ভালো জায়গা। আমরা অন্য জায়গায় যাবো, আমাদের কাজ আছে।

তা হলে সন্তু থাক আমাদের সঙ্গে!

স্নিগ্ধাদি বললেন, সন্তু, তুই তো এখানে কয়েকদিন ধরে আছিস। তুই তা হলে আমাদের গাইড হয়ে ঘুরে টুরে দ্যাখা। আমরা তো উঠেছি শ্রীনগরে, এখানে একদিন থাকবো—

রিণি বললো, এই সন্তু, তুই একটু রোগা হয়ে গেছিস

কেন রে? অসুখ করেছিল?

আমি বললাম, না তো!

তা হলে তোর মুখটা শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে কেন?

ভ্যাট! মোটেই না!

নদীটার দিকে আঙুল দেখিয়ে রিণি জিগ্যেস করলো, এই নদীটার নাম কি রে?

এটার নাম হচ্ছে লীদার নদী। আগেকার দিনে এর সংস্কৃত নাম ছিল লম্বোদরী। অমরনাথের রাস্তায় এই নদীটাকেই বলে নীল গঙ্গা।

স্নিগ্ধাদি হাসতে হাসতে বললেন, সন্তুটা কী রকম বিজ্ঞের মতন কথা বলছে! ঠিক পাকা গাইডদের মতন...

কাকাবাবু আবার ঘড়ি দেখলেন। আমার দিকে তাকিয়ে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, তুমি কি তাহলে এদের সঙ্গে থাকবে? তাই থাকো না হয়—

হঠাৎ আমার বুকের মধ্যে একটা কান্নাকান্না ভাব এসে গেল। কাকাবাবু নিশ্চয়ই আমার ওপরে অভিমান করেছেন। তাই আমাকে থাকতে বললেন। আমি তো জানি, খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা একলা কোনো কাজই করতে পারবেন না। সাহায্যও নেবেন না অন্য কারুর।

আমি বললাম, না, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো।

কাকাবাবুর মুখখানা পরিষ্কার হয়ে গেল। বললেন, চলো তাহলে। আর দেরী করা যায় না।

আমি সিদ্ধার্থদাকে বললাম, আপনারা এখানে কয়েক-দিন থাকুন না। আমরা তো আজ সন্ধেবেলাতেই ফিরে আসছি–

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমরা কাল সকালবেলা অমরনাথের দিকে যাবো—

সেই অমরনাথ মন্দির পর্যন্ত যাবেন? সে তো অনেকদিন লাগবে।

স্নিগ্ধাদি বললেন, ঐ রাস্তায় যাবো, যতটা যাওয়া যায়—খুব বেশী কষ্ট হলে যাবো না বেশীদূর। ফিরে এসে তোদের সঙ্গে দেখা হবে। তোরা কি এখানেই থাকছিস?

সিদ্ধার্থদা কাকাবাবুকে জিগ্যেস করলেন, আপনারা এখানে কতদিন থাকবেন?

কাকাবাবু বললেন, ঠিক নেই।

বাস এসে গেছে। আমি আর কাকাবাবু বাসে উঠে পড়লাম। চলন্ত বাসের জানলা দিয়ে দেখলাম, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি আর রিণি হেঁটে যাচ্ছে লীদার নদীর দিকে। রিণি তরতরিয়ে এগিয়ে গিয়ে নদীটার জলে পা ডোবালো।

আকাশ পুরোনো হয় না

সোনমার্গেও আজ বেশ ভিড়। প্রচুর লোক বেড়াতে এসেছে। বরফের ওপরে স্কেটিং করছে, লাফাচ্ছে, গড়া-গড়ি দিচ্ছে অনেকে। বরফের ওপর লাফালাফি করার কী মজা, পড়ে গেলেও একটুও ব্যথা লাগে না, জামা কাপড় ভেজে না। এমনকি শীতও কম লাগে। এখানকার হাওয়াতেই বেশী শীত। একটা মেয়ে-স্কুল থেকে দল বেঁধে বেড়াতে এসেছে, এক রকম পোষাক পরা গোটা চল্লিশেক মেয়ে, কী হুড়োহুড়িই করছে সেখানে। আর দু'জন সাহেব মেম মুভি ক্যামেরায় ছবি তুলছে অনবরত।

আমরা অবশ্য ওদিকে যাবো না। আমাদের খেলা-ধুলো করার সময় নেই। কাকাবাবু কাশ্মীরের ম্যাপ খুলে অনেকক্ষণ ধরে মনোযোগ দিয়ে দেখলেন। তারপর দুটো ঘোড়া ভাড়া করে আমাকে বললেন, চলো।

কাশ্মীরে এসে একটা লাভ হয়েছে, আমি বেশ ভালো ঘোড়ায় চড়তে পারি এখন। প্রথম দু' একদিন অবশ্য ভয় ভয় করতো, গায়ে কী ব্যথা হয়েছিল! এখন সব সেরে গেছে, এখন ঘোড়া গ্যালপ করলেও আমার অসুবিধে হয় না। প্রত্যেক ঘোড়ার সঙ্গেই একটা করে পাহারাদার ছেলে থাকে, আমি আমার সঙ্গের ছেলেটাকে ছাড়িয়ে অনেকদূর চলে যাই।

প্রায় এক ঘণ্টা ঘোড়া চালিয়ে আমরা একটা ছোট পাহাড়ের মাথায় এসে পৌঁছুলাম। এখানে কিছু নেই, সব দিক ফাঁকা, এদিকে ওদিকে থোকা থোকা বরফ ছড়ানো, মানুষজনের চিহ্নমাত্র নেই। তিনদিক ঘিরে আছে বিশাল বিশাল পাহাড়—মেঘ ফুঁড়ে আরও উঁচুতে উঠে গেছে তাদের চূড়া। এক দিকে ঢালু হয়ে বিশাল খাদ, অনেক নিচে দেখা যায় কিছু গাছপালা আর একটা গ্রামের মতন।

এই পাহাড়টাতেও আমরা আগে একবার এসেছি, দিন আষ্টেক আগে। পাহাড়টা বেশী উঁচু নয়, অনেকটা ঢিপির মতন—আরও দুটো পাহাড় পেরিয়ে এটায় আসতে হয়। দু' চারটে বেঁটে বেঁটে পাইন গাছ আছে এ পাহাড়ে—পাইন গাছগুলোর ওপর বরফ পড়ে আছে, ঠিক যেন বরফের ফুল ফুটেছে। এখানে আবার নতুন করে মাপামাপি করার কী আছে কে জানে। সব দিকেই তো শুধু বরফ ছড়ানো। বরফ না খুঁড়লে কী করে বোঝা যাবে নিচে কী আছে? আর এই বরফের নিচে কি গন্ধক পাওয়া সম্ভব? কিংবা সোনা?

কাকাবাবু ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোকে ছুটি দিয়ে দিলেন। বললেন বিকেলবেলা আসতে। ঘোড়া দুটো বাঁধা রইলো। আমাদের সঙ্গে স্যান্ডউইচ আর ফ্লাসকে কফি আছে—আমাদের আর খাবার-দাবারের জন্য নিচে নামতে হবে না।

ক্রাচ দুটো নামিয়ে রেখে কাকাবাবু তার ওপর বসলেন। তারপর ওভারকোটের পকেট থেকে একটা হলদেটে, পোকায়-খাওয়া পুরোনো বই বার করে দেখতে শুরু করলেন। আমাকে বললেন, সন্তু, তুমি ততক্ষণ চার পাশটা একটু দেখে নাও—একটু পরে কাজ শুরু করা

যাবে।

আমার মন খারাপ ভাবটা তখনো যায় নি। একটু ক্ষুণ্ণ ভাবে বললাম, কাকাবাবু এই জায়গাটা তো আগে দেখেছি। আজ আর নতুন করে কী দেখবো?

কাকাবাবু বই থেকে মুখ তুলে অবাক হয়ে আমার দিকে তাকালেন। তারপর খুব নরম গলায় বললেন, তোমার বুঝি খুব ইচ্ছে করছিল ঐ সিদ্ধার্থদের সঙ্গে বেড়াতে? তাতো হবেই, ছেলেমানুষ—

আমি থতমত খেয়ে বললাম, না, না, আমি কাজ করতেই চাই। এখন কাজ শুরু হবে না!

কাজ শুরু করার আগে সেই জায়গাটা খুব ভালো করে দেখে নিতে হয়। আর শোনো, দেখার জিনিসের কোনো শেষ নেই। যেমন ধরো আকাশ। আকাশ কি কখনো পুরোনো হয়? কোনো মানুষ সারাজীবনে এক রকমের আকাশ দু বার দেখে না। প্রত্যেকদিন আকাশের চেহারা অন্যরকম। এই পাহাড়ও তাই। কখন রোদ্দুর। কখন ছায়া—অমনি পাহাড়গুলোর চেহারা বদলে যায় না? একটুক্ষণ তাকিয়ে থাকো—তাহলেই বুঝতে পারবে।

আমি আকাশের দিকে তাকালাম। আকাশটা আজ সত্যিই খুব সুন্দর। হালকা তুলোর মতন মেঘ বেশ জোরে উড়ে যাচ্ছে। সেই মেঘগুলোর চেয়ে আরও উঁচুতে আবার ঘন কালো রঙের মেঘ—অথচ রোদ্দুরও রয়েছে। রিণিদের সঙ্গে যদি দেখা না হতো, যদি বেড়াবার ইচ্ছেটা নতুন করে না জাগতো—তাহলে এই আকাশের দিকে তাকালে ভালোই লাগতো।

কাকাবাবু বইটা পড়তে লাগলেন, আমি পাহাড়ের উল্টোদিকে একটুখানি নেমে গেলাম। এখানে একটা ছোট্ট গুহা আছে। গুহার মুখটা বেশ বড়, কিন্তু বেশী গভীর নয়। আগে বইতে পাহাড়ের গুহার কথা পড়লেই মনে হতো, সেটা হবে অন্ধকার-অন্ধকার, বাদুড়ের গন্ধ আর হিংস্র পশুর বাসা। সেদিক থেকে এই গুহাটা দেখলে নিরাশই হতে হয়। কাশ্মীরে হিংস্র জীবজন্তু বিশেষ নেই। গুহাটা বেশ ঝকঝকে তকতকে। এক জায়গায় একটা ভাঙা উনুন আর আগুনের পোড়া দাগ। মনে হয় এইখানে এক সময় কেউ এসে ছিল। এতদূরে কেউ তো আর পিকনিক করতে আসবে না। বোধহয় কোনো সন্ন্যাসী এখানে এসে আস্তানা গেড়েছিল কোনো সময়।

গুহাটার মধ্যে একটু বসেছি অমনি বাইরে ঝুরঝুর করে বরফ পড়তে লাগলো। আমিও ছুটে বাইরে এলাম। বরফ পড়ার সময় ভারী মজা লাগে। ছেঁড়া ছেঁড়া তুলোর মতন হালকা বরফ, গায়ে পড়লেও জামাকাপড় ভেজে না—হাতে জমিয়ে-জমিয়ে শক্ত বলের মতনও বানানো যায়।

কাকাবাবুও নেমে এসেছেন। বললেন, এসো এবার কাজ শুরু করা যাক। খানিকটা কাজ করে তারপর আমরা খেয়ে নেবো। তোমার খিদে পায় নি তো?

না, এক্ষুনি কি খিদে পাবে!

বেশ। ফিতেগুলো বার করো।

ব্যাগ দুটো আমি গুহার মধ্যে রেখেছিলাম। সেগুলো নিতে এলাম, কাকাবাবুও আমার সঙ্গে সঙ্গে এলেন। গুহার চার পাশটা খুব মনোযোগ দিয়ে দেখে বললেন, এই গুহাটা আমার বেশ পছন্দ। এইটার জন্যই এখানে আসি।

আমি হঠাৎ বলে ফেললাম, কাকাবাবু, আমরা এই গুহাটায় থাকতে পারি না? তাহলে বেশ মজা হবে!

কাকাবাবু বললেন, এখানে কি থাকা যায়? শীতে মরে যাবো। সামনেটা তো খোলা—যখন বরফের ঝড় উঠবে—

কিন্তু সন্ন্যাসীরা তো এই রকম গুহাতেই থাকে!

সন্ন্যাসীরা যা পারে, তা কি আমরা পারি? সন্ন্যাসীরা অনেক কষ্ট সহ্য করতে পারে।

কাকাবাবু ক্রাচ দিয়ে গুহার দেওয়াল ঠুকে ঠুকে দেখতে লাগলেন। চিন্তিতভাবে বললেন, এই গুহার কোনো জায়গা কি ফাঁপা হতে পারে? মনে তো হচ্ছে না।

আমি কিছু বললাম না। পাথর আবার কখনো ফাঁপা হয় নাকি?

আর সময় নষ্ট না করে আমরা মাপার কাজ শুরু করলাম। এই মাপার কাজটা ঠিক যে পরপর হয়, তা নয়। কাকাবাবু ফিতের একটা দিক ধরে থাকেন, আর একটা দিক ধরে আমি নেমে যাই, যতক্ষণ না ফিতেটা শেষ হয়। সেখানে আমি পা দিয়ে একটা দাগ কাটি। কাকাবাবু সেখানেই দাঁড়িয়ে থেকে বলেন, এবার ডান দিকে যাও! ডানদিকটা হয়ে গেলে কাকাবাবু হয়তো বলেন, এবার বাঁ দিকে যাও। অর্থাৎ, কাকাবাবু এক জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকেন, আমি চারদিকে ঘুরতে থাকি। তারপর কাকাবাবু আবার খানিকটা এগিয়ে যান, আমি আবার মাপতে শুরু করি!

সত্যি কথা বলতে কি, এরকমভাবে মাপায় যে কোনো রকম কাজ হতে পারে তা আমার বিশ্বাস হয় না। অবশ্য আমি কতটুকুই বা বুঝি! আমি ক্লান্ত হয়ে যাই, কাকাবাবু কিন্তু ক্লান্ত হন না। দিনের পর দিন এইভাবে চালিয়ে যাচ্ছেন।

ঘণ্টা দু এক বাদে আমরা একটু বিশ্রাম নেবার জন্য থামলাম। পাহাড়টার চূড়া থেকে আমরা অনেকটা নিচে চলে এসেছি। পাহাড়ের নিচের গ্রামটা এখন অনেকটা স্পষ্ট দেখা যায়। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি, রুপোর তারের মতন একটা নদী।

কাকাবাবু বললেন, ডান দিকে দ্যাখো। একটা উপত্যকা দেখতে পাচ্ছো?

ডান দিকে আর একটা খাড়া পাহাড়, তার নিচে ছোট্ট উপত্যকা। সেখানে কয়েকটা কী যেন জন্তু নড়াচড়া করছে। এত দূরে যে ভালো করে দেখা যায় না।

কাকাবাবু বললেন, ওগুলো কী জন্তু বুঝতে

পারছো?

না, ঠিক বুঝতে পারছি না। মনে হচ্ছে কুকুর। নাকি হরিণ ওগুলো? কাকাবাবুর কাছে সব সময় ছোট একটা দূরবীন থাকে। সেটা আমার হাতে দিয়ে বললেন, ভালো করে দ্যাখো।

দূরবীন চোখে দিয়েই দেখতে পেলাম, কুকুর কিংবা হরিণ না, কতকগুলো ঘোড়া সেই উপত্যকায় ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশে পাশে একটাও মানুষজন নেই।

আমি উত্তেজিত হয়ে বললাম, কাকাবাবু, ওগুলো কি বুনো ঘোড়া? ওদের এখনো কেউ ধরেনি?

কাকাবাবু বললেন, না। ঠিক তার উল্টো।

আমি অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে তাকালুম। ঘোড়ার উল্টো মানে কি? মেয়ে-ঘোড়া? মেয়ে ঘোড়াকে কি ঘুড়ী বলে? ঠিক জানি না। ইংরেজিতে বলে মেয়ার?

—কাকাবাবু, ওগুলো কি তবে মেয়ার?

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, না, তা বলিনি। ওগুলো বুনো ঘোড়া নয়, ওগুলো বুড়ো ঘোড়া। চলতি বাংলায় যাকে বলে বেতো ঘোড়া।

ওগুলো সব বুড়ো ঘোড়া? এক সঙ্গে এত বুড়ো ঘোড়া কোথা থেকে এলো? তুমি কী করে জানলে?

আমি আগেও দেখেছি। এই ব্যাপারটা শুধু কাশ্মীরেই দেখা যায়। এইগুলো হচ্ছে ঘোড়াদের কবরখানা। এই সব পাহাড়ী জায়গাতে তো বুড়ো ঘোড়া কোনো কাজে লাগে না, তাই ঘোড়াগুলো খুব বুড়ো হয়ে গেলে এই রকম উপত্যকায় ছেড়ে দেয়। ওখান থেকে উঠে আসতে পারবে না। ওখানেই আস্তে আস্তে মরে যায় একদিন!

ইস, কী নিষ্ঠুর! কেন, বাড়িতে রেখে দিতে পারে না?

নিষ্ঠুর নয়। বাড়িতে রেখে দিলে তো খেতে দিতেও হয়। এরা গরিব মানুষ, কাজ না করিয়ে কি শুধু শুধু বসিয়ে কারুকে খাওয়াতে পারে? তাই চোখের আড়ালে যাতে মরে তাই ছেড়ে দিয়ে আসে। এদেশে তো কেউ ঘোড়ার মাংস খায় না—তাহলে বাজারে বিক্রী হতে পারতো। ফ্রান্সে ঘোড়ার মাংস খায়—

ঘোড়াগুলো ওখানে থেকে মরার জন্য প্রতীক্ষা করছে —একথা ভেবেই আমার খুব কষ্ট হতে লাগলো। যতদিন ওরা মনিবের হয়ে খেটেছে ততদিন ওদের আদর যত্ন ছিল। মানুষ বড় স্বার্থপর!

আমি দূরবীনটা নিয়ে ভালো করে দেখতে লাগলাম। এবার দেখতে পেলাম, ঐ উপত্যকার এখানে-সেখানে অনেক হাড় ছড়িয়ে আছে। আগে যারা মরেছে। যে-ঘোড়াগুলো ঘুরে বেড়াচ্ছে, সেগুলোও খুব রোগা রোগা। খাবার কিছুই নেই বোধহয়। ঘোড়ারা কি আসন্ন মৃত্যুর কথা বুঝতে পারে?

কাকাবাবু বললেন, নাও, আবার কাজ শুরু করা যাক্।

আমি ফিতের বাক্স নিয়ে আবার উঠে দাঁড়ালাম।

এর পরেই একটা সাংঘাতিক ব্যাপার হয়ে গেল। কাকাবাবু তাড়াতাড়ি ওপরে ওঠার চেষ্টা করতেই বরফে ক্রাচ পিছলে গেল। কাকাবাবু মাটিতে আছাড় খেয়ে পড়ে গেলেন।

কাকাবাবুকে ধরার জন্য আমি হাতের জিনিস ফেলে ছুটতে যাচ্ছিলাম; কাকাবাবু সেই অবস্থায় থেকেই আমাকে চেঁচিয়ে বললেন, এই সন্তু, দৌড়োবি না! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে নেই। আমি নিজেই উঠছি!

আমি থমকে দাঁড়ালাম। কাকাবাবু উঠে দাঁড়ালেন আস্তে আস্তে। ক্রাচটা নিচু হয়ে কুড়িয়ে নিতে যেতেই আবার পড়ে গেলেন। এবার পড়েই গড়াতে লাগলেন নিচের দিকে।

প্রচণ্ড ভয় পেয়ে আমি চিৎকার করে উঠলাম। এবার আমি দৌড়োতেও সাহস পেলাম না। নিচের দিকে তাকিয়ে আমার মাথা ঘুরতে লাগলো। কাকাবাবু গড়িয়ে গড়িয়ে নিচে নেমে যাচ্ছেন—সেই ঘোড়াদের কবরখানার দিকে। কাকাবাবু দু হাত দিয়ে প্রাণপণে কিছু একটা চেপে ধরার চেষ্টা করছেন। কিন্তু ধরার কিছু নেই, একটা গাছ বা লতাপাতাও নেই। আমার বুকের মধ্যে ধক্‌ধক্ করতে লাগলো। কী হবে? এখন কী হবে? আমি একবার পাঁচ ছ'টা সিঁড়ি গড়িয়ে পড়েছিলাম মামার বাড়িতে...। কিন্তু এতো হাজার হাজার সিঁড়ির চেয়েও নিচু...

খানিকটা দূর গিয়ে কাকাবাবু থেমে গেলেন। সেখানেও গাছপালা কিছু নেই, কী ধরে কাকাবাবু থামলেন জানি না। থেমে গিয়ে কাকাবাবু নিস্পন্দ হয়ে পড়ে রইলেন। এবার আর কিছু না ভেবে আমি দৌড় লাগালাম কাকাবাবুর দিকে। দৌড়েই বুঝতে পারলাম, কী দারুণ ভুল করেছি! পাহাড়ের ঢালু দিকে দৌড়োতে গিয়ে আমি আর থামতে পারছি না। আমার গতি ক্রমশ বেড়ে যাচ্ছে!

কাকাবাবুর কাছাকাছি গিয়ে আমি হুমড়ি খেয়ে পড়ে গেলাম। ওঁর হাত ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু!

কাকাবাবু মুখ তুলে আমার দিকে তাকিয়ে শান্ত-গলায় বললেন, বললাম না, পাহাড়ের নিচের দিকে দৌড়োতে নেই! আর কক্ষনো এ রকম করবে না!

সেকথা অগ্রাহ্য করে আমি বললাম, কাকাবাবু, তোমার লাগেনি তো?

তোমার লেগেছে কি না বলো!

না, আমার কিছু হয়নি। তুমি...তুমি এতটা গড়িয়ে পড়লে...

ও কিছু না। ওতে কিছু হয় না।

আমি উঠে দাঁড়িয়ে কাকাবাবুকে টেনে তুলতে গেলাম। কাকাবাবু আমার হাত ছাড়িয়ে নিজেই উঠে দাঁড়ালেন। কাকাবাবুর একটা পা ভাঙা, কিন্তু মনের জোর অসাধারণ।

এমন ভাব করলেন, যেন কিছুই হয়নি।

হঠাৎ আমার কান্না পেয়ে গেল। কাকাবাবু যদি সত্যি সত্যি পড়ে যেতেন, আমি একলা এখানে কী করতাম?

আমি আবার বসে পড়ে বললাম, কাকাবাবু, আমার এই কাজ ভালো লাগে না!

কাকাবাবু বললেন, ভালো লাগে না? বাড়ির জন্য মন কেমন করছে?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ গোঁজ করে বসে রইলাম। কাকাবাবু বললেন, আচ্ছা ঠিক আছে, তোমাকে বাড়ি পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করছি। তুমি না হয় সিদ্ধার্থদের সঙ্গেই চলে যাও!

আর তুমি কী করবে? তুমি এখানে একলা একলা থাকবে?

হ্যাঁ। আমি থাকবো। আমি যে কাজটা আরম্ভ করেছি, সেটা শেষ না করে যাবো না।

সিদ্ধার্থদাদের সঙ্গে যাবার কথা শুনে আমার আনন্দ হয়েছিল। কিন্তু কাকাবাবুকে একলা ফেলে যেতেও ইচ্ছে করে না। কাকাবাবু একলা একলা পাহাড়ে ঘুরবেন—

আমি বললাম, কাকাবাবু, আমি তোমার সঙ্গেই যাবো। কিন্তু ফিতে মাপার কাজ আমার ভালো লাগে না। এই করে কী হবে?

ঠিক আছে, কাল থেকে অন্য একটা কমবয়েসী ছেলেকে ঠিক করবো—সে ফিতে ধরবে, আর তুমি আমার পাশে থাকবে।

কিন্তু কাকাবাবু, আমরা কী খুঁজছি? কী হবে এই-রকম ফিতে মেপে?

কাকাবাবু একটুক্ষণ অন্যমনস্ক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তুমি তো এখনও ছেলেমানুষ, এখন সব বুঝবে না। বড় হলে বুঝবে, আমরা যা খুঁজছি, যদি পাই, সেটা কত বড় আবিষ্কার!

তাহলে আরও লোকজন নিয়ে এসে ভালো করে খুঁজলে হয় না?

আমি বিশেষ কারুকে বলতে চাই না। কারণ যা খুঁজছি, তা যদি শেষ পর্যন্ত না পাই লোকে শুনে হাসা-হাসি করবে। পাবোই যে তারও কোনো মানে নেই। সুতরাং চুপচাপ খোঁজাই ভালো। যদি হঠাৎ পেয়ে যাই, তখন সবাই অবাক হবে। তখন তোমাকেও সবাই বলবে বাহাদুর ছেলে!

কাকাবাবু, আমরা আসলে কী খুঁজছি? সোনা?

কী বললে, সোনা? না, না, সোনা-টোনা কিছু নয়। পাহাড়ে ঘুরে ঘুরে কেউ সোনা পায় নাকি? যত সব বাজে কথা!

তাহলে?

আমরা খুঁজছি একটা চৌকো পাতকুয়ো। চৌবাচ্চাও বলতে পারো। কিন্তু সাধারণ চৌবাচ্চার থেকে অনেক গভীর।

ইতিহাসপ্রসিদ্ধ রাস্তায়

সেদিন সন্ধেবেলা পহলগামে আমাদের তাঁবুতে ফিরে এসে টের পেলাম, আমার বাঁ পায়ে বেশ ব্যথা হয়েছে। কখন একটু মচকে গেছে টের পাইনি। আয়োডেক্স মালিশ করলাম বেশ করে। কাকাবাবু যদিও বললেন, তাঁর কিছু হয়নি, তবুও আমি ওঁর দু পায়ে মলম মালিশ করে দিলাম।

বলতে ভুলে গেছি, এখানে সন্ধে হয় নটার সময়। সাড়ে আটটা পর্যন্ত বিকেলের আলো থাকে। প্রথম প্রথম ভারী অদ্ভুত লাগতো। আমাদের রাত্তিরের খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেলেও বাইরে তখন বিকেল। সূর্য অস্ত যাবার পরেও অনেকক্ষণ পর্যন্ত দিনের আলো। আমাদের দেশেই কত জায়গায় কত যে আশ্চর্য সব ব্যাপার আছে।

সিদ্ধার্থদারা বলেছিলেন, ওঁরা আজকের রাতটা প্লাজা হোটেলে থাকবেন। ভেবেছিলাম ফিরে এসে ওঁদের সঙ্গে দেখা করে আসবো। কিন্তু পায়ের ব্যথার জন্য যাওয়া হলো না। হোটেলটা বেশ খানিকটা দূরে। বিছানায় শুয়ে লীদার নদীর শব্দ শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়লাম।

ভোরবেলা উঠে কাকাবাবুকে কিছু না বলেই আমি বেরিয়ে পড়লাম একলা-একলা। লীদার নদী পহলগামে যেখানটায় ঢুকেছে, সেখানে একটা ছোট্ট কাঠের ব্রিজ। আমি ব্রিজটার ওপর দাঁড়িয়ে রইলাম। সিদ্ধার্থদারা অমরনাথে যাবেন, এই রাস্তা দিয়েই যেতে হবে।

একটু পরেই দেখা গেল ওঁদের। সঙ্গে আরও কয়েকজন লোক আছেন আর দুজন গাইড। সবাই ঘোড়ার পিঠে। স্নিগ্ধাদি আর রিণিকে তো চেনাই যায় না। ব্রীচেস, ওভারকোট, মাথায় টুপি, হাতে দস্তানা, চোখে কালো চশমা। সিদ্ধার্থদাকেও বেশ মানিয়েছে, তবে সিদ্ধার্থদার ঘোড়াটা ওঁর তুলনায় বেশ ছোট।

স্নিগ্ধাদি আমাকে দেখেই বললেন, ওমা, তুই এখানে দাঁড়িয়ে আছিস? আমরা ভাবলুম বুঝি তোর সঙ্গে আর দেখাই হলো না। কাল সারাদিন কোথায় ছিলি?

সোনমার্গে ছিলাম।

ওখানে কী করলি? ওখানে তো দেখার কিছু নেই।

আমি চট্ করে একটু আকাশের দিকে তাকালাম। সত্যিই, আকাশটা রোজই নতুন নতুন হয়ে যায়।

সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, তুমিও আমাদের সঙ্গে গেলে পারতে!

আমি গম্ভীরভাবে বললাম, আমাদের এখানে অনেক কাজ আছে।

ছুটিতে পাহাড়ে বেড়াতে এসে আবার কাজ কী? এখানেও স্কুলের হোম-টাস্ক করছো নাকি?

উত্তর দিলাম না। ওঁদের সঙ্গে সঙ্গে এগিয়ে গেলাম খানিকটা। রিণিকে বললাম, শোন্, মুখে অনেকটা করে ক্রিম মেখে নে। না হলে কিন্তু ভীষণ চামড়া ফাটে!

রিণি খিলখিল করে হেসে বললো, দিদি, দেখেছো, সন্তু কী রকম বড়দের মতন কথা বলতে শিখেছে!

আহা, আমি তোদের থেকে বেশীদিন আছি না!

তুই সত্যি আমাদের সঙ্গে গেলে পারতিস। তুই বেশ গাইড হতিস আমাদের!

আমার তো ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষুনি ওদের সঙ্গে চলে যাই। যে-পোশাক পরে আছি সেইভাবেই। কিন্তু তা হয় না। আমি একটু অবজ্ঞার সঙ্গে বললাম, অমরনাথে এমন কিছু দেখবার নেই। তাছাড়া আমি তো চন্দনবাড়ি আর কোহলাই পর্যন্ত গিয়েছি একবার!

স্নিগ্ধাদি বললেন, হ্যাঁরে, আমরা ফিরে আসা পর্যন্ত থাকবি তো? আমাদের তো যাওয়া-আসা নিয়ে বড় জোর সাতদিন! কিংবা রাস্তা খারাপ থাকলে তার আগেও ফিরে আসতে পারি!

আমি জোর দিয়ে বললাম, হ্যাঁ, থাকবো। থাকবো।

তারপর ওরা এগিয়ে গেল, আমি দাঁড়িয়ে থেকে ওদের দিকে হাত নাড়তে লাগলাম।

ক্যামপে ফিরেই আবার সব কিছু অন্যরকম হয়ে গেল। কাকাবাবু ততক্ষণে উঠে পড়েছেন। আমি বাইরে বেরিয়েছিলুম বলে কিছু জিগ্যেস করলেন না। একমনে ম্যাপ দেখছিলেন। এক সময় মুখ তুলে বললেন সন্তু, আমি ঠিক করলাম, পহলগামে আমাদের আর থাকা হবে না। এখান থেকে যাতায়াত করতে অনেক সময় যায়। সোনমার্গ থেকে কাল পাহাড়ের নিচে যে ছোট্ট গ্রামটা দেখলাম, ওখানে গিয়েই দিন দশেক থাকা যাক্!

আমি আকাশ থেকে পড়লাম। পহলগাম থেকেও চলে যেতে হবে? সিদ্ধার্থদা, রিণি, স্নিগ্ধাদিদের সঙ্গে আর দেখা হবে না?

ঐ গ্রামে থাকবো? ওখানে থাকার জায়গা আছে?

সে ঠিক ব্যবস্থা হয়ে যাবে। কালকে ঘোড়াওয়ালা ছেলে দুটোর সঙ্গে কথা বলেছি। ওরাও ঐ গ্রামে থাকে। এটাই বেশ ভালো হবে। চেনাশুনো কারুর সঙ্গে দেখা হবে না—নিরিবিলিতে কাজ করা যাবে।

চেনাশুনো লোকের সঙ্গে দেখা হলে সবাই খুশী হয়। কাকাবাবুর সব কিছুই অন্যরকম। ঐ ছোট্ট গ্রামে থাকতে আমার একটুও ইচ্ছে করছে না।

কাকাবাবু বললেন, জিনিসপত্তর সব গুছিয়ে নাও। বেশী দেরি করে আর লাভ কী?

বাস-স্টপের কাছে আজও সুচা সিং-এর সঙ্গে দেখা হলো। বিশাল একখানা হাত আমার কাঁধের ওপর রেখে বললেন, কী খোকাবাবু কাল সোনমার্গ কী রকম বেড়ানো হলো?

তারপর হা-হা করে হেসে কাকাবাবুর দিকে তাকিয়ে বললেন, কী প্রোফেসারসাব, কাল যে বললেন সোনমার্গ যাবেন না? আমি তো কাল দেখলাম, আপনারা সোনমার্গ থেকেই ফিরছেন বিকেলে!

কাকাবাবু নীরসভাবে বললেন, আমরা কবে কোথায় যাই কোনো ঠিক তো নেই!

তা এই গরিব মানুষের গাড়িতে যেতে আপনার এত আপত্তি কেন? আমি তো ঐদিকেই যাই!

তোমাকে শুধু শুধু কষ্ট দিতে চাই না।

এতে তকলিফ কী আছে? আপনি এত বড় পড়া-লিখা জানা আদমি, আপনার যদি একটু সেবা করতে পারি—আপনি আজ কোনদিকে যাবেন?

আজও সোনমার্গই যাবো!

সুচা সিং একটু অবাক হয়ে গেলেন। ভুরু কুঁচকে খানিকক্ষণ চিন্তা করে বললেন, আবার সোনমার্গ? ওখানে কিছু পেলেন? জায়গাটা তো একদম ন্যাড়া। কিছু নেই!

কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, সিংজী, তুমি মিথ্যেই ভাবনা করছো! আমি সোনা খুঁজছি না। সে সাধ্যও আমার নেই!

সুচা সিং গলার আওয়াজ নিচু করে বললেন, আপনি মার্টন-এর পুরোনো মন্দিরে গেছেন? সবাই যে সুরয দেবতার মন্দিরে যায় সেখানে নয়—পাহাড়ের ওপরে যে পুরোনো মন্দির? লোকে বলে ঐ মন্দির ললিতাদিত্যের আমলের চেয়েও পুরোনো। সিকন্দর বুত শিকন ঐ

মন্দির ভেঙে দেয়। কেন অত কষ্ট করে ঐ বিরাট মন্দির ভেঙে দিল জানেন? ঐ মন্দিরের কোনো জায়গায় মণ মণ সোনা পোঁতা আছে। সিকন্দর বুত শিকন তা খুঁজে পায়নি। সেই সোনা এখনও আছে।

কাকাবাবু বললেন, তাহলে সে কথা আমাকে বলে দিচ্ছো কেন? সোনার কথা কি সবাইকে বলতে আছে? নিজেই খুঁজে দেখো না!

আপনারা পণ্ডিত লোক, আপনারা জানেন রাজারা কোথায় কোন্ জায়গায় গুপ্ত সম্পদ লুকিয়ে রাখতেন। সাধারণ লোকরা কি ওসব জানতে পারে?

তাই যদি হতো সিংজী, তাহলে পণ্ডিতরা এত গরিব হয় কেন? পণ্ডিতরা সোনার খবর কিছুই বোঝে না!

আচ্ছা চলি!

সূচা সিং আজ আর কিছুতেই ছাড়লেন না। আজ জোর করে আমাদের তুললেন নিজের গাড়িতে। একটা বেশ মজবুত জিপ গাড়ি, সূচা সিং সেই গাড়িতেই ওদিকেই কোথায় যেন যাচ্ছেন কোনো একজন সরকারী হোমরা-চোমরার সঙ্গে দেখা করতে।

যাওয়ার পথে সূচা সিং অনেক গল্প করতে লাগলেন। আমি অবশ্য সব বুঝতে পারলাম না। আমি তাকিয়ে রইলাম বাইরের দিকে। কী সুন্দর ছবির মতন রাস্তা। পাহাড় চিরে এঁকেবেঁকে উঠেছে। দু পাশে পাইন আর পপলারের বন। মাঝে মাঝে চেনার গাছও দেখা যায়। চেনার গাছগুলো কী বড় বড় হয়, অনেকটা আমাদের দেবদারু গাছের মতন—যদিও পাতাগুলো অন্যরকম। হঠাৎ হঠাৎ চোখে পড়ে যায় আখরোট, খোবানি আর নাশপাতির গাছ। এগুলো অবশ্য আমার চোখে এখন নতুন লাগে না। আমি গাছ থেকে বুনো আপেল আর আঙুরও ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেয়েছি। কলকাতায় বসে এ কথা স্বপ্নেও ভাবা যায়? কত যে গোলাপফুল রাস্তায় ঘাটে ফুটে আছে!

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, সিংজী, তুমি এই কাশ্মীরে কতদিন আছো?

সূচা সিং বললেন যে কাশ্মীরে যখন যুদ্ধ হয় সাতচল্লিশ সালে, তখন তিনি এখানে এসেছিলেন লড়াই করতে। তখন সৈনিক ছিলেন। যুদ্ধে তাঁর একটা আঙুল কাটা যায়।

সূচা সিং তাঁর বাঁ হাতটা দেখালেন, সত্যিই তাঁর কড়ে আঙুলটা নেই।

সূচা সিং হাসতে হাসতে বললেন, আমি সবাইকে কী বলি জানেন? এই কড়ে আঙুলের ধাক্কা দিয়েই আমি হানাদারদের তাড়িয়ে দিয়েছি।

তারপর, তুমি এখানেই থেকে গেলে?

না। যুদ্ধ থামলে ফিরে গিয়েছিলাম। কিন্তু কাশ্মীর আমার এমন পসন্দ হয়ে গেল, সেনাবাহিনীর কাজ ছেড়ে দিয়ে আমি এখানেই চলে এলাম ব্যবসা করতে। এখন আমি এখানকারই লোক। কাশ্মীরী মেয়েকেই শাদী করেছি। দু শো টাকা নিয়ে ব্যবসা শুরু করেছিলাম, এখন দেখুন না, আমার নয়খানা গাড়ি খাটছে! কাশ্মীরের মাটিতে সোনা আছে, বুঝলেন! নইলে ইতিহাসে দেখুন না, সবারই লোভ ছিল কাশ্মীরের দিকে!

তুমি লেগে থাকো। তুমি হয়তো একদিন সেই সোনার খোঁজ পেয়েও যেতে পারো সিংজী।

সোনমার্গ পেঁছে সূচা সিং তাঁর চেনা একজন লোককে ডেকে বললেন, এই প্রোফেসার খুব বড়া আদমি। সব সময় এর দেখাশোনা করবে!

তারপর সূচা সিং চলে গেলেন। কাকাবাবু অবশ্য সূচা সিং-এর চেনা লোকটিকে পাত্তাই দিলেন না। তার হাত এড়িয়ে সোজা চলে এলেন ঘোড়াওয়ালাদের জটলার দিকে। গত কালের সেই দুটো ছেলেকেই ঠিক করলেন আজ। কোনো রকম দরাদরি না করেই ঘোড়ায় চড়ে বসে বললেন, চলো!

একটু দূরে গিয়েই কাকাবাবু থামলেন। ঘোড়া-ওয়ালা ছেলে দুটিকে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এই তোমাদের নাম কী?

নাম জিগ্যেস করতেই ওদের কী লজ্জা। মেয়েদের মতন ওদের ফর্সা গাল লাল হয়ে গেল। কিছুতেই বলতে চায় না। অনেক কষ্টে জানা গেল, একজনের নাম আবু তালেব। আর একজনের নাম তো বোঝাই যায় না। শুনে মনে হলো, ওর নাম হুন্দা। হুন্দা কী? তা সে জানে না। নামটা যেন খুবই একটা অপ্রয়োজনীয় ব্যাপার।

কাকাবাবু আমার দিকে চেয়ে বললেন, এরা হচ্ছে খশ্ জাতি। এদিককার পাহাড়ে এদের দেখা যায়।

আমি অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলাম। এখানে না এলে কি জানতে পারতাম, খশ্ জাতি নামেও একটা জাতি আছে আমাদের দেশে! যে-জাতের একটা ছেলে নিজের নামটাও ভালো করে জানে না। হুন্দার মতন একটা বিদঘুটে নাম কে ওর ঘাড়ে চাপিয়ে দিয়েছে, তাই নিয়েই ও খুব খুশী। অথচ কী সুন্দর দেখতে ছেলেটাকে। আর বেশ চটপটে, বুদ্ধিমান।

কাকাবাবু জিগ্যেস করলেন, তোমাদের গ্রামে থাকার জায়গা পাওয়া যাবে? আমাদের থাকতে দেবে?

ছেলে দুটি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করতে লাগলো। এ রকম প্রশ্ন ওরা কখনো শোনেনি। ওদের গ্রামে বোধ-হয় কোনো বাইরের লোক থাকেনি কখনো।

কাকাবাবু পকেট থেকে একটা দশ টাকার নোট বার করে বললেন, যদি থাকতে দাও, তাহলে রোজ দশ টাকা করে ভাড়া দেবো। তাছাড়া খাবার খরচ আলাদা। যে-কোনো রকমের একটা ঘর হলেই আমাদের চলবে।

টাকাটা দেখেই ওদের মুখে হাসি ফুটলো। পরস্পর কী যেন আলোচনা করে নিয়েই ওরা রাজী হয়ে গেল। তা বলে, ওদের কিন্তু লোভী মনে করা উচিত নয়। ওরা বড্ড গরিব তো, টাকার খুব দরকার ওদের।

গলাঙ্গীর নামে একটা জায়গা আছে, সেইদিকে ওদের গ্রাম। আমরা উঠতে লাগলাম পাহাড়ী পথে। পাশ দিয়ে রুপোর পাতের মতন একটা নদী বয়ে যাচ্ছে। কাকাবাবু বললেন, ওর নাম কঙ্গনা নদী। সন্তু, ঐ যে রাস্তাটা দেখতে পাচ্ছো, ঐ রাস্তাটা চলে গেছে লাদাকে। এমনিতে লোকে যাকে বলে লাডাক। এই রাস্তাটা খুব ভয়ংকর। এই রাস্তাটা দিয়ে যাতায়াত করতে গিয়ে কত মানুষ যে প্রাণ হারিয়েছে তার ইয়ত্তা নেই!

আস্তে আস্তে ঘোড়া চলছে, আমি চারদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছি। কী সুন্দর জায়গাটা! এখানে এলে

মরার কথা মনেই হয় না। পাহাড়ের পর পাহাড়ের সারি। দূরে একটা পাহাড়ের মাথা সব পাহাড়কে ছাড়িয়ে জেগে রয়েছে। সেটা দেখতে ঠিক মন্দিরের মতন।

কাকাবাবু, মন্দিরের মতন ঐ পাহাড়টার নাম কী?

ঠিকই বলেছিস, মন্দিরের মতন! সাহেবরাও ঐ পাহাড়ের নাম দিয়েছে ক্যাথিড্রাল পীক। ঐ যে রাস্তাটার কথা বললাম, ওটাকে ওয়াঙ্গাথ নালাও বলে। ঐ রাস্তা শুধু লদ্দাক নয়, ওটা দিয়ে সমরখন্দ, পামীর, বোখারা, তাসখন্দ যাওয়া যায়। হাজার হাজার বছর আগে থেকেও মানুষ ঐ রাস্তা দিয়ে যাতায়াত করেছে। ঐ রাস্তাটার জন্যই আমার এখানে আসা।

যেতে যেতে একটা মিলিটারি ক্যাম্প পড়লো। বন্দুকধারী মিলিটারি এসে আমাদের আটকালো। কাকাবাবু ঘোড়া থেকে নেমে তার সঙ্গে কী যেন কথা বললেন। দেখালেন কাগজপত্র। যে-কোনো জায়গায় ঘোরাফেরা করার অনুমতিপত্র কাকাবাবুর আছে।

মিলিটারির লোকেরা আমাদের চা না খাইয়ে কিছুতেই ছাড়বে না। প্রায় জোর করে নিয়ে গেল ওদের তাঁবুতে। আমাদের দেখে ওরা হঠাৎ যেন খুব খুশী হয়ে উঠেছে। কাকাবাবু বললেন, ওরা তো কথা বলার লোক পায় না। মাসের পর মাস এখানে এমনি পড়ে আছে, আমাদের দেশকে পাহারা দিচ্ছে। তাই কথা বলার লোক পেলে ওদের ভালো লাগে।

সেখানে দুধে সেদ্ধ করা চা আর হালুয়া খেলাম। গল্প করলাম কিছুক্ষণ। আমাকে একজন মিলিটারি বললো, খোকাবাবু, হরিণের শিং নেবে? এই নাও!

বেশ একটা হরিণের শিং উপহার পেয়ে গেলাম। মিলিটারি দুজনেই পাঞ্জাবী শিখ। ভারী ভালো লোক। ঠিক আত্মীয়-স্বজনের মতন ব্যবহার করছিল আমাদের সঙ্গে। ওদের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে আবার উঠতে লাগলাম পাহাড়ী রাস্তায়। কাকাবাবু বললেন, আমরা সাড়ে সাত হাজার ফিটেরও বেশী উঁচুতে এসেছি।

আবু তালেব আর হুন্দাদের গ্রাম পাশাপাশি। কোন গ্রামে থাকবো, তাই নিয়ে ওরা দুজনে আমাদের টানাটানি করতে আরম্ভ করলো। কেউ ছাড়বে না। শেষ পর্যন্ত সব দেখেশুনে কাকাবাবু ঠিক করলেন, আবু তালেবদের গ্রামটাতেই থাকবেন। তবে, হুন্দা আমাদের জন্য রান্না-টান্না ও অন্যান্য ব্যাপার দেখাশুনোর কাজ নেবে—এ জন্য সে-ও রোজ দশ টাকা করে পাবে।

ওদের গ্রামে পৌঁছুনো-মাত্র গ্রামের সব লোক ভিড় করে এসে আমাদের ঘিরে ধরলো। সবারই চোখে মুখে দারুণ কৌতূহল। ওদের গ্রামের বাচ্চারা কিংবা মেয়েরা আমাদের মতন জামাকাপড়-পরা মানুষই কখনো দেখেনি।

আবু তালেব নিজস্ব ভাষায় ওদের কী সব বোঝালো। ব্যস্ত হয়ে ঘোরাঘুরি করলো খানিকক্ষণ। তারপর আমাদের একটা ঘরে নিয়ে গেল। একখানা ছোট কাঠের ঘর, বোধহয় অন্য কেউ থাকতো, আমাদের জন্য এইমাত্র খালি করা হয়েছে। কাকাবাবু একবার দেখেই ঘরটা পছন্দ করে ফেলেছেন।

গ্রামখানা বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন। ছোট ছোট কাঠের বাড়ি। পাহাড়ের গায়ে বাড়িগুলো যেন সাজিয়ে সাজিয়ে বসানো হয়েছে। পাহাড়ের নিচের দিকে খুব ঘন জঙ্গল। শুনলাম, এই গ্রামে একটাই শুধু অসুবিধে, খুব জলের কষ্ট। পাহাড়ের একেবারে নিচ থেকে জল আনতে হয়। হোক, এই শীতে বেশী জল তো লাগবে না আমাদের!

কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঘরটা ভালো করে গুছিয়ে ফ্যাল। জায়গাটা বেশ নিরিবিলি, আমার খুব পছন্দ হয়েছে। তুই এখানে থাকতে পারবি তো?

আমি ঘাড় কাৎ করে বললাম, হ্যাঁ। কতদিন থাকবো এখানে?

দিন দশ-বারো। এর মধ্যে যদি কিছু না হয়, তাহলে এবারকার মতন ফিরে যেতে হবে। তোরও তো ইস্কুলের ছুটি ফুরিয়ে আসবে।

আমার ইস্কুল খুলতে এখনও কুড়ি দিন বাকি।

ঠিক আছে। এবার ভালো করে কাজ শুরু করতে হবে।

আমার শুধু একবার মনে হলো, সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণিরা জানতেও পারবে না, আমরা কোথায় আছি। ওদের সঙ্গে আর দেখা হবে না।

দু চোখে আগুন, এক অশ্বারোহী

এখানে আমাদের চার দিন কেটে গেল। সারাদিন কাকাবাবু আর আমি ঘুরে বেড়াই, ফিতে নিয়ে মাপা-মাপি হয়। জঙ্গলের ভেতরেও চলে যাই। কাজ অবশ্য কিছুই হচ্ছে না, তবে বেড়ানো তো হচ্ছে। কাশ্মীরে অনেকেই বেড়াতে যায়, কিন্তু কেউ তো গুজর আর খশ জাতির লোকদের সঙ্গে তাদের গ্রামে থাকেনি।

সন্ধেবেলাই বাড়িতে ফিরে দরজা-জানলা সব বন্ধ করে থাকতে হয়। শীত এখানে বড্ড বেশী। খুব হাওয়া, সেইজন্য। ঘরের মধ্যে আমরা আগুন জেলে রাখি। খাওয়া-দাওয়া বেশ ভালোই হয়। গরম গরম মোটা মোটা চাপাটি আর মুরগী ঝোল। হুন্দা তো আছেই, তাছাড়া গ্রামের একটি মেয়েও দিনের বেলা আমাদের রান্না-টান্না করে দেয়। কাশ্মীরের লোকেরা ভালো রান্না করে, তবে নুন দেয় বড্ড বেশী। বলে-বলেও কমানো যায় না। এরা সবাই এত বেশী নুন খায় যে আমাদের কম নুন খাওয়ার কথা বিশ্বাসই করতে পারে না।

সারাদিনটা আমার বেশ ভালোই কাটে। সন্ধের সময়ও মন্দ লাগে না, তখন গ্রামের দু' চারজন বুড়ো লোক আসে, আগুনের ধারে বসে গল্প হয়।

কিন্তু রাত্তিরটা আমার কাটতেই চায় না। ঘুম আসে না, খুব ভয় করে। চারদিক নিঝুম। মনে হয়, নিজের

জীবনে
রঙের
বৈচিত্র্য আনতে
ক্যামেল
আর্ট কালার্স ব্যবহার করুন
camel
ক্যামলিন প্রাইভেট লিমিটেড,
আর্ট মেটেরিয়ালস্ ডিভিসন, জে. বি. নগর,
আন্ধেরি কুর্লা রোড, বোম্বাই ৫৯.
আপনার অবসর আনন্দে
ভরিয়ে তুলুন। আপনার
কল্পনা পাখা মেলে উড়ে চলুক
সুদূরে। ভাবনাধারা নিয়ে
পরীক্ষানিরীক্ষায় মেতে
উঠুন, নিজের জন্য উন্মুক্ত করুন
উজ্জ্বল, প্রাণবন্ত রঙবেরঙের
জমজমাট এক নয়া দুনিয়া।
ক্যামেল তৈরি করে
নানারকমের ও পুরো বছরের
আর্ট কালার—ওয়াক্স ক্রেয়ন
অয়েল প্যাস্টেল, টিউব কালার,
পোস্টার কালার, ব্রাশ ও
কেক কালার—একান্তই
আপনার জন্যে।

বাড়ি থেকে কোথায় কতদূরে পড়ে আছি। বেশ কয়েক-দিন হয়ে গেল বাবা-মার কাছ থেকে কোনো চিঠি পাইনি। আমারও লেখা হয়নি। পহলগাম থেকে লিখতাম কিন্তু এখানে ধারে কাছে পোস্টাফিস নেই। বাড়ির জন্য মাঝে মাঝে মন কেমন করে। একটু একটু, বেশী না।

রাত্তিরে রোজ একটা শব্দ শুনতে পাই, সেটাই সব-চেয়ে বেশী জ্বালায়। কী রকম অদ্ভুত শব্দ—অনেকটা ছুটন্ত ঘোড়ার পায়ের শব্দের মতন। কিন্তু শব্দটা মিলিয়ে যায় না। মনে হয় যেন একই জায়গায় দাঁড়িয়ে একটা ঘোড়া অনবরত দৌড়োবার ভান করছে। কিন্তু আমি ঘোড়াদের স্বভাব যেটুকু বুঝেছি, তারা তো ও রকম কক্ষনো করে না।

জানলা খুলেও দেখবার উপায় নেই। মাঝরাত্তিরের ঠান্ডা হাওয়া লাগলে নির্ঘাৎ নিউমোনিয়া। তাছাড়া একলা একলা জানলা খুলতে আমার ভয় করে। এদিকে, ওরই মধ্যে কাকাবাবু আবার ঘুমের ঘোরে কথা বলতে শুরু করেছেন। বালিশে মুখ গুঁজে কান বন্ধ করে শুয়ে রইলাম। আমার কান্না পাচ্ছিল।

প্রথম রাত্তিরে কাকাবাবুকে আমি ডাকিনি, দ্বিতীয় রাত্তিরে আর না ডেকে পারলাম না। কাকাবাবু ধড়মড় করে উঠে বসে বললেন, কী? কী হয়েছে?

একটা কী রকম বিচ্ছিরি শব্দ।

কাকাবাবু কান খাড়া করে শুনলেন। বললেন, কেউ ঘোড়ায় চড়ে যাচ্ছে। এতে ভয় পাচ্ছো কেন?

আপনি শুনুন। অনেকক্ষণ ধরে, ঠিক একই জায়গায় ঐ এক রকম শব্দ।

কাকাবাবু আর একটু শুনলেন। তারপর বললেন, ঘোড়ারই তো শব্দ, আর তো কিছু না! ঘুমিয়ে পড়ো—

আমাদের জানলার খুব কাছে।

কাকাবাবুর সাহস আছে খুব। উঠে গলায় কমফর্টার জড়ালেন। আর একটা কমফর্টার দিয়ে কান ঢাকলেন—ওভারকোটের পকেট থেকে রিভলবারটা বার করলেন। তারপর দেখলেন জানলা খুলে। টর্চ জেলে তাকিয়ে রইলেন বাইরে। আবার জানলা বন্ধ করে এসে বললেন, ওটা কিছু নয়। নিশ্চিন্তে ঘুমো—

কাকাবাবু জানলা খুলে টর্চটা যখন জেলেছিলেন, তক্ষুণি শব্দটা বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। জানলা বন্ধ করতেই আবার শুরু হলো।

আমার গলা শুকিয়ে গেল। ফ্যাকাসে মুখে বললাম, কাকাবাবু, আবার শব্দ হচ্ছে!

হোক না! শব্দ হলে ক্ষতি কী আছে? যা চোখে দেখা যায় না, তার থেকে ভয়ের কিছু নেই।

কিন্তু—

আরে, এরকম পাহাড়ী জায়গায় অনেক কিছু শোনা যায়। রাত্তিরে সব আওয়াজই বেশী মনে হয়—তাছাড়া পাহাড়ের নানান খাঁজে হাওয়া লেগে কতরকম শব্দ হয়, কত রকম প্রতিধ্বনি—এ নিয়ে মাথা ঘামাবার কিছু নেই। ঘুমিয়ে পড়লে আর কিছুই শোনা যায় না।

পরদিন সন্ধেবেলা কাকাবাবু গ্রামের দুজন বৃদ্ধকে ঐ শব্দটার কথা জিগ্যেস করলেন।

একজন বৃদ্ধ শুনেই সঙ্গে সঙ্গে বললেন, বুঝেছি বাবুসাহেব, কাল তা হলে হাকো এসেছিল।

কাকাবাবু বললেন, হাকো কে?

কোনো কোনোদিন মাঝরাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে যায়। তবে ও কারুর ক্ষতি করে না।

অত রাত্তিরে ঘোড়া ছুটিয়ে কোথায় যায়?

বৃদ্ধ দুজন চুপ করে গেলেন। কাকাবাবু হাসতে হাসতে বললেন, তাছাড়া ঘোড়া ছুটিয়ে যায় না তো কোথাও! এক জায়গায় দাঁড়িয়েই তো ঘোড়া দাবড়ায়!

ও ঐ রকমই।

কাকাবাবু আমার দিকে ফিরে ইংরেজিতে বললেন, নিশ্চয়ই এবার এরা একটা ভূতের গল্প শোনাবে। গ্রামের লোকেরা এইসব অনেক গল্প বানায়—তারপর শুনতে শুনতে ঠিক বিশ্বাস করে ফেলে।

কাকাবাবু বৃদ্ধদের আবার জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা, হাকোকে দেখতে কী রকম? কমবয়েসী ছোকরা, না, বয়স্ক লোক? দিনের বেলা তার দেখা পাওয়া যায় না?

না, দিনের বেলা কেউ তাকে দেখেনি।

আপনি তাকে দেখেছেন? রাত্তিরে?

বৃদ্ধটি চমকে উঠে বললেন, লা ইলাহা ইল্লাল্লা, মুহম্মদ রসুলুল্লা! বাবুসাহেব, তাকে কেউ দেখতে চায় না। হাকো-কে দেখলে কেউ বাঁচে না। হাকো-র চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়—তার চোখের দিকে চোখ পড়লেই মানুষ পুড়ে ছাই হয়ে যায়। তবে দিনের বেলা সে আসে না, ইচ্ছে করে কারুর কোনো ক্ষতি করে না—

কাকাবাবু বললেন, হুঁ! চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়। তাকে দেখতে কি মানুষের মতন না জন্তুর মতন? কোনো গল্প-টল্প শোনেন নি? চোখের দিকে না তাকিয়ে পেছন দিক থেকে যদি কেউ দেখে?

বৃদ্ধ বললেন, আমার ঠাকুর্দার মুখে শুনেছি, একবার একটি মেয়ে তার সামনে পড়ে গিয়েছিল, হাকো তখন হাত দিয়ে চোখ ঢাকা দেয়। মেয়েদের সে খুব সম্মান করে। সেই মেয়েটি দেখেছিল, হাকো খুব সুন্দর দেখতে একজন যুবাপুরুষ, তিরিশের বেশী বয়েস নয়—খুব লম্বা, মাথায় পাগড়ি, কোমরে তলোয়ার—

তা সে বেচারা রোজ রাত্তিরে এখান দিয়ে ঘোড়া ছোটায় কেন?

এতো শুধু আজ কালের কথা নয়! কত শো বছর ধরে যে হাকো এ রকম ভাবে যাচ্ছে, কেউ জানে না। হাকো ছিল একজন রাজার সৈন্য—লাদাকের রাস্তা দিয়ে সে রাজার খৎ নিয়ে যাচ্ছিল-এক দুশমন তাকে একটা কুয়োর

মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে।সেই থেকে প্রায়ই রাত্তিরে..

কাকাবাবু চুরুট টানতে টানতে হাসিমুখে গল্প শুনছিলেন। হঠাৎ সোজা হয়ে বসলেন। ব্যস্তভাবে জিগ্যেস করলেন, কুয়োর মধ্যে ধাক্কা দিয়ে মেরে ফেলে? এখানে কুয়ো কোথায়? আমাকে দেখিয়ে দিতে পারেন?

বৃদ্ধ বললেন, না, সে আমরা কখনো দেখিনি। শুনেছি এসব গল্প ঠাকুর্দা-দিদিমার কাছে—

আর একজন বৃদ্ধ বললেন, হ্যাঁ, আমিও শুনেছি ঐ সব জঙ্গল-টঙ্গলের দিকে বড় বড় কুয়ো আছে, একেবারে পাতাল পর্যন্ত চলে যায়—

কাকাবাবু বললেন, আমাকে নিয়ে যাবেন সেখানে? অনেক বকশিস দেবো।

প্রথম বৃদ্ধ বললেন, না, বাবুসাহেব, আমি কোনোদিন কুয়ো-টুয়োর কথা শুনিনি। এদিকে জলই পাওয়া যায় না, তা কুয়ো থাকবে কী করে? পাহাড়ের গর্ত-টর্ত হয়তো আছে, তাই লোকে বলে—

সেদিন রাত্তিরবেলা কাকাবাবু টর্চ আর রিভলবার হাতে নিয়ে জানলার কাছে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়ে রইলেন। সেদিন কিন্তু কোনো শব্দই শোনা গেল না। কাকাবাবু হেসে বললেন, আজ আমাদের ভূতমশাই বোধহয় বিশ্রাম নিচ্ছেন। রোজ কি আর সারারাত ঘোড়া চালানো যায়! তাছাড়া রিভলবার থাকলে ভূতও ভয় পায়।

পরের দিনও প্রথম রাত্তিরে কিছু শোনা যায়নি। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে স্বপ্ন দেখলাম সেই রহস্যময় ঘোড়-সওয়ারকে—যার দু চোখ দিয়ে আগুন বেরোয়, যার নাম হাকো— কী করে যে লোকে তার নাম জানলো! আমি হঠাৎ হাকোর সামনে পড়ে গেছি...। ভয় পেয়ে আমার ঘুম ভেঙে গেল। তখন শুনলাম বাইরে সেই শব্দ হচ্ছে। কাকাবাবুকে ডেকে তুললাম। কাকাবাবু টর্চ জেলে দেখার অনেক চেষ্টা করলেন। কিছুই দেখা গেল না। আওয়াজ অনবরত চললো। আমার ভীষণ খারাপ লাগতে লাগলো। মনে হলো, আর একদিনও এখানে থাকা উচিত নয়।

সকালবেলা উঠলে কিন্তু ঐ সব কথা আর তেমন মনে পড়ে না। কতরকম পাখির ডাক শোনা যায়। নরম রোদ্দুরে ঝকমক করে জেগে ওঠে একটা সুন্দর দিন। আবু তালেব আর হুন্দা দুটো ঘোড়া নিয়ে এসে হাজির হয়। মুখে সরল হাসি। তখন সব কিছুই ভালো লাগে।

আজকাল আর আমি ঘোড়া চালাবার সময় ওদের কারুকে সঙ্গে নিই না। নিজেই খুব ভালো শিখে গেছি। এক এক সময় খুব জোরে ঘোড়া ছুটিয়ে যেতে ইচ্ছে করে। খানিকটা নিচে নেমে গেলে বেশ ভালো রাস্তা— সেখানে আর কোনো রকম ভয় নেই।

কাকাবাবু বললেন, এদিকটা তো মোটামুটি দেখা হলো। চলো, আজ বনের ভেতরটা ঘুরে আসি।

আমি উৎসাহের সঙ্গে রাজী হয়ে গেলাম। বনের মধ্যে বেড়াতে আমার খুব পছন্দ হয়। এদিককার বন-গুলো বেশ পরিষ্কার, ঝাউ আর চেনার গাছ—ভেতরটা অন্ধকার হলেও রাস্তা করে নেওয়া যায় সহজেই।

সেদিন বনের মধ্যে ঘুরতে ঘুরতেই সেই সাঙ্ঘাতিক কাণ্ডটা হলো। জঙ্গলের বেশ খানিকটা ভেতরে এসে আমরা পায়ে হেঁটে ঘুরছিলাম। কাকাবাবু এখানেও ফিতে বার করে মাপতে শুরু করেছেন। এতদিনে আমার বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল যে এক একজন লোকের যেমন এক এক রকম বাতিক থাকে—তেমনি এই ফিতে মাপার ব্যাপারটাও কাকাবাবুর বাতিক। নইলে, এই জঙ্গলে ফিতে দিয়ে জায়গা মাপার কোনো মানে হয়?

জঙ্গলের মাটি বেশ স্যাঁতসেঁতে। কাল রাত্তিরেও বরফ পড়েছিল, এখন বরফ বিশেষ নেই, কিন্তু গাছগুলো থেকে চুঁইয়ে পড়ছে জল। হাঁটতে গেলে পা পিছলে যায়। আমি একটা লতা-পাতার ঝোপের কাছে পা পিছলে পড়ে গেলাম। বেশী লাগেনি, কিন্তু উঠতে গিয়েও পারলাম না উঠতে। জায়গাটা কী রকম নরম নরম। হঠাৎ আমি বুঝতে পারলাম, আমি নিচের দিকে নেমে যাচ্ছি। জায়গাটা আসলে ফাঁপা—ওপরটা ঝোপে ঢাকা ছিল। চেঁচিয়ে ওঠবার আগেই লতা-পাতা ছিঁড়ে আমি পড়ে যেতে লাগলাম নিচে। কত নিচে কে জানে।

ভয়ের চোটে নিশ্চয়ই আমি কয়েক মুহূর্তের জন্য অজ্ঞান হয়ে গিয়েছিলাম। কখন নিচে গিয়ে পড়লাম টের পাইনি। খুব বেশী লাগেনি—কারণ নিচেও বেশ

ঝোপের মতন রয়েছে। আমি একটা বড় গর্ত বা লুকনো কোনো কুয়োর মধ্যে পড়ে গেছি। ভয়ের চেয়েও, বেঁচে যে গেছি—এই জন্য একটু আনন্দই হলো সেই মুহূর্তে। আরও গভীর গর্ত যদি হতো, কিংবা তলায় যদি শুধু পাথর থাকতো—তাহলে এতক্ষণে...। আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু—

কাকাবাবু অনেকটা দূরে আছেন। হয়তো শুনতে পাবেন না। নিচ থেকে কি আমার গলার আওয়াজ পোঁছুচ্ছে? ওপর দিকটায় তাকিয়ে দেখলাম, প্রায় অন্ধকার। লতা-পাতা ছিঁড়ে যাওয়ায় সামান্য যা একটু ফাঁক হয়েছে, তাতেই সামান্য আলো।

তবে। একটা খুব আশার কথা, ফিতের একটা দিক আমার হাতে তখনও ধরা আছে। অন্য দিকটা কাকাবাবুর হাতে। এইটা দেখে নিশ্চয়ই খুঁজে পাবেন।

শক্ত করে ফিতেটা এক হাতে চেপে রেখে আমি আর এক হাতে চার পাশটায় কী আছে দেখার চেষ্টা করলাম। গর্তটা বেশ বড়। একটা কুয়োর মতন, কিন্তু জল নেই। এই কুয়োতেই কি হাকো-কে মেরে ফেলা হয়েছিল? এটা কি হাকো-র বাড়ি?

ভয়ে আমার সারা গা শিরশিরিয়ে উঠলো। আমি আবার চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু! কাকাবাবু!

চেঁচাতে চেঁচাতেই মনে হলো, কাকাবাবু এসেও কি আমাকে তুলতে পারবেন এখান থেকে? খোঁড়া পা নিয়ে কাকাবাবু একলা কী করবেন? কেন যে আবু তালেব আর হুন্দাকে আজ সঙ্গে আনিনি। কাকাবাবু এখান থেকে ওদের গ্রামে ফিরে গিয়ে ওদের ডেকে আনতে আনতেই যদি আমি মরে যাই? মনে হচ্ছে যেন এর মধ্যেই আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে। আমি মরে গেলে আমার মায়ের কী হবে? মা-ও যে তাহলে কাঁদতে-কাঁদতে মরে যাবে!

গলা ফাটিয়ে আরও কয়েকবার আমি কাকাবাবুর নাম ধরে চেঁচালাম। এখনো আসছেন না কেন? হয়তো এখানকার কোনো শব্দ ওপরে পোঁছোয় না।

একটু বাদে আমার হাতের ফিতেয় টান পড়লো। কাকাবাবুর গলা শুনতে পেলাম, সন্তু? সন্তু?

এই যে আমি, নিচে—

ওপরে খ্যাঁচ-খ্যাঁচ শব্দ হতে লাগলো, আমার গায়ে গাছ লতাপাতার টুকরো পড়ছে। কাকাবাবু ছুরি দিয়ে ওপরের জঙ্গল সাফ করছেন। খানিকটা পরিষ্কার হবার পর কাকাবাবু মুখ বাড়ালেন। ব্যাকুলভাবে বললেন, সন্তু, তোমার লাগেনি তো? সন্তু, কথা শুনতে পাচ্ছো?

হ্যাঁ, পাচ্ছি। না, আমার লাগেনি।

উঠে দাঁড়াতে পারবে?

হ্যাঁ। আমি তো দাঁড়িয়েই আছি।

তোমার আশে-পাশে জায়গাটা কী রকম?

কিচ্ছু দেখতে পাচ্ছি না। ভীষণ অন্ধকার এখানে। আমিও কিছু দেখতে পাচ্ছি না। দাঁড়াও, একটু দাঁড়াও—কাকাবাবু আবার ছুরি দিয়ে গাছপালা কেটে সাফ করতে লাগলেন। গর্তের মুখটা প্রায় সবই পরিষ্কার হয়ে যাবার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, ঠিক মাঝখানে এসে দাঁড়াও। তোমার জামার সামনের দিকটা পেতে ধরো, আমি আমার লাইটারটা ফেলে দিচ্ছি।

জামা পাততে হলো না, এখন আমি গর্তের ওপর দিকটা স্পষ্টই দেখতে পাচ্ছি। কাকাবাবু লাইটারটা ফেলে দিতেই আমি লুফে নিলাম।

লাইটারটা জ্বালিয়ে দেখো, ওখানে কী আছে!

কাকাবাবু এই লাইটারে চুরুট ধরান। বেশ অনেকটা শিখা হয়। জ্বেলে চারপাশটা দেখলাম। গর্তটা বহু পুরোনো, দেয়ালের গায়ে বড় বড় গাছের শিকড়। দেখলে মনে হয় মানুষেরই কাটা গর্ত। একদিকে একটা সুড়ঙ্গের মতন। তার ভেতরটা এত অন্ধকার যে তাকাতেই আমার গা ছমছম করলো।

সে-কথা কাকাবাবুকে বলতেই তিনি উত্তেজিতভাবে বললেন, ঠিক আছে। কোনো ভয় নেই। আমি একটা দড়ি গাছের সঙ্গে বেঁধে আর এক দিক নিচে নামিয়ে দিচ্ছি, তুমি শক্ত করে ধরবে!

তখন আমার মনে পড়লো, আমাদের ব্যাগের মধ্যে তো নাইলনের দড়ি আছে। ভীষণ শক্ত, কিছুতেই ছেঁড়ে না। তাহলে আর ভয় নেই। দড়ি ধরেই আমি ওপরে উঠে যেতে পারবো।

দড়িটা নিচে এসে পড়তেই আমি হাতের সঙ্গে পাক দিয়ে শক্ত করে ধরলাম। তারপর লাইটারটা নিভিয়ে দিয়ে বললাম, কাকাবাবু, আমি উঠছি ওপরে—

কাকাবাবু ব্যস্ত হয়ে বললেন, না, না, উঠো না। চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকো। আমি আসছি।

সেই দড়ি ধরে কাকাবাবু নেমে এলেন। মাটিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই ফিসফিস করে বললেন, সন্তু, এই গর্তের মুখটা চৌকো—এই সেই চৌকো পাতকুয়ো! আমরা যা খুঁজছিলাম বোধহয় সেই জায়গা।

বিস্ময়ে আমার মুখ দিয়ে কথা বেরুলো না। এই গর্তটা আমরা খুঁজছিলাম—এতদিন ধরে? কিন্তু কী আছে এখানে? এখানে কি গুপ্তধন আছে?

কাকাবাবু সুড়ঙ্গটার কাছে গিয়ে উঁকি মেরে বললেন, এর ভেতরে ঢুকতে হবে। সন্তু, তুমি ভিতরে ঢুকতে পারবে?

আমি কাকাবাবুর গা ঘেঁষে ওভারকোটটা চেপে ধরে দাঁড়িয়ে রইলাম। আমার ভীষণ ভয় করছে। আমি মরে গেলেও ঐ অন্ধকার সুড়ঙ্গের মধ্যে ঢুকতে পারবো না। কাকাবাবু একলা ঢুকলেও ভয়, কাকাবাবুর যদি কোনো বিপদ-টিপদ হয়ে যায়! কাকাবাবু নিচে নামবার সময় ক্রাচ দুটো আনেন নি। ও'র এমনি দাঁড়িয়ে থাকতেই কষ্ট [illegible] করছেন না এখন।

কাকাবাবু বললেন, দাঁড়াও, আগে দেখোনি, সুড়ঙ্গটা কত বড়।

কাকাবাবু লাইটারটা জ্বাললেন। তাতে বিশেষ কিছুই দেখা গেল না। শুধু জমাট অন্ধকার।

সন্তু, দ্যাখ তো, শুকনো গাছটাছ আছে কিনা, যাতে আগুন জ্বালা যায়!

শুকনো গাছও নেই। বরং সব কিছুই ভিজে স্যাঁতসেঁতে। পাথরের দেয়ালে হাত দিলেও হাতে জল লাগে।

কাকাবাবু অধীর হয়ে বললেন, কী মুশ্কিল, আগুন জ্বালাবার কিছু নেই? টর্চটা আনলে হতো—বুঝবোই বা কী করে, দিনের বেলা—

আমি বললাম, কাকাবাবু, এখন আমরা ওপরে উঠে পড়ি বরং। পরে লোকজন ডেকে এনে দেখলে হয় না?

কাকাবাবু প্রায় ধমক দিয়ে বললেন, না! এসব লোকজন ডেকে এনে দেখার জিনিস নয়।

কাকাবাবু ঝট করে পকেট থেকে বড় একটা রুমাল বার করলেন। তারপর সেটাতেই একটু পেটরোল ছিটিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলেন। রুমালটা দাউ দাউ করে জ্বলে উঠলো। সেই আলোতে দেখা গেল গুহাটা বেশী বড় নয়। কাকাবাবু মাথা নিচু করে ভেতরে ঢুকতে যাচ্ছিলেন, আমি দারুণ ভয় পেয়ে কাকাবাবুকে টেনে ধরে চেঁচিয়ে উঠলাম, কাকাবাবু, দ্যাখো, দ্যাখো—

গুহার একেবারে শেষ দিকে দুটো চোখ আগুনের মতন জ্বলজ্বল করছে। আমার তক্ষুণি মনে হলো, হাকো বসে আছে ওখানে। আমি প্রথমেই ভেবেছিলাম, এটা হাকোর বাড়ি। ও বেরিয়ে এসেই আমাদের পুড়িয়ে ছাই করে দেবে।

কাকাবাবু একটু থমকে গেলেন। আমি ফিসফিস করে বললাম, হাকো! নিশ্চয়ই হাকো! ওরা বলেছিল কুয়োর মধ্যে...

কাকাবাবু বললেন, ধ্যাৎ! হাকো আবার কী? তোর মাথার মধ্যে বুঝি ঐ সব গল্প ঢুকেছে!

তা হলে কী? চোখ দুটোতে আগুন জ্বলছে—

আগুন কোথায়? আলো পড়ে চকচক করছে।

তবে কি বাঘ?

এত ঠান্ডা জায়গায় বাঘ থাকে না। খুব সম্ভব পাহাড়ী সাপ। পাইথন টাইথন হবে। ভয়ের কিছু নেই। পাইথন তেড়ে এসে কামড়ায় না!

রুমালটা ততক্ষণ সবটা পুড়ে এসেছে। বিশ্রী গন্ধ আর ধোঁয়া বেরুচ্ছে সেটা থেকে। ভয়ে আমার গলা শুকিয়ে এসেছে, ধোঁয়ার জন্য আবার কাশি পেয়ে গেল।

কাকাবাবু হুকুম করলেন, সন্তু, তোমার পকেট থেকে রুমাল বার করো। আমি আগুন লাগিয়ে দিচ্ছি, তুমি ধরে থাকো ওটা। এক পাশে সরে গিয়ে হাতটা শুধু বাড়িয়ে দাও গুহাটার দিকে।

কাকাবাবু রিভলবারটা বার করে বললেন, বেচারাকে মারা উচিত নয়, ও চুপ করে বসে ছিল, আমাদের কোনো ক্ষতি করেনি। কিন্তু সাপকে তো বিশ্বাস করা যায় না। আমাকে যে ভেতরে ঢুকতেই হবে।

যদি সাপ না হয়?

সাপ ছাড়া আর কোনো জন্তু এতক্ষণ চুপ করে বসে থাকে না।

কাকাবাবু সেই চোখ দুটো লক্ষ করে পর পর দুবার গুলি করলেন। হঠাৎ গুহাটার মধ্যে তুমুল কান্ড শুরু হয়ে গেল। এতক্ষণ অন্ধকারে টুঁ শব্দটিও ছিল না। এখন গুহাটার ভেতরে কে যেন প্রচন্ড শক্তি নিয়ে দাপাদাপি করছে।

কাকাবাবু চেঁচিয়ে বললেন, সন্তু, সরে দাঁড়াও, গুহার মুখটা থেকে সরে দাঁড়াও। ও এখন বেরুবার চেষ্টা করবে!

প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই সাপটার বীভৎস মুখখানা গুহা থেকে বেরিয়ে এলো। অনেকটা থেঁতলে গেছে। কাকাবাবু আবার দুটো গুলি ছুঁড়লেন।

আস্তে আস্তে থেমে গেল সব ছটফটানি। আমি উল্টো দিকের দেয়াল ঘেঁষে দাঁড়িয়ে আছি। এত জোরে বুক ঢিপঢিপ করছে যে মনে হচ্ছে কানে তালা লেগে যাবে। পা দুটো কাঁপছে থরথর করে।

কাকাবাবু এগিয়ে গিয়ে জুতোর ঠোক্কর দিয়ে দেখলেন সাপটার তখনও প্রাণ আছে কিনা। সেটা আর নড়লো না। আমি বললাম, কাকাবাবু, যদি ভেতরে আরও কিছু থাকে?

আর কিছু থাকলে এতক্ষণে বেরিয়ে আসতো।

তারপরেই কাকাবাবু গুহাটার মধ্যে ঢুকে পড়লেন। আমি বারণ করার সময় পেলাম না। তখন দিশেহারা হয়ে গিয়ে আমিও ঢুকে পড়লাম পেছন পেছন।

এই রুমালটাও প্রায় পুড়ে এসেছে। হাতে ছেঁকা লাগার ভয়ে আমি সেটাকে ফেলে দিলাম মাটিতে। সেই আলোতে দেখা গেল গুহার মধ্যে একটা মানুষের কঙ্কালের টুকরো পড়ে আছে। শুধু মুন্ডু আর কয়েকখানা হাড়। একটা ভাঙা মাটির হাঁড়ি, একটা মস্ত বড় লম্বা বর্শা। আর একটা চৌকো তামার বাক্স।

কাকাবাবু সেই তামার বাক্সটা তুলে নিয়েই বললেন, সন্তু, শিগগির বাইরে চলে এসো। এই বন্ধ গুহার মধ্যে আগুন জ্বালা হয়েছে, এখানকার অক্সিজেন ফুরিয়ে আসছে। এক্ষুনি দম বন্ধ হয়ে আসবে। চলে এসো শিগগির।

ঝোলানো দড়ি ধরে দেয়ালের শিকড় বাকড়ে পা দিয়ে একেবারে ওপরে উঠে এলাম। আগে আমি, তারপর কাকাবাবু। কাকাবাবু খোঁড়া পা নিয়ে কত কষ্ট করে যে উঠলেন, তা অন্য কেউ বুঝবে না। কিন্তু কাকাবাবুর মুখে কষ্টের কোনো চিহ্ন নেই। আমিও তখন বিপদ কিংবা কষ্টের কথা ভুলে গেছি। বাক্সটার মধ্যে কী আছে তা দেখার জন্য আর কৌতূহল চেপে রাখতে পারছি না। কত অ্যাডভেঞ্চার বইতে পড়েছি, এইরকম ভাবে গুপ্তধন খুঁজে পাবার কথা। আমরাও ঠিক সেই রকম...বাক্সটার মধ্যে মণিমুক্তো, জহরৎ যদি ভর্তি থাকে—

কাকাবাবু টানাটানি করে বাক্সটা খোলার চেষ্টা করলেন। কিছুতেই খোলা যাচ্ছে না। তালা বন্ধও নয়, কিন্তু কীভাবে যে আটকানো তা-ও বোঝা যায় না। আমি একটা বড় পাথর নিয়ে এলাম। সেটা দিয়ে ঠুকে ঠুকে একটা কোণ ভেঙে ফেলা হলো। বাক্সটা অবশ্য বহুকালের পুরোনো, জোরে আছাড় মারলেই ভেঙে যাবে। ভাঙা দিকটায় ছুরি ঢুকিয়ে চাড় দিতেই ডালাটা উঠে এলো।

বাক্সটার ভেতরে তাকিয়ে আমি একেবারে নিরাশ হয়ে গেলাম। মণি, মানিক্য, জহরৎ কিছুই নেই। কেউ যেন আমাদের ঠকাবার জন্যই বাক্সটা ওখানে রেখে গেছে।

বাক্সটার মধ্যে শুধু একটা বড় গোল পাথর, গায়ে শ্যাওলা জমে গেছে। কেউ বোধহয় আমাদের আগে ঐ গুহাটায় ঢুকে বাক্সটা খুলে মণিমুক্তো সব নিয়ে তারপর অন্যদের ঠকাবার জন্য ভরে রেখে গেছে।

কিন্তু আমি কিছু বলবার আগেই দেখলাম, কাকাবাবুর মুখে দারুণ আনন্দের চিহ্ন। চোখ দুটো জ্বল-জ্বল করছে। ঠোঁটে অদ্ভুত ধরনের হাসি। মাটিতে হাঁটু গেড়ে বসে বাক্সটা হাতে নিয়ে কাকাবাবু হঠাৎ ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন।

মূর্তি রহস্য

চোখ মুছে কাকাবাবু বললেন, সন্তু, এতদিনের কষ্ট আজ সার্থক হলো। তোর জন্যই এটা পাওয়া গেল, তোর নামও সবাই জানবে।

আমি কিছুই বুঝতে না পেরে কাকাবাবুর পাশে বসে পড়লাম। কাকাবাবু খুব সাবধানে পাথরটা তুললেন। এবার আমি লক্ষ করলাম, ওটা ঠিক সাধারণ পাথর নয়, অনেকটা মানুষের মুখের মতন। যদিও কান দুটো আর নাক ভাঙা। সেই ভাঙা টুকরো গুলোও বাক্সের মধ্যে পড়ে আছে। বোধহয় অজগরটার লেজের ঝাপটায় বাক্সটা ওলটপালোট হয়েছে, সেই সময় ভেঙে গেছে। কিংবা আগেও ভাঙতে পারে। কাকাবাবু রুমাল দিয়ে ঘষে ঘষে শ্যাওলা পরিষ্কার করে ফেলার পর মুখ-চোখ ফুটে উঠলো। গলার কাছ থেকে ভাঙা। গোটা মূর্তি থেকে শুধু মুণ্ডুটা ভেঙে আনা হয়েছে।

কাকাবাবু ছুরি দিয়ে মুণ্ডুটার গলার কাছে খোঁচাতে লাগলেন। ঝুরঝুর করে মাটি খসে পড়ছে। অর্থাৎ মুণ্ডুটা ফাঁপা, মাটি দিয়ে ভরে রাখা হয়েছে। এখনও ভাবছি, তাহলে বোধহয় এই মুণ্ডুটার ভেতরে খুব দামী কোনো জিনিস লুকানো আছে। কিন্তু কিছুই বেরুলো না, শুধু মাটিই পড়তে লাগলো। একেবারে সাফ হয়ে যাবার পর, ভেতরটা ভালো করে দেখে নিয়ে কাকাবাবু আর একবার খুশী হয়ে উঠলেন। আমার দিকে ফিরে বললেন, সব মিলে যাচ্ছে। ভেতরে কী সব লেখা আছে দেখতে পাচ্ছিস তো? আমি অবশ্য এই লিপির পাঠোদ্ধার করতে পারবো না—কিন্তু পণ্ডিতরা দেখলে...। আমি সোনার খনি কিংবা গন্ধকের খনি আবিষ্কার করতে আসি নি, এটা খুঁজতেই এসেছিলাম। এটার কাছে সোনা, রুপো তুচ্ছ।

আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, এটা কার মুণ্ডু?

সম্রাট কনিষ্কর নাম শুনেছিস? পড়েছিস ইতিহাসে?

হ্যাঁ, পড়েছি।

সম্রাট কনিষ্ককে দেখতে কী রকম ছিল, কেউ জানে না। তুই আর আমি প্রথম তার মুখ আবিষ্কার করলাম। শুধু মুখ নয়—তার জীবনের সব কথা। ইতিহাসের দিক থেকে এর যে কী বিরাট মূল্য, তুই এখন হয়তো বুঝবি না, বড় হয়ে বুঝবি। সারা পৃথিবীর ঐতিহাসিকদের মধ্যে দারুণ সাড়া পড়ে যাবে!

কিন্তু এটা যে সত্যিই কনিষ্কর মাথা, তা কী করে বোঝা যাবে?

ঐ যে মাথার ভেতরে সব লেখা আছে!

যদি কেউ যে-কোনো একটা মুণ্ডু বানিয়ে তার মধ্যে কিছু লিখে দ্যায়, তাহলেই কি সবাই বিশ্বাস করবে?

লেখার ধরন দেখে, ভাষা দেখে, মূর্তির গড়ন দেখে পণ্ডিতরা তার বয়েস বলে দিতে পারে। ওসব বোঝা খুব শক্ত নয়।

কিন্তু মূর্তির মাথার মধ্যে কিছু লেখা থাকে—আগে তো কখনও শুনিনি। তা ছাড়া, কনিষ্কর মাথা এই গুহার মধ্যে এলো কী করে?

শোন, তা হলে তোকে গোটা ব্যাপারটা বলি, একটা প্রায় অবিশ্বাস্য ব্যাপার। পৃথিবীতে এরকম চমকপ্রদ ঐতিহাসিক আবিষ্কার খুব কমই হয়েছে। পিরামিডের লিপি কিংবা হিট্টাইট সভ্যতা আবিষ্কারের সময় যে-রকম হয়েছিল, অনেকটা সেই রকম।

কাকাবাবু পাথরের মুণ্ডুটা সাবধানে রাখলেন সেই বাক্সের ভেতরে। আরাম করে একটা চুরুট ধরালেন। মুখে সার্থকতার হাসি। বললেন, তুই পাইথনটা দেখে খুব ভয় পেয়েছিলি না?

আমি উত্তর না দিয়ে মুখ নিচু করলাম। ভাবতে গেলেই এখনো বুক কাঁপে।

রিভলবার-বন্দুক থাকলে পাইথন দেখে ভয় পাবার বিশেষ কারণ নেই। বাঘ, হায়না হলেই বরং বিপদ বেশী। বেচারা ওখানে নিশ্চিন্তে বাসা বেঁধেছিল, বসে বসে রাজার মুণ্ডু পাহারা দিচ্ছিল। মরণ ছিল আমার হাতে।

কাকাবাবু, আপনি কী করে জানলেন যে মুণ্ডুটা এই রকম একটা গুহার মধ্যে থাকবে?

বছর চারেক আগে আমি একটা কনফারেন্সে যোগ দিতে জাপানে গিয়েছিলাম, তোর মনে আছে তো?

হ্যাঁ, মনে আছে।

ফেরার পথে আমি হংকং-এ নেমেছিলাম। হংকং-এ আমি কিছু বই পত্তর আর পুরোনো জিনিস কিনে-ছিলাম—সেখানে একটা দোকানে ঘাঁটতে ঘাঁটতে আমি একটা বহু পুরোনো বই পেয়ে যাই। বইটা চতুর্থ শতাব্দীতে একজন চীনা ডাক্তারের লেখা। ডাক্তারটির সুনাম ছিল পাগলের চিকিৎসায়। ডাক্তারী বই হিসেবে বইটার এখন কোনো দাম নেই, কারণ যে-সব চিকিৎসার কথা তিনি লিখেছেন, তা শুনলে লোকে হাসবে। যেমন, এক জায়গায় লিখেছেন, যে-সব পাগল বেশী কথা বলে কিংবা চিৎকার করে তাদের পরপর কয়েকদিন পায়ে দড়ি বেঁধে উল্টো করে ঝুলিয়ে রাখলে পাগলামি সেরে যায়!

চুরুট নিভে গিয়েছিল বলে কাকাবাবু সেটা ধরাবার জন্য একটু থামলেন। আমি এখনো অগাধ জলে। চীনে ডাক্তারের লেখা বইয়ের সঙ্গে সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু উদ্ধারের কী সম্পর্ক কিছুই বুঝতে পারছি না।

কাকাবাবু চুরুটে কয়েকবার টান দিয়ে আবার শুরু করলেন, যাই হোক, ডাক্তারী বই হিসেবে দাম না থাকলেও বইটাতে নানান দেশের পাগলদের ব্যবহার সম্পর্কে অনেক গল্প আছে, সেগুলো পড়তে বেশ মজা লাগে। তারই মধ্যে একটা গল্প দেখে আমার মনে প্রথম খটকা লেগে-ছিল। ঐ ডাক্তারেরই পরিবারের একজন নাকি দু-এক শো বছর আগে চীনের সম্রাটের প্রতিনিধি হয়ে ভারতবর্ষে এসেছিলেন। তিনি তাঁর নথি পত্রে একজন ভারতীয় পাগলের কথা লিখে গেছেন—কালিকট বন্দরের রাস্তায় পাগলটা হাতে শিকল বাঁধা অবস্থায় থাকতো আর সর্বক্ষণ চেঁচাতো—সম্রাট কনিষ্কের মুণ্ডু নিয়ে আমার বন্ধু একটা চৌকো ইঁদারায় বসে আছে, আমাকে সেখানে যেতে দাও, আমাকে ছেড়ে দাও...। পাগলের কল্পনা কত উদ্ভট

হতে পারে সেই হিসেবেই ডাক্তার-লেখকটি এই গল্পের উদ্ধৃতি দিয়েছিলেন—চার পাঁচ পাতা জুড়ে আছে সেই বর্ণনা। ঘটনাটা যে ভাবে ঐ বইতে আছে সেটা বললে তুই বুঝবি না। চীনে ভাষায় নাম টাম অনেক বদলে গেছে, জায়গার নাম ওলোট পালোট হয়ে গেছে। যাই হোক, ঐ লেখাটার সঙ্গে ইতিহাসের কিছু কিছু ঘটনা মিলিয়ে আমার কাছে যে ভাবে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠলো, সেটাই তোকে বলছি।

কনিষ্কর কথা তো ইতিহাসে একটু একটু পড়েছিস। কুষান সাম্রাজ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী সম্রাট ছিলেন এই প্রথম কনিষ্ক। খৃষ্টীয় প্রথম বা দ্বিতীয় শতাব্দীতে উনি রাজত্ব করেছিলেন। এশিয়ার অনেকগুলো দেশ ছিল ওঁর অধীনে, আমাদের ভারতবর্ষেরও প্রায় দাক্ষিণাত্য পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছিল কনিষ্কর শাসন। অন্যান্য রাজারা ওঁকে এমন ভয় পেত যে বিভিন্ন দেশের রাজপুত্রদের সম্রাট কনিষ্ক নিজের রাজ্যে নজরবন্দী করে রাখতেন বলে শোনা যায়। শুধু যে বিশাল সৈন্যবাহিনী ছিল কনিষ্কর তাই-ই নয়, সম্রাটের নিজেরও অনেক অলৌকিক ক্ষমতা ছিল বলে তখনকার লোকে বিশ্বাস করতো। পণ্ডিত সিলভ্যাঁ লেভি কনিষ্ক সম্পর্কে এই রকম একটা উপাখ্যানের উল্লেখ করেছেন। আল বেরুনি-ও প্রায় একই রকম একটা কাহিনী বলেছেন তাঁর তাহকিক-ই-হিন্দ বইতে। চীনে ডাক্তারের সেই পাগলের গল্পের সঙ্গেও এসবের মিল আছে। তাই আমি কৌতূহলী হয়েছিলাম।

গল্পটা হচ্ছে এই। গান্ধারের সম্রাট কনিষ্ক ভারত আক্রমণ করে একটার পর একটা রাজ্য জয় করে চলেছেন। এই সময় একদিন কেউ একজন তাঁকে খুব সুন্দর দুটি কাপড় উপহার দেয়। কাপড় দুটো দেখে সম্রাট কনিষ্ক মুগ্ধ হলেন, একটা নিজের জন্য রেখে আর একটা পাঠিয়ে দিলেন রানীকে।

তারপর একদিন রানী সেই কাপড়খানা পরে সম্রাটের সামনে এসেছেন, সম্রাট তাঁকে দেখেই চমকে উঠলেন। রানীর ঠিক বুকের মাঝখানে কাপড়টার ওপরে গেরুয়া একটা মানুষের হাত আঁকা।

রাজা ভুরু কুঁচকে জিগ্যেস করলেন, রানী! এ কী রকম শাড়ি পরেছো তুমি? ঐ হাতটা আঁকার মানে কী?

রানী বললেন, মহারাজ, এই কাপড়টা আপনিই পাঠিয়েছেন, সেটাতেই এই রকম হাত আঁকা ছিল।

শুনেই সম্রাট খুব রেগে গেলেন। রাজকোষের রক্ষককে ডেকে জিগ্যেস করলেন, এর মানে কী? কে এই হাতের ছাপ এঁকেছে?

রাজকোষের রক্ষক বললেন, মহারাজ, এই ধরনের সব কাপড়ের ওপরেই এই রকম হাতের ছাপ আঁকা থাকে।

সম্রাট হুকুম দিলেন, এই কাপড় যে উপহার দিয়েছে, তাকে ডাকো!

ডাকা হলো তাকে। সে বেচারী এসে ভয়ে ভয়ে বললো, সে এ সম্পর্কে কিছুই জানে না। একজন বিদেশী বণিকের কাছে এই কাপড় দেখে তার খুব পছন্দ হয়েছিল, তাই উপহার এনেছিল সম্রাটের জন্য।

সম্রাট কনিষ্ক ব্যাপারটা সম্পর্কে খুবই কৌতূহলী হয়ে উঠলেন। তৎক্ষণাৎ হুকুম দিলেন, যেমন করে পারো, ধরে আনো সেই বণিককে। অশ্বারোহী সৈনিকরা ছুটে গেল। দু দিনের মধ্যেই সেই বণিককে ধরে এনে হাজির করলো সম্রাটের সামনে। দেখা গেল, বণিকের কাছে অনেক সুন্দর সুন্দর কাপড় আছে, কিন্তু সবগুলিতেই ঐ রকম হাতের ছাপ আঁকা।

সম্রাট বললেন, বণিক, যদি সত্যিকথা বলো, তোমার ভয় নেই। কোথা থেকে এমন সুন্দর কাপড় পেয়েছো? কেনই বা এতে মানুষের হাতের ছাপ আঁকা?

বণিক ভয়ে ভয়ে হাতজোড় করে বললো, মহারাজ, এই কাপড় আমি এনেছি দক্ষিণ ভারত থেকে। সেখানে সাতবাহন নামে এক রাজা আছেন। প্রত্যেক বছর এই কাপড় তৈরী করার পর সেই রাজার কাছে আনা হয়। তিনি সমস্ত কাপড়ের ওপরে নিজের হাতের ছাপ এঁকে দেন। ছাপটা ঠিক এমনভাবে পড়ে যে কোনো পুরুষ এই কাপড় পরিধান করলে ছাপটা থাকবে ঠিক তার পিঠে, আর কোনো মেয়ে পরিধান করলে থাকবে তার বুকে।

সম্রাটের ভ্রূ কুঞ্চিত হলো, রাগে থমথমে হলো মুখ। রাজসভার অমাত্যদের বললেন, কাপড়গুলো পরে দেখতে। বণিকের কথাই সত্যি, প্রত্যেকের পিঠেই হাতের ছাপ।

সম্রাট কনিষ্ক কোষ থেকে তলোয়ার খুললেন, ঐ হাত কাটা অবস্থায় আমি দেখতে চাই। এখুনি দূত চলে যাক দাক্ষিণাত্যে, গিয়ে সেই উদ্ধত রাজা সাতবাহনকে বলুক, সে তার দুটো হাত ও দুটো পা কেটে যদি আমার কাছে পাঠিয়ে দেয়, তাহলে আমি তার রাজ্য আক্রমণ করবো না। যদি না দেয়, তাহলে শীঘ্রই আমি আসছি।

দূত ছুটে গেল সাতবাহনের রাজ্যে। তখন সম্রাট কনিষ্কের সেনাবাহিনীকে ভয় করে না এমন কোনো রাজা নেই। কনিষ্কের সঙ্গে যুদ্ধে জেতার কোনোই আশা নেই সাতবাহনের। কিন্তু সাতবাহনের মন্ত্রীরা রাজাকে খুব ভালোবাসতেন। তাঁরা দূতকে বললেন, আমাদের রাজা সাতবাহন বড্ড ভালো মানুষ, তিনি রাজকার্য কিছুই দেখেন না। তিনি কখন কোথায় থাকেন, তাও জানা যায় না। আমরা মন্ত্রীরাই রাজ্য চালাই। সম্রাটকে জিগ্যেস করে এসো, আমরা কি আমাদের সবার হাত পা কেটে পাঠাবো?

সম্রাট কনিষ্ক দূতের মুখে সেই কথা শুনে বললেন, সৈন্য সাজাও। আমি নিজে ওদের শিক্ষা দিতে যাবো। হাতি, ঘোড়া, রথ নিয়ে কনিষ্কর বিরাট সৈন্যবাহিনী চললো দাক্ষিণাত্যে।

সাতবাহন রাজার মন্ত্রীরা সেই খবর শুনে রাজাকে লুকিয়ে রাখলেন মাটির তলায় একটা গোপন গুহায়। তারপর সোনা দিয়ে অবিকল সাতবাহনের মতন একটা মূর্তি বানিয়ে তাতেই রাজার পোশাক পরিয়ে নিয়ে গেলেন বাহিনীর সামনে। কনিষ্ক সেই মূর্তিটাকে বন্দী করে ছলনা বুঝতে পারলেন। তখন তিনি বক্রহাস্যে সাতবাহন রাজার মন্ত্রীদের বললেন, তোমরা শুধু আমার সেনাবাহিনীর ক্ষমতা দেখেছো, আমার নিজস্ব ক্ষমতা এখনো দেখোনি। এইবার সেটা দ্যাখো।

সম্রাট কনিষ্ক নিজের তলোয়ার দিয়ে সেই সোনার মূর্তির হাত ও পা দুটো কেটে ফেললেন। আর ঠিক সঙ্গে সঙ্গে সেই মুহূর্তেই অলৌকিক উপায়ে মাটির নিচে গুহার মধ্যে লুকিয়ে থাকা সাতবাহন রাজার হাত ও পা দুটোও কেটে পড়ে গেল।

আল বেরুনি যে কাহিনী বলেছেন, সেটা একটু অন্যরকম। কিন্তু তাতে সম্রাট কনিষ্কর আরও বেশী অলৌকিক শক্তির পরিচয় আছে। সেখানে কনিষ্ককে বলা হয়েছে পেশোয়ারের রাজা কনিক আর সাতবাহনের

জায়গায় আছে কনৌজের রাজা। এবং কাপড়ের ওপরে হাতের ছাপের বদলে পায়ের ছাপ। যাই হোক, এটাও যে কনিষ্ক সম্পর্কে উপাখ্যান তা ঠিক বোঝা যায়। এতেও দেখা যায়, কনৌজের রাজার এক বিশ্বস্ত মন্ত্রী রাজাকে বাঁচাবার জন্য লুকিয়ে রেখে বিশ্বাসঘাতকের ভান করে কনিষ্কর সেনাবাহিনীকে ভুলিয়ে ভালিয়ে নিয়ে যায় মরুভূমির মধ্যে। সেখানে জলের অভাবে সৈন্যরা হাহাকার করতে লাগলো, যুদ্ধে হেরে যাবার মতন অবস্থা। তখন মহাপরাক্রান্ত সম্রাট কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে ডেকে বললেন, তোমার ধারণা, আমি শুধু সৈন্যবাহিনীর সাহায্যে এতবড় সাম্রাজ্য গড়েছি? এইবার আমার নিজের ক্ষমতা দ্যাখো!

সম্রাট কনিষ্ক তখন প্রকাণ্ড এক বর্শা নিয়ে সাঙ্ঘাতিক জোরে সেই মরুভূমির মধ্যে ঢুকিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে সেখান দিয়ে ঝর্ণার জলের ধারা বেরিয়ে এলো। কনিষ্ক সেই মন্ত্রীকে বললেন, যাও, এবার রাজার কাছে যাও। মন্ত্রী গিয়ে দেখলেন, লুকিয়ে থাকা অবস্থাতেই কনৌজের রাজার হাত পা কেটে টুকরো হয়ে পড়ে আছে। কনিষ্ক যে আগেও অনেকবার এরকম অলৌকিক ক্ষমতা দেখিয়েছেন, তারও উল্লেখ আছে।

আবার চুরুট জ্বালিয়ে কাকাবাবু বললেন, এর পরের ঘটনা আমি পেয়েছি চীনে ডাক্তারের লেখা সেই পাগলের কাহিনী থেকে। সাতবাহন রাজার মৃত্যুর পর তাঁর রাজ্য ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, বংশের লোকেরা পালিয়ে পালিয়ে বেড়াতে থাকে। কিন্তু রাজপরিবার ও মন্ত্রীপরিবারের কয়েকজন পুরুষ ঐ অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য দারুণ প্রতিজ্ঞা করে। তারা ঠিক করে ছদ্মবেশ ধরে বা যে-কোনো উপায়েই হোক, তারা কনিষ্ককে গুপ্তহত্যা করবে—এজন্য তারা জীবন দিতেও প্রস্তুত। কিন্তু কনিষ্কর মতন এতবড় একজন সম্রাটের রক্ষীবাহিনীকে অতিক্রম করে তাঁকে খুন করা প্রায় অসম্ভব ব্যাপার। তারা শেষ পর্যন্ত কনিষ্ককে খুন করতে পারেনি। এদিকে অহংকারী সম্রাট কনিষ্ক তাঁর জীবিতকালেই নিজের মূর্তি প্রতিষ্ঠা করিয়েছিলেন। তিনি বলতেন, তাঁর মস্তিষ্কের অলৌকিক শক্তির জন্যই তাঁর এত প্রতিষ্ঠা। সেইজন্য তাঁর বিশেষ নির্দেশে তাঁর মূর্তির মাথার ভেতরে তাঁর কীর্তিকাহিনী সব খোদাই করে রাখা হয়। সাতবাহন বংশের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ পুরুষরা কনিষ্ককে হত্যা করতে না পেরে তাঁর মূর্তির মুণ্ডু ভেঙে নিয়ে যায়। কনিষ্কর যে দুটি মূর্তি পাওয়া গেছে, দুটিরই মাথা এই জন্য ভাঙা।

চীনে ডাক্তার সেই পাগলের কাহিনীতে ভেবেছিলেন বুঝি পাগলটা সত্যিকারের কনিষ্কর কাটামুণ্ডের কথা বলতো। কিন্তু কনিষ্ক যে সেভাবে মারা যাননি, তা সেকালের সবারই জানা ছিল। পড়ে আমার মনে হলো, আসলে পাথরের মূর্তির মাথার কথাই বলেছিল সে।

ব্যাপারটা হয়েছিল এই রকম। সাতবাহন বংশের সেই পুরুষরা নিজেদের নাম দিয়েছিল সপ্তক বাহিনী। সেই বাহিনীর দুজন লোক চলে যায় কান্দাহার পর্যন্ত। সেখান থেকে কনিষ্ক মূর্তির মাথাটা ভেঙে নেয়। তাদের ইচ্ছে ছিল সেই ভাঙা মুণ্ডু সাতবাহন রাজার বিধবা রানীর পায়ের কাছে রাখবে। তিনি সেটাতে পদাঘাত করে শোকের জ্বালা কিছুটা জুড়োবেন। কিন্তু কাশ্মীরের কাছে এসে তারা আটকে যায়। এটাই ছিল তখন যাতায়াতের রাস্তা। ফেরার পথে যখন তারা কাশ্মীরে এসে পৌঁছয়, তখন এখানে দারুণ গৃহযুদ্ধ বেধে গেছে। রাজতরঙ্গিনীতে উল্লেখ আছে যে কাশ্মীরেও একজন রাজার নাম ছিল কনিষ্ক। সেই কনিষ্ক আর আমাদের কনিষ্ক যদি এক হয় তা হলে কনিষ্কর মৃত্যুর পর এখানে হানাহানি শুরু হয়ে যাওয়া আশ্চর্যের কিছু নয়। এখানে তখন বিদেশী দেখলেই বন্দী কিংবা হত্যা করা হচ্ছে। সপ্তক বাহিনীর লোক দুটি পড়লো মহাবিপদে। তারা দক্ষিণ ভারতের মানুষ, তাদের চেহারা দেখলেই চেনা যাবে। গণ্ডগোল কমার অপেক্ষায় তারা এখানে এক জঙ্গলে আশ্রয় নেয়। মাটিতে গভীর গর্ত খুঁড়ে তার মধ্যে লুকিয়ে থাকে।

সেই দুজনের মধ্যে একজন এক রাত্তিরবেলা খাবারের সন্ধানে বেরিয়ে এক দস্যুদলের হাতে ধরা পড়ে যায়। দস্যুদল তাকে কালিকট বন্দরে নিয়ে গিয়ে এক ব্যবসায়ীর কাছে বিক্রি করে দেয়। তখন ক্রীতদাস প্রথা ছিল, জানিস তো? সেখানে লোকটি পাগল হয়ে যায়। আসলে তার সঙ্গী সেই গুহার মধ্যে সাহায্যের প্রতীক্ষায় বসে আছে—সে কোথায় চলে গেল জানতেও পারলো না। এই চিন্তাই তাকে পাগল করে দেয়। বিশেষত, সঙ্গী যদি ভাবে যে সে বিশ্বাসঘাতকতা করে পালিয়ে এসেছে—এই চিন্তাই বেশী কষ্ট দিত তাকে। কারণ, তখনকার দিনে মানুষ প্রতিজ্ঞার খুব দাম দিত। সেইজন্যই সে সব সময় চিৎকার করে করে ঐ কথা বলে সাহায্য চাইতো পথের মানুষের কাছে। এমন কি অন্য কেউ যদি তার কথা শুনে সাহায্য করতে যায়—এইজন্য জায়গাটা এবং গুহার বর্ণনাও সে চেঁচিয়ে বলতো। কিন্তু সবটাই গাঁজাখুরি কিংবা পাগলের প্রলাপ বলে লোকে হেসে উড়িয়ে দিয়েছে। একটা গুহার মধ্যে একজন লোক সম্রাট কনিষ্কর কাটা মুণ্ডু নিয়ে বসে আছে, একথা কে বিশ্বাস করবে!

চীনে ডাক্তারের সেই লেখা আর ইতিহাসের অন্যান্য

উপাদান মিলিয়ে আমি এই ব্যাপারটা মনে মনে খাড়া করেছিলাম। আর্কিওলজিক্যাল সার্ভেতে কাজ করার সময়ও এই সব ব্যাপার নিয়ে আমি অনেক ঘাঁটাঘাঁটি করেছি। কিন্তু আর কারুকে বলিনি। ইতিহাসে এ-রকম অনেক বিস্ময়কর ব্যাপার আছে। কিন্তু প্রমাণিত না হলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমারও এক এক সময় মনে হতো পুরো ব্যাপারটাই মিথ্যে। আবার কোনো সময় মনে হতো—যদি সত্যি হয়, তাহলে ইতিহাসের একটা মহা-মূল্যবান জিনিস মাটির তলায় চাপা পড়ে থাকবে? তাই আমি নিজে খুঁজতে বেরিয়েছিলাম।

চুরুটটা ফেলে দিয়ে কাকাবাবু বললেন, এই সামান্য পাথরের টুকরোটার কত দাম এখন বুঝতে পারছিস? এর ভেতরে খোদাই করা লিপির যখন পাঠোদ্ধার হবে—ইতি-হাসের কত অজানা তথ্য যে জানা হয়ে যাবে তখন! চল্, এবার আমাদের ফিরতে হবে।

আমি অভিভূতভাবে কাকাবাবুর গল্প শুনছিলাম। শুনতে শুনতে আমি চলে গিয়েছিলাম প্রাচীন ভারতের সেই সব জাঁকজমকের দিনে। চোখের সামনে যেন দেখতে পাচ্ছিলাম সম্রাট কনিষ্ককে। পুরু দুটি ঠোঁট, চোখের দৃষ্টিতে প্রচণ্ড অহংকার, চৌকো ধরনের চোয়াল। কাকা-বাবুর কথায় ঘোর ভেঙে গেল।

খুব সাবধানে বাক্সটা হাতে তুলে নিয়ে কাকাবাবু বললেন, শোন্ সন্তু এ সম্পর্কে এখন কারুকে একটা কথাও বলবি না। কারুকে না। আমরা আজই পহলগামে ফিরে যাবার চেষ্টা করবো। যদি প্লেনের টিকিট পাওয়া যায়, কাল পরশুর মধ্যেই ফিরে যাবো দিল্লি। সেখানে প্রেস কনফারেন্স করে সবাইকে জানাবো। তার আগে এটা সাবধানে জমা রাখতে হবে সরকারের কাছে। সন্তু, আজ আমার বড় আনন্দের দিন। সারা জীবনে কখনো আমি এত আনন্দ পাইনি। মানুষ হয়ে জন্মালে অন্তত একটা কিছু মূল্যবান কাজ করে যাওয়া উচিত। এটাই আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ কাজ।

বিপদের পর বিপদ

গ্রামে ফিরে গিয়েই আমরা জিনিসপত্র গুছিয়ে নিয়ে রওনা হলাম সোনমার্গের দিকে। কাকাবাবু আর এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করতে রাজী নন। খাবার দাবার তৈরী হয়ে গিয়েছিল, সেগুলো আমরা সঙ্গে নিয়েই বেরিয়ে পড়লাম। কাকাবাবু বললেন, পথে কোনো নদীর ধারে বসে খেয়ে নিলেই হবে।

গ্রামের বেশ কয়েকজন লোক আমাদের সঙ্গে সঙ্গে অনেক দূর পর্যন্ত এলো। ঐসব লোকেরা ইতিমধ্যেই ভালোবেসে ফেলেছিল আমাদের। একজন মুসলমান বৃদ্ধা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করতে করতে কেঁদেই ফেললেন। আবু তালেব আর হুন্দা তো এলোই সোনমার্গ পর্যন্ত।

সোনমার্গে এসে আমরা বাসের জন্য দাঁড়িয়ে রইলাম অনেকক্ষণ। বাসের আর পাত্তা নেই। বিকেল হয়ে এসেছে, এর পর আর বেশীক্ষণ বাস বা গাড়ি চলবেও না এ পথে। কাকাবাবু চেষ্টা করলেন কোনো জিপ ভাড়া করার জন্য। তাও পাওয়া গেল না। একটু বাদে একটা স্টেশন ওয়াগন হুস করে থামলো আমাদের সামনে। সামনের সীট থেকে দাড়িওয়ালা একটা মুখ বেরিয়ে এসে জিগ্যেস করলো, কী প্রোফেসারসাব, পহলগাম ফিরবেন নাকি?

সুচা সিং। ওঁকে দেখে কাকাবাবু এই প্রথম একটু খুশী হলেন। নিজেই অনুরোধ করে বললেন, কী সিংজী, আমাদের একটু পহলগাম পেঁৗছে দেবে নাকি? আমরা গাড়ি পাচ্ছি না।

সুচা সিং গাড়ি থেকে নেমে এসে অত্যন্ত বিনয়ের সঙ্গে বললেন, নিশ্চয়ই, নিশ্চয়ই! আপনি আমার গাড়িতে চড়বেন, এতো আমার ভাগ্য! আসুন, আসুন! কী খোকা-বাবু, গাল দুটো খুব লাল হয়েছে দেখছি। খুব আপেল খেয়েছো বুঝি?

কাকাবাবু বললেন, সিংজী, তোমার গাড়ির যা ভাড়া হয়, তা আমি দেবো। তোমার এটা ব্যবসা, আমরা এমনি-এমনি চড়তে চাই না।

সুচা সিং একগাল হেসে বললেন, আপনার সঙ্গেও ব্যবসার সম্পর্ক? আপনি একটা মানী গুণী লোক। তাছাড়া, আজ আমি শ্বশুরবাড়ি থেকে ফিরছি, আজ তো আমি ব্যবসা করতে আসিনি। আপনাকে বলেছিলাম না, আমি কাশ্মীরী মেয়ে বিয়ে করেছি? এইদিকেই বাড়ি—

গাড়িতে উঠে বসলাম। গাড়ির পেছনে নানান রকমের ফলের ঝুড়িতে ভর্তি। সুচা সিং বোধহয় ওসব উপহার পেয়েছেন শ্বশুরবাড়ি থেকে। আমরা আমাদের জিনিস-পত্র পেছনেই রাখলাম, কিন্তু সেই তামার বাক্সটা কাকাবাবু একটা কাঠের বাক্সে ভরে নিয়েছিলেন সেটা কাকাবাবু খুব সাবধানে নিজের কাছে রাখলেন।

গাড়ি ছাড়ার পর সুচা সিং বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার এদিককার কাজ কর্ম হয়ে গেল? কিছু পেলেন?

কাকাবাবু উদাসীনভাবে উত্তর দিলেন, না, কিছু পাইনি। আমি এবার ফিরে যাবো।

ফিরে যাবেন? এর মধ্যেই ফিরে যাবেন? আর কিছু-দিন দেখুন!

নাঃ, আমার দ্বারা এসব কাজ হবে না বুঝতে পারছি। তাছাড়া গন্ধকের খনি এখানে বোধহয় পাবার সম্ভাবনা নেই।

ওসব গন্ধক-টন্ধক ছাড়ুন! আপনাকে আমি বলে দিচ্ছি, এখানকার মাটির নিচে সোনা আছে। মাটন্-এর দিকে যদি খোঁজ করতে চান, বলুন, আমি আপনাকে সব রকম সাহায্য করবো।

তুমি অন্য লোককে দিয়ে চেষ্টা করো। সিংজী, আমাকে দিয়ে হবে না।

আপনার ঐ বাক্সটার মধ্যে কী আছে?

কাকাবাবু তাড়াতাড়ি বাক্সটার গায়ে ভালো করে হাত চাপা দিয়ে বললেন, ও কিছু না, দু' একটা টুকিটাকি জিনিস পত্তর।

কী আছে, বলুন না! আমি কি নিয়ে নিচ্ছি নাকি? হাঃ হাঃ—

আমি সুচা সিংকে নিরস্ত করবার জন্য বলে ফেললাম, ওর মধ্যে একটা পাথর আছে। আর কিছু নেই!

বলেই বুঝলাম ভুল করেছি। কাকাবাবু আমার দিকে ভর্ৎসনার দৃষ্টিতে তাকালেন। সুচা সিং ভুরু কুঁচকে বললেন, পাথর? একটা পাথর অত যত্ন করে নিয়ে যাচ্ছেন? সোনা টোনার স্যাম্পল নাকি? সোনা তো পাথরের সঙ্গেই মিশে থাকে!

কাকাবাবু কথাটা হেসে উড়িয়ে দেবার চেষ্টা করে বললেন, আরে ধ্যাৎ, সেসব কিছু না। তুমি খালি সোনার

স্বপ্ন দেখছো। এটা একটা কালো রঙের পাথর, দেখে ভালো লাগলো, তাই নিয়ে যাচ্ছি!

আলাদা বাক্সে কালো পাথর? এদিকে কালো পাথর পাওয়া যায় বলে তো কখনো শুনিনি। প্রোফেসার, আমাকে একটু দেখাবেন?

পরে দেখবেন। এখন এটা খোলা যাবে না।

কেন, খোলা যাবে না কেন? সামান্য একটা বাক্স খোলা যাবে না? দিন, আমি খুলে দিচ্ছি।

এক হাতে গাড়ির স্টিয়ারিং ধরে সুচা সিং একটা হাত বাড়ালেন বাক্সটা নেবার জন্য।

কাকাবাবু হঠাৎ রেগে গিয়ে বললেন, না, এ বাক্সে হাত দেবে না। বারণ করছি, শুনছো না কেন?

সুচা সিং কঠিন চোখে তাকালেন কাকাবাবুর দিকে। তারপর আস্তে আস্তে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমার নাম সুচা সিং। আমাকে এ তল্লাটের অনেকে চেনে। আমাকে কেউ ধমক দিয়ে কথা বলে না।

কাকাবাবু তখনও রাগের সঙ্গে বললেন, আমি বারণ করলেও কেউ আমার জিনিসে হাত দেবে, সেটাও আমি পছন্দ করি না।

সুচা সিং বাক্সটার দিকে একবার, কাকাবাবুর মুখের দিকে একবার তাকালেন। আমার ভয় হলো, সুচা সিং যে-রকম রেগে গেছেন, যদি এখানেই গাড়ি থেকে নেমে যেতে বলেন! এখনও যে অনেকটা রাস্তা বাকী!

সুচা সিং কিন্তু অপ্রত্যাশিতভাবে হেসে উঠলেন। হাসতে হাসতে বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনি হঠাৎ এত রেগে গেলেন কেন? একটা সামান্য পাথরও আপনি আমায় দেখাতে চান না! ঠিক আছে, দেখাবেন না। আমি কি আর জোর করে দেখবো?

এরপর কিছুক্ষণ কেউ আর কোনো কথা বললো না। আড়চোখে তাকিয়ে দেখলাম, কাকাবাবুর রাগ এখনো কমেনি। কাকাবাবু এমনিতে শান্ত ধরনের মানুষ, কিন্তু একবার রেগে গেলে সহজে রাগ কমে না। ঐ বাক্সটা তিনি আর কারুকে ছুঁতে দিতেও চান না।

একটু বাদে সুচা সিং আবার বললেন, প্রোফেসারসাব, আপনার কোটের পকেট থেকে একটা রিভলবার উঁকি মারছে দেখলাম। সব সময় অস্ত্র নিয়ে ঘোরেন নাকি?

কাকাবাবু গম্ভীরভাবে বললেন, জন্তু জানোয়ার কিংবা দুষ্টু লোকের তো অভাব নেই। তাই সাবধানে থাকতে হয়।

সুচা সিং হেসে হেসে বললেন, সে কথা ঠিক, সে কথা ঠিক!

পহলগামে এসে পেঁছুলাম সন্ধের পর। নটা বেজে গেছে। গাড়ি থেকে নামবার পর সুচা সিং কাকাবাবুর দেওয়া টাকা কিছুতেই নিলেন না। বরং কাকাবাবুর করমর্দন করে বললেন, প্রোফেসারসাব, আমি আপনার দোস্ত। গোসা করবেন না। যাবার আগে দেখা করে যাবেন! খোকাবাবু আবার দেখা হবে, কী বলো?

আমার মনে হলো, সুচা সিং মানুষটা তেমন খারাপ নয়। কাকাবাবু ওর ওপর অমন রাগ না করলেই পারতেন।

পহলগামে লীদার নদীর ওপারে আমাদের তাঁবুটা রাখাই ছিল। যে রকম রেখে গিয়েছিলাম, জিনিসপত্তর ঠিক সেই রকমই আছে। সেখানে পেঁছবার পর কাকাবাবু কাঠের বাক্সটা খুব সাবধানে তাঁর ট্রাঙ্কে ভরে রাখলেন। তারপর বললেন, সন্তু, তোমাকে আবার মনে করিয়ে দিচ্ছি, এটার কথা কারুকে বলবে না। আর এটাকে কিছুতেই চোখের আড়াল করবে না। আমি যখন তাঁবুতে থাকবো না, তুমি তখন সব সময় এটার সামনে বসে থাকবে। আর তুমি না থাকলে আমি পাহারা দেবো। বুঝলে?

রাত্তিরে খাওয়া দাওয়া করে আমরা খুব সকাল-সকাল শুয়ে পড়লাম। আজ রাত্তিরে আর কাকাবাবু ঘুমের ঘোরে কথা বলেননি একবারও। আজ তিনি সত্যিকারের শান্তিতে ঘুমিয়েছেন।

ভোরবেলা কাকাবাবুই আমাকে ডেকে তুললেন। এর মধ্যেই ওঁর দাড়ি কামানো হয়ে গেছে। কাকাবাবু বললেন, লীদার নদীর জলে রোদ্দুর পড়ে কী সুন্দর দেখাচ্ছে, দ্যাখো! কাশ্মীর ছেড়ে চলে যেতে হবে বলে তোমার মন কেমন করছে না?

কাকাবাবু, আমরা কি আজই ফিরে যাবো?

প্লেনে কবে জায়গা পাই সেটা দেখতে হবে। আজ জায়গা পেলে আজই যেতে রাজী। তুমি সব জিনিসপত্তর বাঁধাছাদা করে ঠিক করে রাখো।

বেলা বাড়ার পর কাকাবাবু বললেন, সন্তু, তুমি তাঁবুতে থাকো, আমি সব খোঁজ খবর নিয়ে আসি। ব্যাসান সাহেব আর ব্রতীন মুখার্জিকে দুটো টেলিগ্রাম পাঠাতে হবে—ওঁরা কনিষ্ক সম্পর্কে এক্সপার্ট। আমি না আসা পর্যন্ত তুমি কিন্তু কোথাও যাবে না।

কাকাবাবু চলে গেলেন। আমি খাটে শুয়ে শুয়ে একটা বই পড়তে লাগলাম। একটা অ্যাডভেঞ্চারের গল্প। পড়তে পড়তে মনে হলো, আমরা নিজেরাও কম অ্যাড-

ভেঞ্চার করিনি। গুহার মধ্যে হঠাৎ পড়ে যাওয়া, পাইথন সাপ—কলকাতায় আমার স্কুলের বন্ধুরা শুনলে বিশ্বাসই করতে চাইবে না। কিন্তু এত বড় একটা আবিষ্কারের কথা কাগজে নিশ্চয়ই বেরুবে। তখন তো সবাইকে বিশ্বাস করতেই হবে!

কতক্ষণ বই পড়েছিলাম জানি না। হোটেলের বেয়ারা যখন খাবার নিয়ে এলো তখন খেয়াল হলো। ওপারের হোটেল থেকে আমাদের তাঁবুতে খাবার নিয়ে আসে, কিন্তু কাকাবাবু তো এখনও এলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করলাম কাকাবাবুর জন্য। তারপর খিদেয় যখন পেট চুঁই চুঁই করতে লাগলো, তখন খেয়ে নিলাম নিজের খাবারটা। কাকাবাবুর খাবার ঢাকা দিয়ে রাখলাম।

বিকেল গড়িয়ে গেল, তখনও কাকাবাবু এলেন না। দুশ্চিন্তা হতে লাগলো খুব। কাকাবাবুর কোনো অ্যাকসিডেন্ট হয়নি তো? হঠাৎ জরুরী কাজে কারুর সঙ্গে দেখা করার জন্য কোথাও চলে যেতে হয়েছে? কিন্তু তাহলে কি আমায় খবর দিয়ে যেতেন না? কাকাবাবু তাঁবু থেকে বেরুতে বারণ করেছেন, আমি খোঁজ নিতে যেতেও পারছি না।

বিকেল থেকে সন্ধে, সন্ধে থেকে রাত নেমে এলো। কাকাবাবুর দেখা নেই। এতক্ষণ একা-একা এই তাঁবুতে থেকে আমার কান্না পাচ্ছিল। কিছুই করার নেই, কারুর সঙ্গে কথা বলার নেই। কী যে খারাপ লাগে! এখন আমি কী করবো কে আমায় বলে দেবে?

রাত নিঝুম হবার পর আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়লাম। এর আগে কোনোদিন আমি একলা কোথাও ঘুমোইনি। আমার ভয় করে। কিছুতেই ঘুম আসে না। খালি মনে হয়, কারা যেন ফিসফিস করে কথা বলছে। কাদের যেন পায়ের দুপদাপ শব্দ শোনা যাচ্ছে।

কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, হঠাৎ আবার ঘুম ভেঙে গেল। চোখ মেলেই দেখলাম, আমার মাথার কাছে একটা বিরাট লম্বা লোক দাঁড়িয়ে আছে। আমি চিৎকার করে ওঠবার আগেই মস্ত বড় একটা হাত আমার মুখ চেপে ধরলো। আমি সে হাতটা প্রাণপণ চেষ্টা করেও ছাড়াতে পারলাম না। তাকিয়ে দেখলাম, তাঁবুর মধ্যে আরও দুজন লোক আছে। তাদের একজন আমার মুখের মধ্যে খানিকটা কাপড় ভরে দিয়ে মুখটা বেঁধে দিল। হাত আর পা দুটোও বাঁধলো। তারপর তারা তাঁবুর সব জিনিসপত্তর লণ্ড ভণ্ড করতে লাগলো। একটু বাদেই তারা দুদ্দাড় করে বেরিয়ে গেল তাঁবু থেকে।

এতদিন আমাদের তাঁবুটা এমনি পড়েছিল, কেউ কোনো জিনিস নেয়নি। আজ ডাকাতি হয়ে গেল। তবে, ওদের মধ্যে একজনকে আমি চিনতে পেরেছি। অন্ধকারে মুখ দেখা না গেলেও যে-হাতটা আমার মুখ চেপে ধরে-ছিল, সেই হাতটার একটা আঙুল কাটা ছিল। সুচা সিং-এর একটা আঙুল নেই।

ওরা চলে যাবার পরও কিছুক্ষণ আমি চুপ করে শুয়ে রইলাম। যতক্ষণ ওরা তাঁবুতে ছিল, ততক্ষণ খালি মনে হচ্ছিল ওরা যাবার সময় আমাকে মেরে ফেলবে।

বেশ খানিকটা পর আমি আস্তে আস্তে উঠে বসলাম। হাত বাঁধা, পা বাঁধা, চ্যাঁচাবারও উপায় নেই। কিন্তু এই অবস্থায় তো সারারাত কাটানো যায় না।

আস্তে আস্তে নামলাম খাট থেকে। জোড়া পায়ে লাফিয়ে লাফিয়ে এগোবার চেষ্টা করলাম। দুবার পড়ে গেলাম হুমড়ি খেয়ে, তবু এগুনো যায়। ইস্কুলের স্পোর্টসে স্যাক রেস-এ দৌড়েছিলাম আমি, অনেকটা সেই রকম, কিন্তু বুক এমন কাঁপছে যে ব্যালেন্স রাখতে পারছি না।

কোনো রকমে পৌঁছুলাম টেবিলের কাছে। ড্রয়ার খুলে বার করলাম ছুরিটা। কিন্তু ছুরিটা ঠিক মতন ধরা যাচ্ছে না কিছুতেই। অতি কষ্টে ছুরিটা বেঁকিয়ে ঘষতে লাগলাম হাতের দড়ির বাঁধনে। প্রায় আধ ঘণ্টা লাগলো কাটতে, ততক্ষণে আমার হাত দুটো প্রায় অসাড় হয়ে এসেছে। মুখ ও পায়ের বাঁধন খুলে ফেললাম। এঃ, আমার মুখের মধ্যে এমন একটা ময়লা রুমাল ভরে দিয়েছিল যে দেখেই আমার বমি পেয়ে গেল, বমি করে ফেললাম মাটিতে। ফ্লাস্কের গরম জলে মুখ ধুয়ে ফেললাম। তাও, ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগলাম শীতে।

তাঁবুর মধ্যে এক নজর তাকিয়েই বোঝা যায়, ওরা সেই কাঠের বাক্সটা নিয়ে গেছে। পাথরের মুণ্ডুটার কোনো মূল্যই ওদের কাছে নেই—তবু কেন নিয়ে গেল? হয়তো ওরা নষ্ট করে ফেলবে। ওরা কি কাকাবাবুকে মেরে ফেলেছে? ওরা কি আমাকেও মারবে?

ডাকাতের বউ আর ছেলেমেয়ে

বিপদের রাত্রি অনেক দেরী করে শেষ হয়। সারা রাত কম্বল মুড়ি দিয়ে খাটের ওপর বসেছিলাম। চোখ ঢুলে আসছিল, তবু ঘুমোইনি। আস্তে আস্তে যখন সকাল হলো, তখন মনের মধ্যে একটু জোর পেলাম। দিনের আলোয় অনেকটা সাহস আসে। মনে মনে ঠিক করলাম, ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করে কোনো লাভ নেই। মাথা ঠাণ্ডা রাখতে হবে, কাকাবাবুকে খুঁজে বার করতে হবে।

কিন্তু আমি একলা একলা কী করবো? কেউ কি আমার কথা বিশ্বাস করবে? বাচ্চা ছেলে বলে হয়তো আমার কথা উড়িয়ে দেবে। কাকাবাবুর মতন একজন বয়স্ক জলজ্যান্ত লোক হঠাৎ নিরুদ্দেশ হয়ে গেল। সুচা সিং-এর অনেক প্রভাব প্রতিপত্তি, ওঁর বিরুদ্ধে আমার কথা কে শুনবে?

আমাদের পাশের তাঁবুতে কয়েকজন জার্মান ছেলে মেয়ে থাকে। একটু একটু আলাপ হয়েছিল। ওঁদেরও বলে কোনো লাভ নেই, ওঁরা বিদেশী কী আর সাহায্য করতে পারবে? চট করে মনে পড়ে গেল সিদ্ধার্থদার কথা। সিদ্ধার্থদা, স্নিগ্ধাদি, রিণি—ওরা কি অমরনাথ থেকে ফিরেছে? হয়তো এর মধ্যেই ফিরে শ্রীনগরে চলে গেছে। যাই হোক, অমরনাথ থেকে ফিরলে নিশ্চয়ই প্লাজা হোটেলে উঠবেন, সেখানে খবর পাওয়া যাবে।

কাকাবাবু বলেছিলেন কোনোক্রমেই তাঁবু থেকে না বেরুতে। কিন্তু যে-জন্য বলেছিলেন, তার তো আর কোনো দরকার নেই। আসল জিনিসটাই চুরি হয়ে গেছে। আমাদের তাঁবুতে আর দামী জিনিস বিশেষ কিছু নেই। কাকাবাবু টাকা পয়সা কোথায় রাখতেন আমি জানি না—সেগুলোও বোধহয় ডাকাতরা নিয়ে গেছে। হোটেলের বিল কী করে শোধ হবে কে জানে! সিদ্ধার্থদাদের না পেলে চলবেই না।

হেঁটে হেঁটে গেলাম প্লাজা হোটেলে। সেখানে কোনো খবরই পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদারা হোটেল ছেড়ে দিয়ে চলে গেছেন অমরনাথে—ফিরে এসেছেন কিনা ওঁরা জানেন না। ফেরার পর রিজার্ভেশানও করা

নেই। তবে, পোপোটলাল নামে একজন পাণ্ডা গিয়েছিল ওঁদের সঙ্গে—তার খোঁজ পেলে সব জানা যেতে পারে। পোপোটলালের ঠিকানা? ঠিকানা কিছু নেই—বাজারের কাছে গিয়ে খোঁজ করলে লোকে বলে দেবে।

নিরাশ হয়ে ফিরে এলাম প্লাজা হোটেল থেকে। কোথায় এখন পোপোটলালকে পাবো? মানুষ হারিয়ে গেলে পুলিশকে খবর দিতে হয় শুনেছি। কাকাবাবুর কথা পুলিশকে জানাতে হবে।

পহলগামের রাস্তা দিয়ে এখন কত মানুষজন হাঁটছে, কত আনন্দ সবার মুখে চোখে। আমার বিপদের কথা কেউ জানে না। আমার কেউ চেনা নেই। কলকাতায় বাবাকে টেলিগ্রাম করবো? বাবা আসতে আসতে যে সময় লাগবে ততদিন আমি একা...

হাঁটতে হাঁটতে বাস ডিপোর দিকে চলে এসেছিলাম। হঠাৎ দেখলাম একটা বাসের জানলায় রিণির মুখ। এক্ষুণি বোধহয় বাসটা ছেড়ে দেবে। আমি প্রাণপণে দৌড়োতে লাগলাম, হাত পা ছুঁড়ে ডাকতে লাগলাম, রিণি, রিণি!

বাসটা ছাড়েনি। রিণি আর স্নিগ্ধাদি বসে আছে। হাঁপাতে হাঁপাতে জিগ্যেস করলাম, সিদ্ধার্থদা কোথায়?

স্নিগ্ধাদি বললেন, ও আসছে এক্ষুণি। তুই ওরকম করছিস কেন রে, সন্তু?

রিণি বললো, কাল সারাদিন তোকে খুঁজলাম। কোথাও পেলাম না। ভাবলাম তোরা চলে গেছিস। আমরা পরশু ফিরেছি অমরনাথ থেকে। এবার পহলগামে আমরাও তাঁবুতে ছিলাম।

কাল সারাদিন আমি তাঁবুতে বসে ছিলাম, আর ওদিকে ওরা আমাকে খুঁজেছে। লীদার নদীর ধারে প্রায় পঞ্চাশ-ষাটটা তাঁবু—হয়তো আমাদেরটার কাছাকাছিই ওরা ছিল, আমি টের পাইনি।

একটু দম নিয়ে আমি বললাম, সিদ্ধার্থদাকে আমার ভীষণ দরকার। এক্ষুণি। স্নিগ্ধাদি, তোমাদের এই বাসে যাওয়া হবে না।

স্নিগ্ধাদি উৎকণ্ঠিত হয়ে বললেন, কেন কী হয়েছে কি? আমাদের তো বাসের টিকিট কাটা হয়ে গেছে, মালপত্র তোলা হয়ে গেছে।

আমি বললাম, সাঙ্ঘাতিক কাণ্ড হয়ে গেছে। কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন। আমাদের তাঁবুতে...

রিণি হি-হি করে হেসে উঠে বললো, কাকাবাবু হারিয়ে গেছেন? অতবড় একটা লোক আবার হারিয়ে যায় নাকি? বল্ তুই-ই হারিয়ে গেছিস, তোর কাকাবাবুই তোকে খুঁজছেন।

আঃ, মেয়েদের নিয়ে আর পারা যায় না। রিণিটা একদম বাজে মার্কা। দরকারী কথার সময়েও হাসে। ভাগ্যিস এই সময় সিদ্ধার্থদা এসে গেলেন।

আমি সিদ্ধার্থদাকে একপাশে টেনে নিয়ে গিয়ে যত সংক্ষেপে সম্ভব ব্যাপারটা বুঝিয়ে বললাম। সিদ্ধার্থদা ভুরু কুঁচকে একটুক্ষণ ভাবলেন। তারপর বললেন, এতো সত্যি সাঙ্ঘাতিক ব্যাপার। আমাদের সব মালপত্র উঠে গেছে, শ্রীনগরে লোক অপেক্ষা করবে। অথচ তোমাকে একা ফেলে রাখাও যায় না। আচ্ছা, এক কাজ করা যাক।

ততক্ষণে বাসটা স্টার্ট নিয়েছে, কণ্ডাকটর হুইসল বাজাচ্ছে ঘন ঘন। এ সব জায়গার বাসে নিয়ম কানুন খুব কড়া। সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে স্নিগ্ধাদিকে বললেন শোনো, তোমরা দুজনে চলে যাও শ্রীনগরে। এখানে একটা ব্যাপার হয়ে গেছে—আমি সন্তুর সঙ্গে থাকছি—একদিন পর যাবো।

স্নিগ্ধাদি তো কথাটা শুনেই উঠে দাঁড়িয়েছেন। বললেন, পাগল নাকি! আমরাও থাকবো তাহলে। কণ্ডাকটরকে বলো—

সিদ্ধার্থদা বললেন, লক্ষ্মীটি, আমার কথা শোনো। শ্রীনগরে তো সব ঠিক করাই আছে, তোমাদের কোনো অসুবিধে হবে না। তোমরা এখানে থাকলেই বরং অসুবিধে হবে। আমি একদিন পরেই আসছি।

বাস ততক্ষণে চলতে শুরু করেছে, সিদ্ধার্থদা সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা হেঁটে গেলেন বোঝাতে বোঝাতে। তারপর বাস জোরে ছুটলো, রিণি হাত নাড়তে লাগলো।

সিদ্ধার্থদা আমাকে জিগ্যেস করলেন, থানায় খবর দিয়েছো? দাওনি? চলো, আগে সেখানে যাই।

থানায় দুজন অফিসার ছিলেন, তাঁদের নাম মীর্জা আলি আর গুরুবচ্চন সিং। খাতির করে বসতে বললেন আমাদের, মনোযোগ দিয়ে সব কথা শুনলেন। তারপর মীর্জা আলি বললেন, বহুৎ তাজ্জবকী বাৎ! এখানে এরকম ঘটনা কখনো ঘটে না। দিনের বেলা একটা লোক উধাও হয়ে যাবে কী করে? তাছাড়া সুচা সিং-এর নামে তো কেউ কোনোদিন কোনো অভিযোগ করেনি।

গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনাদের তাঁবু থেকে কী কী চুরি গেছে? দামী জিনিস কী কী ছিল?

আমি আমতা আমতা করে বললাম, কাকাবাবুর একটা রিভলবার ছিল, সেটা তিনি নিয়ে বেরিয়েছিলেন কিনা জানি না—সেটা পাচ্ছি না। আর কিছু টাকা পয়সা—

কত?

আমি তা জানি না।

ক্যামেরা-ট্যামেরা?

ছিল না। একটা দুরবীন ছিল, সেটা নেয়নি।

আশ্চর্য, এর জন্যই দিনের বেলা একটা লোককে... রাত্তির বেলা তাঁবুতে ঢুকে...এখানে এ রকম কাণ্ড...ঠিক আছে, চলুন এনকোয়ারি করে দেখা যাক—

পোস্ট অফিসে গিয়ে জানা গেল কাকাবাবু সেখানে টেলিগ্রাম করতে যাননি। অর্থাৎ, যা হবার তা আগেই হয়েছে। আমাদের তাঁবুতে তদন্ত করে পুলিশ বুঝতে পারলেন, সেখানে ঢুকে লণ্ডভণ্ড করা হয়েছে, কিন্তু অপরাধীর কোনো চিহ্ন পাওয়া গেল না। সুচা সিং-এর গ্যারেজে গিয়ে শোনা গেল, সুচা সিং বিশেষ কাজে মাটন্ গেছে, বিকেলেই ফিরবে। মীর্জা আলি হুকুম দিলেন সুচা সিং ফিরলেই যেন থানায় গিয়ে দেখা করে।

কিছুক্ষণ ঘোরাঘুরির পর গুরুবচ্চন সিং বললেন, আপনারা নিশ্চিন্ত থাকুন, আপনাদের কাকাবাবুকে নিশ্চয়ই খুঁজে বার করবো। মিঃ রায়চৌধুরীর সঙ্গে আমারও আলাপ হয়েছিল, খুব ভালো লোক—আমাদের সরকারের অনেকের সঙ্গে তাঁর চেনা জানা আছে, পহলগামে তাঁর কোনো বিপদ হবে, এতে পহলগামের বদনাম। সুচা সিং যদি দোষী হয়, তা হলে আমাদের হাত সে কিছুতেই এড়াতে পারবে না। শাস্তি পাবেই। আপনারা বিকেলে আবার খবর নেবেন। আমরা সব জায়গায় পুলিশকে খবর পাঠিয়ে দিচ্ছি।

পুলিশদের কাছ থেকে বিদায় নেবার পর সিদ্ধার্থদা আমাকে জিগ্যেস করলেন, সন্তু, সকাল থেকে কিছু

খেয়েছো? মুখ তো একেবারে শুকিয়ে গেছে। অত চিন্তা করো না!

সেই মিস্টির দোকানটায় ঢুকলাম। কাকাবাবুর সঙ্গে বাইরে যাবার সময় আমরা প্রত্যেকবার এখানে জিলিপি খেতাম। কাকাবাবু আজ নেই! কাকাবাবু কোথায় আছেন, কে জানে! আমার বুকের মধ্যে মুচড়ে উঠলো।

আমি সিদ্ধার্থদার দিকে এক দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলাম। কাকাবাবু বলেছিলেন, পাথরের মুণ্ডুটার কথা আমি যেন কোনো কারণেই কারুকে না বলি। সেইজন্য পুলিশকে বলিনি। কিন্তু সিদ্ধার্থদাকেও কি বলা যাবে না? সিদ্ধার্থদা তো আমাদের নিজেদের লোক। সিদ্ধার্থদার সাহায্য ছাড়া আমি একা কী করতে পারতাম? তাছাড়া, সিদ্ধার্থদা ইতিহাসের অধ্যাপক, উনি ঠিক মূল্য বুঝবেন।

আমি আস্তে আস্তে বললাম, সিদ্ধার্থদা, পুলিশকে সব কথা আমি বলিনি। আমাদের একটা দারুণ দামী জিনিস চুরি গেছে—

কী?

আমরা সম্রাট কনিষ্ক-র মুণ্ডু আবিষ্কার করে-ছিলাম।

কী বললে? কার মুণ্ডু?

আস্তে আস্তে সব ঘটনা খুলে বললাম সিদ্ধার্থ-দাকে। সিদ্ধার্থদা অবাক বিস্ময়ে শুনলেন সবটা। তারপর ছটফট করতে লাগলেন। বললেন, কী বলছো তুমি, সন্তু! এ যে একেবারে অবিশ্বাস্য ব্যাপার। ইতিহাসের দিক থেকে এর মূল্য যে কী দারুণ তা বলে বোঝানো যাবে না। কিন্তু সেটা এরকম ভাবে নষ্ট হয়ে যাবে? অসম্ভব! যে-কোনো উপায়েই হোক, ওটা বাঁচাতেই হবে।

দোকানের বিল মিটিয়ে দিয়ে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা আবার বললেন, তুমি ঠিক জানো, রাত্তিরবেলা সুচা সিং-ই ঢুকেছিল? সে-ই ওটা নিয়ে গেছে?

আমি জোর দিয়ে বললাম, আঙুল কাটা দেখেই আমি চিনেছি। তাছাড়া, ওটার কথা আর কেউ জানে না। সুচা সিংও জানতো না—ও কাঠের বাক্সটা খুলে দেখতে চেয়ে-ছিল, ওর ধারণা ওর মধ্যে দামী কিছু জিনিস আছে।

সুচা সিং ঐ একটা পাথরের মুখ নিয়ে কী করবে? ইতিহাস না জানলে, ওটার তো কোনো দামই নেই। সুচা সিং ওর মূল্য কী বুঝবে? সে নিতে চাইবেই বা কেন?

সেটা আমিও জানি না। কিন্তু সিদ্ধার্থদা, ওর সব সময় ধারণা, কাকাবাবু এখানে সোনার খোঁজ করতে এসেছেন। ওর সেই সোনার জন্য লোভ।

কিন্তু যখন বাক্সটা নিয়ে দেখবে, ওতে দামী কিছু নেই, সোনা তো নেই-ই, তখন নিশ্চয়ই কাকাবাবুকে ছেড়ে দেবে। শুধু শুধু তো কেউ কোনো মানুষকে মারে না বা আটকে রাখে না।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে সিদ্ধার্থদা আপনমনেই বললেন, শুধু পুলিশের ওপর নির্ভর করলেই হবে না। আমাদেরও খোঁজ করতে হবে। ঐ পাথরের মুণ্ডুটার মূল্য পুলিশও বুঝবে না। ওটাকে রক্ষা করতে না পারলে...সন্তু, তুমি কিছুক্ষণ একলা থাকতে পারবে? আমি একটু দেখে আসি—

না, সিদ্ধার্থদা, আমিও আপনার সঙ্গে যাবো। একলা থাকতে আমার ভয় করবে।

দিনের বেলা আবার ভয় কী?

না, আমি আপনার সঙ্গে যাবো। আচ্ছা, সিদ্ধার্থদা, এমন হতে পারে না যে সুচা সিং আসলে নিজের বাড়িতেই লুকিয়ে আছে। পুলিশকে ওর লোকেরা মিথ্যে কথা বলেছে?

তা মনে হয় না। পুলিশ তো যে-কোনো মুহূর্তেই সার্চ করতে পারে। তবু একবার গিয়ে দেখা যাক।

দু একটা দোকানদারকে জিগ্যেস করতেই সুচা সিং-এর বাড়িটা জানা গেল। বেশ বড় দোতলা বাড়ি, সামনে একটা ছোট্ট বাগান। বাগানে একজন মহিলা কাজ কর-ছিলেন। কাশ্মীরী মেয়ে—কী সরল আর শান্ত তাঁর মুখখানা। দুটি ফুটফুটে বাচ্চা ছেলে মেয়ে খেলা করছে। মহিলা বোধহয় সুচা সিং-এর স্ত্রী। সুচা সিং-এর কাশ্মীরী বউ, সেকথা শুনেছিলাম। বাড়িটা দেখলে মনে হয় না—এটা কোনো বদমাইস লোকের বাড়ি।

সিদ্ধার্থদা কাছে এগিয়ে গিয়ে মহিলাকে খুব বিনীতভাবে জিগ্যেস করলেন, বহিনজী, সুচা সিং বাড়িতে আছেন কি? আমাদের একটা গাড়ি ভাড়া করা খুব দরকার।

মহিলা বললেন, না, উনি তো বাড়ি নেই। গাড়ি ভাড়া নিতে হলে আপনারা গ্যারেজে গিয়ে দেখতে পারেন।

গ্যারেজে খালি গাড়ি নেই। একটা মাত্র আছে—কিন্তু সিংজীর হুকুম ছাড়া সেটা পাওয়া যাবে না।

কিন্তু উনি তো পহলগামে নেই এখন!

সিদ্ধার্থদা মুখ কাচুমাচু করে বললেন, আমাদের খুব দরকার ছিল। খুব দূরে কোথাও গেছেন কি?

খুব দূরে নয়। দেওগির গাঁয়ে আমাদের একটা বাড়ি

আছে, সেখানে গেলেন কাল। কবে ফিরবেন, বলেননি।

দেওগির গ্রামটা কোথায় যেন? মাটন-এর কাছেই না?

না, ওদিকে তো নয়। সোনমার্গের রাস্তায়। লীদার নদী ছাড়িয়ে বাঁ দিকে গেলেই।

হ্যাঁ, হ্যাঁ নাম শুনেছি। দেওগির তো খুব সুন্দর জায়গা! সিদ্ধার্থদা রীতিমতন গল্প জমিয়ে নিলেন। ছেলেমেয়ে দুটো আমাদের কাছে এসে বড় বড় টানা টানা চোখ মেলে তাকিয়ে রইলো আমাদের দিকে।

আমার মনে হলো, মানুষের লোভ জিনিসটা কী বিচ্ছিরি! সুচা সিং-এর এই তো এত সুন্দর বাড়ি, আট-ন খানা গাড়ি ব্যবসায় খাটাচ্ছে—তবু সোনার জন্য কী লোভ! সোনার লোভেই কাকাবাবুকে আটকে রেখেছে কোথাও। কাল রাত্তিরে আমাদের তাঁবুতে চুরি করতে গিয়েছিল। পুলিশে যখন ওকে ধরে ফাঁসি দেবে, তখন ছেলেমেয়ে-গুলো কাঁদবে কী রকম! শুনেছি আগেকার দিনে কাশ্মীরে কেউ চুরি করলে তার নাক বা কান বা হাত কেটে দিত।

ঐ বাড়ি থেকে চলে আসার পর সিদ্ধার্থদা বললেন, সন্তু, একবার দেওগির গিয়ে দেখবে নাকি? সুচা সিং-এর বউকে সরল মনে হলো, বোধহয় মিথ্যে কথা বলেনি।

পুলিশের কাছে জানাবেন না?

হ্যাঁ, জানাবো। ওরা যদি গা না করে আমরা নিজেরাই গিয়ে দেখে আসবো একবার।

পুলিশের লোকেরা বললেন, আপনারা এত ধৈর্য হারাচ্ছেন কেন? আজ সন্ধে পর্যন্ত অপেক্ষা করে দেখুন। মীর্জা আলি বললেন, সুচা সিংকে কালকেই আপনাদের সামনে হাজির করাবো, কোনো চিন্তা নেই। গুরুবচ্চন সিং বললেন, কী খোকাবাবু, আংকল-এর জন্য মন কেমন করছে?

থানা থেকে বেরিয়ে এসে সিদ্ধার্থদা বললেন, চল আমরা নিজেরাই যাই। একটা গাড়ি ভাড়া করতে হবে। কিছুতেই আর গাড়ি পাওয়া যায় না। এখন পুরো সীজন্-এর সময়, গাড়ির খুব টানাটানি। শেষ পর্যন্ত একটা গাড়ি পাওয়া গেল, কিন্তু সেটা আমাদের নামিয়ে দিয়েই চলে আসবে। সিদ্ধার্থদা এত ব্যস্ত হয়ে গেছেন যে তাতেই রাজী হয়ে গেলেন। আমাকে বললেন, ফেরার সময় যা হোক একটা ব্যবস্থা হয়ে যাবেই! কী বলো, সন্তু?

দেওগির গ্রামের কাছাকাছি বড় রাস্তায় আমরা গাড়িটা ছেড়ে দিলাম। জায়গাটা ভীষণ নির্জন। রাস্তায় একটাও মানুষ নেই। রাস্তার দু পাশে ঘন গাছপালা। ফুল ফুটে আছে অজস্র। ময়না আর বুলবুলি পাখি উড়ে যাচ্ছে ঝাঁক বেঁধে। কাছ দিয়েই বয়ে যাচ্ছে একটা সরু ঝর্ণা, তার জলের কল্‌কল্‌ শব্দ শোনা যায় একটানা।

দুজনে মিলে হাঁটতে লাগলাম কিছুক্ষণ। সুচা সিং-এর বাড়িটা কী করে খুঁজে পাওয়া যাবে বুঝতে পারছি না। কারুকে জিগ্যেস করারও উপায় নেই। খানিকটা বাদে হঠাৎ আমি রাস্তার পাশে একটা জিনিস দেখে ছুটে গেলাম। কাকাবাবুর একটা ক্রাচ পড়ে আছে। আমার শরীরটা কী রকম দুর্বল হয়ে গেল, চোখ জ্বালা করে উঠলো। কাকাবাবু তো ক্রাচ ছাড়া কোথাও যান না। এটা এখানে পড়ে কেন? তাহলে কি কাকাবাবুকে ওরা...

সিদ্ধার্থদা সেটা দেখে বললেন, এটা তো অন্য কারুরও হতে পারে। ক্রাচ তো এক রকমই হয়। সন্তু, তুমি ঠিক চিনতে পারছো?

হ্যাঁ, সিদ্ধার্থদা। কোনো ভুল নেই। এই যে মাঝ-খানটায় খানিকটা ঘষটানো দাগ! সিদ্ধার্থদা, কী হবে?

আরে, তুমি আগেই ভয় পাচ্ছো কেন? পুরুষ মানুষকে অত দুর্বল হতে নেই। শেষ না-দেখা পর্যন্ত কোনো জিনিস মেনে নেবে না। একখানা ক্রাচ পড়ে আছে, আর একটা কোথায় গেল?

আর একটা কাছাকাছি কোথাও পাওয়া গেল না। সিদ্ধার্থদা সেটাকে তুলে হাতে রাখলেন। তারপর বললেন, আর একটা ব্যাপারও হতে পারে। কাকাবাবু হয়তো ইচ্ছে করেই এটা ফেলে দিয়েছেন—চিহ্ন রাখবার জন্য। পাশ দিয়ে এই যে সরু রাস্তাটা গেছে, চলো, এইটা দিয়ে গিয়ে দেখা যাক্।

সেই রাস্তাটা দিয়ে একটু দূরে যেতেই একটা বাড়ি চোখে পড়লো। দোতলা কাঠের বাড়ি। কোনো মানুষ-জন দেখা যাচ্ছে না। সাবধানে আমরা এগোলাম বাড়িটার দিকে। সিদ্ধার্থদা খুব সাবধানে তাকাচ্ছেন চারদিকে। হঠাৎ আমার কাঁধ চেপে ধরে সিদ্ধার্থদা বললেন, ঐ দ্যাখো বলেছিলুম, না? ঐ যে আর একটা ক্রাচ।

একটা গোলাপের ঝোপের পাশে দ্বিতীয় ক্রাচটা পড়ে আছে। সিদ্ধার্থদা সেটাও তুলে নিলেন। আর কোনো সন্দেহ নেই। ঠিক জায়গাতেই এসে গেছি।

সিদ্ধার্থদা মুখখানা কঠিন করে বললেন, হুঁ, একটা লোককে লুকিয়ে রাখার পক্ষে বেশ ভালো জায়গা! কেউ টের পাবে না।

আমি ফিসফিস করে বললাম, সিদ্ধার্থদা, এখন ফিরে গিয়ে চট করে পুলিশ ডেকে আনলে হয় না?

এখন পুলিশ ডাকতে যাবো? ততক্ষণে ওরা যদি

পালায়? এসেছি যখন, শেষ না দেখে যাবো না।

কিন্তু ওরা যদি অনেক লোক থাকে?

তুমি ভয় পাচ্ছো নাকি সন্তু?

না, না, ভয় পাইনি—

ক্রাচ দুটো দুজনের হাতে থাক। বেশ শক্ত আছে, দরকার হলে কাজে লাগবে।

কয়েকটা গাছের আড়ালে আমরা কিছুক্ষণ লুকিয়ে রইলাম। বাড়িটাতে একটাও মানুষ দেখা যাচ্ছে না। সোজা কাঠের সিঁড়ি উঠে গেছে দোতলায়। পাশাপাশি তিনখানা ঘর, তার মধ্যে ডানদিকের কোণের ঘরটা তালা-বন্ধ। আমি বললাম, হয়তো সবাই এখান থেকে আবার অন্য কোথাও চলে গেছে।

সিদ্ধার্থদা গম্ভীরভাবে বললেন, তা হতেও পারে। কিন্তু না দেখে তো যাওয়া যায় না।

সিদ্ধার্থদা, প্রায় সন্ধে হয়ে আসছে। এরপর আমরা ফিরবোই বা কী করে?

সে ভাবনা পরে হবে। ফিরতে না পারি ফিরবো না। কনিষ্কর মাথাটা আমি একবার অন্তত দেখবোই।

একটু সন্ধে হতেই আমরা গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে এলাম। এখনও কারুর দেখা নেই। পা টিপে টিপে উঠে গেলাম কাঠের সিঁড়ি দিয়ে। সিঁড়ির পাশের ঘরটাই তালাবন্ধ, পাশের জানলা দিয়ে ভেতরে উঁকি মারলাম। অন্ধকার, ভালো দেখা যায় না। মনে হলো যেন একটা চৌপাই-তে একজন মানুষ শুয়ে আছে। চোখে অন্ধকার একটু সয়ে যেতেই চিনতে পারলাম—কাকাবাবু!

সিদ্ধার্থদা ঠোঁটে আঙুল দিয়ে ইশারায় বললেন, চুপ!

তারপর তালাটা নেড়েচেড়ে দেখলেন। তালাটা পেল্লায় বড়। সিদ্ধার্থদা বললেন, তালাটা বড় হলেও বেশী মজবুত নয়। সস্তা কোম্পানীর তৈরী। আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি, ওরা এরকম একটা বাজে তালা লাগিয়ে রেখেছে কেন! বাড়িতেও আর কেউ নেই মনে হচ্ছে।

সিদ্ধার্থদা ক্রাচের সরু দিকটা ঢুকিয়ে দিলেন তালাটার মধ্যে। তারপর খুব জোরে একটা হ্যাঁচকা টান দিতেই তালাটা খুলে এলো।

সিদ্ধার্থদা বললেন, দেখে কি মনে হচ্ছে, আমার তালা ভাঙার প্র্যাকটিস আছে? আমি কিন্তু জীবনে এই প্রথম তালা ভাঙলাম।

ততক্ষণে আমি দরজাটা ঠেলে খুলে ফেলেছি। ফিসফিস করে ডাকলাম, কাকাবাবু, কাকাবাবু!

সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথায় একটা প্রচণ্ড ধাক্কা লাগলো। আমি ছিটকে পড়লাম ঘরের মধ্যে। সিদ্ধার্থদাও পড়লেন এসে আমার পাশে। দড়াম করে দরজাটা বন্ধ হয়ে গেল।

সিদ্ধার্থদা প্রথম আঘাতটা সামলে নিয়েই চট করে উঠে দাঁড়ালেন। ছুটে গিয়ে টেনে দরজাটা খোলার চেষ্টা করলেন। পারলেন না। ধাক্কাধাক্কি করে নিরাশ হয়ে ফিরে এলেন।

কাকাবাবু ততক্ষণ উঠে বসেছেন। শান্তভাবে বললেন, তোমরা আবার এরকম বিপদের ঝুঁকি নিলে কেন?

আমি দেখলাম কাকাবাবুর ডান হাতে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা। ছুটে গিয়ে কাকাবাবুর পাশে দাঁড়ালাম। জিগ্যেস করলাম, তোমাকে মেরেছে ওরা?

কাকাবাবু বললেন, ও কিছু না। তোমরা নিজেরা না এসে পুলিশকে খবর দিলে পারতে। এরা বিপজ্জনক লোক।

সিদ্ধার্থদা বেশ জোরে চেঁচিয়ে বললেন, হ্যাঁ, আমরা পুলিশকে খবর দিয়েছি। পুলিশ আমাদের পেছন পেছনেই আসছে।

জানলার বাইরে একটা হাসির আওয়াজ শোনা গেল। জানলায় দেখলাম সুচা সিং-এর বিরাট মুখ। সুচা সিং প্রথমেই বললেন...। না, বললেন না, বললো। ওকে আমি মোটেই আর আপনি বলবো না। একটা ডাকাত, গুণ্ডা! আমার কাকাবাবুকে মেরেছে!

সুচা সিং বললো, কী খোকাবাবু, তোমার বেশী লাগে নি তো? একটা ছোট্ট ধাক্কা দিয়েছি।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আমার কিন্তু খুব জোরে লেগেছে। আমাকে কী দিয়ে মারলে? লাঠি দিয়ে? অত-বড় চেহারাটা নিয়ে লুকিয়ে ছিলে কোথায়?

সুচা সিং বললো, এই ছোকরাটি কে খোকাবাবু? একে তো আগে দেখিনি।

আমি কিছু বলার আগেই সিদ্ধার্থদা বলে উঠলেন, আরো অনেককে দেখবে। পুলিশ আসছে একটু পরেই।

সুচা সিং আবার হেসে উঠলো। হাসতে হাসতে বললো, আসুক, আসুক! অনেক জায়গা আছে এ বাড়িতে। খানাপিনা করুন, আরামসে থাকুন, কই বাত নেই! রাত্তিরে শীত লাগলে কম্বল নিয়ে নেবেন—ঐ খাটের নিচে অনেক কম্বল আছে।

কাকাবাবু বললেন, সুচা সিং, তুমি আমাদের শুধু শুধু আটকে রেখেছো। আমাদের ছেড়ে দাও।

প্রোফেসারসাব, আপনাকে ছেড়ে দিতে কি আমার আপত্তি আছে? আপনাকে এক্ষুনি ছেড়ে দিতে পারি। আপনি আমার কথাটা শুনুন।

তোমার ধারণা ভুল। আমি সোনার খবর জানি না।

ঠিক আছে। এখন আপনার নিজের লোক এসে গেছে, বাতচিত করুন। দেখুন, যদি আপনার মত পাল্টায়—

সুচা সিং, পাথরের মুণ্ডুটা আমার কাছে দিয়ে যাও। ওটা যেন কোনোরকমে নষ্ট না হয়। ওটা তোমার কোনো কাজে লাগবে না—

ঠিক থাকবে, সব ঠিক থাকবে।

'তোমাকে আমি ছাড়বো না!'

সুচা সিং জানলা থেকে সরে যাবার পর কাকাবাবু একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন, লোকটা পাগল হয়ে গেছে! একটা পাগলের জন্য আমার এত পরিশ্রম হয়তো নষ্ট হয়ে যাবে।

আমরা কাছে এসে কাকাবাবুর পাশে খাটের ওপর বসলাম। আমি জিগ্যেস করলাম, কাকাবাবু, তোমাকে কী করে নিয়ে এলো এখানে?

আমাকে ধরে আনা খুবই সহজ। আমি তো দৌড়োতেও পারি না, মারামারিও করতে পারি না। পোস্ট অফিসের দিকে যাচ্ছিলাম, একটা গাড়ি আসছিল আমার গা ঘেঁষে। দুটো লোক তার থেকে নেমে আমার পাশ দিয়ে হাঁটতে হাঁটতে হঠাৎ জোর করে চেপে ধরে গাড়িতে তুলে নিল। ঐখানে রাস্তাটা নির্জন, সকালে বিশেষ লোকও থাকে না—

গাড়িতে করে সোজা এখানে নিয়ে এলো?

না। কাল সারাদিন রেখে দিয়েছিল ওদের গ্যারেজের পেছনে একটা ঘরে। সূচা সিং-এর বদ্ধমূল বিশ্বাস হয়ে গেছে, আমি কোনো গুপ্তধন কিংবা সোনার খনি আবিষ্কার করেছি। সেই যে কাঠের বাক্সটা ওকে দেখতে দিইনি, তাতেই ওর সন্দেহ হয়েছে। এমনিতে ও আমার সঙ্গে বিশেষ কিছু খারাপ ব্যবহার করেনি শুধু বারবার এক কথা—ওকে আমি সন্ধান বলে দিলে ও আমাকে আধা বখরা দেবে।

সিদ্ধার্থদা জিগ্যেস করলেন, আপনার হাতে লাগলো কী করে?

একবার শুধু ওর একজন সঙ্গী আমার হাতে গরম লোহার ছ্যাঁকা দিয়ে দিয়েছে। সূচা সিং বলেছিল কাছে এনে ভয় দেখাতে, লোকটা সত্যি সত্যি ছ্যাঁকা লাগিয়ে দিল। সূচা সিং তখন বকলো লোকটাকে। ভোরবেলা আমাকে নিয়ে এসেছে এই বাড়িতে।

কিন্তু আপনাদের তাঁবু লণ্ডভণ্ড করেও তো ও কিছুই খুঁজে পায়নি। পাথরের মূর্তিটা দেখে ও তো কিছুই বুঝবে না। তাহলে এখনও আটকে রেখেছে কেন?

বললাম না, ও পাগলের মতন ব্যবহার করছে। মুণ্ডুটার ভেতর দিকে কতকগুলো অক্ষর লেখা আছে। ওর ধারণা ওর মধ্যেই আছে গুপ্তধনের সন্ধান। সিনেমা-টিনেমায় যে রকম দেখা যায় অনেক সময়! বিশেষত, মূর্তিটার জন্য আমার এত ব্যাকুলতাই ওর প্রধান সন্দেহের কারণ। আমার সামনে ও মুণ্ডুটা আছাড় মেরে ভেঙে ফেলতে গিয়েছিল, আমি ওর পা জড়িয়ে ধরেছিলাম!

সিদ্ধার্থদা বললেন, ও যদি মুণ্ডুটার কোনো ক্ষতি করে, আমি ওকে খুন করে ফেলবো!

কাকাবাবু বললেন, ওকে দমন করার কোনো সাধ্য আমাদের নেই। ওর সঙ্গে আরও দু লোক আছে।

সিদ্ধার্থদা জানলার কাছে গিয়ে সিকগুলো পরীক্ষা করে দেখলেন। তারপর বললেন. জানলাটা ভাঙা বোধহয় খুব শক্ত হবে না। আমরা চেষ্টা করলে এখান থেকে পালাতে পারি।

কাকাবাবু বিষণ্ণ ভাবে বললেন ঐ মুণ্ডুটা ফেলে আমি কিছুতেই যাবো না। তার বদলে আমি মরতেও রাজী আছি। তোমরা বরং যাও—

কাকাবাবুকে ফেলে যে আমরা কেউ যাবো না, তা তো বোঝাই যায়। সিদ্ধার্থদা ওভারকোট খুলে ভালো করে বসলেন। স্নিগ্ধাদি আর রিণি এতক্ষণে শ্রীনগরে পৌঁছে নিশ্চয়ই খুব দুশ্চিন্তা করছে। আমরা কবে এখান থেকে ছাড়া পাবো, কোনো ঠিক নেই। কিংবা কোনো দিন ছাড়া পাবো কি না—

একটু রাত হলে সূচা সিং দরজা খুলে ঘরে ঢুকলো। তার সঙ্গে আরও দুজন লোক। একজনের হাতে একটা মস্ত বড় ছুরি, অন্যজনের হাতে খাবার দাবার। সূচা সিং বললো, কী প্রোফেসারসাব, মত বদলালো?

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, সিংজী, তোমাকে সত্যিই বলছি, আমি কোনো গুপ্তধনের খবর জানি না!

সূচা সিং ঠোঁট বাঁকিয়ে হেসে বললো, আপনারা বাঙালীরা বড্ড ধড়িবাজ! এত টাকা পয়সা খরচ করে, এত কষ্ট করে আপনি শুধু ঐ মুণ্ডুটা খুঁজতে এসেছিলেন? এই কথা আমি বিশ্বাস করবো?

ওটার জন্য আসিনি। এমনি হঠাৎ পেয়ে গেলাম।

ঠিক আছে, ওটা কোথায় পেয়েছেন, সে কথা আমাকে বলুন। ওটা কীসের মুণ্ডু? কোনো দেওতার মুণ্ডু? আপনারা যেখানে গিয়েছিলেন সেখানে কোনো মন্দির নেই, আমি খোঁজ নিয়েছি। ওখানে পাথরের মুণ্ডু এলো কোথা থেকে? বাকি মূর্তিটা কোথায়? বলুন সে কথা!

ওকে কিছুতেই বোঝানো যাবে না ভেবে কাকাবাবু চুপ করলেন। সিদ্ধার্থদা তেজের সঙ্গে বললেন, আমরা ওটা যেখান থেকেই পাই না কেন? তার জন্য তুমি আমাদের আটকে রাখবে? দেশে আইন নেই? পুলিশের হাত থেকে তুমি বাঁচতে পারবে?

সূচা সিং-এর সঙ্গী ছুরিটা উঁচু করলো। সূচা সিং তাকে হাত দিয়ে বারণ করে বললো, আমাকে পুলিশের ভয় দেখিও না। চুপচাপ থাকো। আমি শুধু প্রোফে-সারের সঙ্গে কথা বলছি!

কাকাবাবু বললেন, আমার আর কিছু বলার নেই!

খাবার রেখে ওরা চলে গেল। আমাদের বেশ খিদে পেয়েছিল। সিদ্ধার্থদা ঢাকনাগুলো খুলে চমকে গিয়ে বললেন, আরে, বাস! খাবারগুলো তো দারুণ দিয়েছে! বন্দী করে রেখে কেউ এরকম খাবার দেয় কখনো শুনিনি!

বড় বড় বাটিতে করে বিরিয়ানি, ডিম ভাজা, মুরগীর মাংস, চিঁড়ের পায়েস রাখা আছে। দেখেই আমার খিদে বেড়ে গেল। সিদ্ধার্থদা তিনজনের জন্য ভাগ করে দিলেন। আমি সবে মুখে তুলতে গেছি, সিদ্ধার্থদা বললেন, খাচ্ছো যে, যদি বিষ মেশানো থাকে?

শুনেই আমি ভয় পেয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে নিলাম। কাকাবাবু বললেন, সূচা সিং সে-রকম কিছু করবে বলে মনে হয় না। তবু সাবধানের মার নেই। তোমরা আগে খেয়ো না আমি খেয়ে দেখছি প্রথমে। আমি বুড়ো মানুষ, আমি মরলেও ক্ষতি নেই!

সিদ্ধার্থদা হাসতে হাসতে বললেন, বিষ মেশানো থাক আর যাই থাক এ রকম চমৎকার খাবার চোখের সামনে রেখে আমি না খেয়ে থাকতে পারবো না।

টপ করে একটা মাংস তুলে কামড় বসিয়ে সিদ্ধার্থদা বললেন, বাঃ, গ্র্যাণ্ড! এ রকম খাবার পেলে আমি অনেক-দিন এখানে থাকতে রাজী আছি!

সত্যিই যদি আমাদের এখানে অনেকদিন থাকতে হয়, তাহলে স্নিগ্ধাদি আর রিণির কী হবে? সিদ্ধার্থদার যেন সেজন্য কোনো চিন্তাই নেই।

খাওয়া দাওয়া শেষ করে আমরা বিছানা পেতে ফেললাম। খাটের তলায় আট-দশটা কম্বল রাখা ছিল! কম্বলগুলো বেশ নোংরা, কিন্তু উপায় তো নেই।

ভোরবেলা উঠেই সিদ্ধার্থদা বিছানার পাশে হাত বাড়িয়ে বললেন, কই. এখনো চা দেয়নি?

সকালবেলা বেড-টি খাওয়ার অভ্যেস, সিদ্ধার্থদা বোধহয় ভেবেছিলেন হোটেলের ঘরে শুয়ে আছেন। ধড়মড় করে উঠে বসে সিদ্ধার্থদা বললেন, ব্যাটারা আচ্ছা অভদ্র তো, এখনো চা দেয় না কেন? দরজার কাছে গিয়ে দুম দুম করে ধাক্কা দিয়ে চেঁচিয়ে বললেন, কই হ্যায়? চা লে আও!

আমি বললাম, ওরা বোধহয় চা খায় না।

সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই খায়! পাঞ্জাবীরা বাঙালীদের মতনই চা খেতে খুব ভালোবাসে।

কিন্তু কারুর কোনো সাড়া শব্দ পাওয়া গেল না। চা তো দূরের কথা, সকালবেলা কেউ কোনো খাবারও দিতে এলো না। কাল রাত্তিরে অত খাইয়ে হঠাৎ আজ সকাল-

বেলা এই ব্যবহার! ভাগ্যিস ঘরটার সঙ্গে একটা ছোট বাথরুম ছিল, নইলে আমাদের আরও অসুবিধে হতো।

সিদ্ধার্থদা খানিকটা বাদে ধৈর্য হারিয়ে সিক ধরে টানাটানি করছিলেন, এমন সময় একটা গাড়ি থামার আওয়াজ শোনা গেল। সিদ্ধার্থদা বললেন, নিশ্চয়ই পুলিশের গাড়ি। আমিও ছুটে গেলাম জানলার কাছে। কাকাবাবু নিশ্চল হয়ে বসে রইলেন খাটে। সকাল থেকে কাকাবাবু একটাও কথা বলেননি।

আমাদের নিরাশ করে গাড়ি থেকে নামলো সুচা সিং আর একটা লোক। সুচা সিং একা গট গট করে উঠে এলো ওপরে। তার হাতে সেই মহামূল্যবান কাঠের বাক্সটা।

সিদ্ধার্থদা হালকা ভাবে বললেন, কী সিংজী, সকাল-বেলা কোথায় গিয়েছিলে? আমাদের চা খাওয়ালে না?

সুচা সিং কঠোরভাবে বললো, জানলাসে হঠ্ যাও! আমি প্রোফেসারের সঙ্গে কথা বলবো!

তারপর সে কাঠের বাক্স খুলে কনিষ্কর মুখটা দু আঙুলে তুলে উঁচু করে বললো, কী প্রোফেসারসাব, কিছু ঠিক করলেন?

কাকাবাবু পাথরের মুখটার দিকে এক দৃষ্টে চেয়ে কাঁপা কাঁপা গলায় বললেন, সিংজী, ঈশ্বরের নামে অনুরোধ করছি, তুমি ওটাকে ও ভাবে ধরো না। সাবধানে ধরো। ওটা ভেঙে গেলে আমার জীবনটাই নষ্ট হয়ে যাবে!

বটে! বটে! এটার তাহলে অনেক দাম!

সিংজী, তুমি ওটা ফেরত দাও, তোমাকে তার বদলে আমি পাঁচ হাজার টাকা দেবো। তার বেশী দেবার সামর্থ্য আমার নেই।

পাঁচ হাজার? একটা পাথরের মুন্ডুর দাম পাঁচ হাজার! এ রকম পাথরকা চীজ তো হামেশা পাওয়া যায়। আপনি পাঁচ হাজার রুপিয়া দিতে চাইছেন! তাহলে এক লাখ রুপিয়ার কম আমি ছাড়বো না!

এক লাখ টাকা আমার নেই, থাকলে দিতাম। ও মূর্তিটার বাজারে কোনো দাম নেই। আমার কাছেই শুধু ওর দাম।

ওসব চালাকি ছাড়ুন। খাঁটি কথাটা কী, বলুন!

সিদ্ধার্থদা জানলা দিয়ে হাত বাড়িয়ে খপ্ করে পাথরের মুখটা, চেপে ধরলেন। তারপর বললেন, ছাড়বো না কিছুতেই ছাড়বো না।

কাকাবাবু ভয় পেয়ে চেঁচিয়ে উঠলেন, সিদ্ধার্থ ছেড়ে দাও, শিগগির ছেড়ে দাও! ভেঙে যাবে! ওটা তবু ওর কাছেই থাকুক!

সুচা সিং দু হাতে চেপে ধরেছে সিদ্ধার্থদার হাত। আস্তে আস্তে পাথরের মুখটা ছাড়িয়ে নিয়ে কাঠের বাক্সে রাখলো। তারপর সিদ্ধার্থদার হাতটা ধরে মোচড়াতে লাগলো। সিদ্ধার্থদা যন্ত্রণায় মুখ কুঁচকে ফেললেন। হাতটা বোধহয় ভেঙেই যাবে। আমি কাঁদো-কাঁদো মুখে সুচা সিংকে অনুরোধ করলাম, ছেড়ে দিন! ও'কে ছেড়ে দিন! আর কখনো এ রকম করবে না—

সুচা সিং ঠোঁট বেঁকিয়ে বললো, বেতমীজ! আমার সঙ্গে জোর দেখাতে যায়! খুলে নেবো হাতখানা?

যন্ত্রণায় সিদ্ধার্থদার মুখ কুঁকড়ে যাচ্ছে, কিন্তু গলা দিয়ে একটা আওয়াজ বার করলেন না। শেষ পর্যন্ত সুচা সিং এক ধাক্কা দিয়ে সিদ্ধার্থকে মেঝেতে ফেলে দিল। তারপর কর্কশ গলায় বললো, প্রোফেসার, শুনলে না আমার কথা। তাহলে থাকো এখানে! আমি জম্মুতে চললাম, ওখানে আমার এক দোস্ত্ পাত্থরের দোকানদার, তাকে দেখাবো জিনিসটা! তোমাদের মারবো না—কাল আমার লোক এসে তোমাদের ছেড়ে দেবে।

সুচা সিং গটমট করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গিয়ে গাড়িটাতে উঠলো। কাকাবাবুও নেমে এসে জানলার পাশে দাঁড়িয়েছেন। গাড়িটা ছাড়ার পর সুচা সিং আমাদের দিকে তাকিয়ে দাঁত বার করে হাসলো। তারপর চলে গেল হুশ করে!

গাড়িটা চলে যাওয়া মাত্র কাকাবাবু অত্যন্ত ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। সিদ্ধার্থদার পাশে বসে পড়ে ব্যাকুলভাবে জিগ্যেস করলেন, সিদ্ধার্থ, তোমার হাত ভাঙেনি তো?

সিদ্ধার্থদা উঠে বসে বললেন, না, ভাঙেনি বোধহয় শেষ পর্যন্ত! শয়তানটাকে আমি শেষ পর্যন্ত শিক্ষা দেবোই। এর প্রতিশোধ যদি আমি না নিই—

শোনো, এখন এক মিনিটও সময় নষ্ট করার উপায় নেই। শিগগির ওঠো! দরজা ভাঙতে হবে—

কাকাবাবু নিজেই খোঁড়া পা নিয়ে ছুটে গিয়ে দরজার গায়ে জোরে ধাক্কা দিলেন। পুরু কাঠের দরজা—কেঁপে উঠলো শুধু। সিদ্ধার্থদা উঠে এসে বললেন, কাকাবাবু, আপনি সরুন, আমি দেখছি!

না, না, এসো, আমরা তিনজনে মিলেই এক সঙ্গে ধাক্কা দিই—

সিদ্ধার্থদার দেখাদেখি আমিও অনেকটা ছুটে গিয়ে ধাক্কা দিলাম দরজায়। প্রত্যেকবার শব্দ হচ্ছে প্রচণ্ড জোরে। কাকাবাবু বললেন, হোক শব্দ, তাই শুনে যদি কেউ আসে তো ভালোই!

কেউ এলো না। আমরা পরপর ধাক্কা দিয়ে যেতে লাগলাম। বেশ খানিকটা বাদে একটা পাল্লায় একটু ফাটল দেখা দিল, তাই দেখে আমাদের উৎসাহ হয়ে গেল দ্বিগুণ। শেষ পর্যন্ত যে আমরা দরজাটা ভেঙে ফেলতে পারলাম, সেটা শুধু গায়ের জোরে নয়, মনের জোরে।

ঘর থেকে বেরিয়েই কাকাবাবু বললেন, আমি দৌড়োতে পারবো না, তোমরা দুজন দৌড়ে যাও। বড় রাস্তায় গিয়ে যে-কোনো একটা গাড়ি থামাবার চেষ্টা করো! যে-কোনো উপায়ে থামানো চাই। আমি আসছি। পরে—

প্রথমে একটা প্রাইভেট গাড়িকে থামাবার চেষ্টা করলাম। কিছুতেই থামলো না। আর একটু হলে আমা-দের চাপা দিয়ে চলে যেত। তারপর একটা বাস। এখানকার বাস মাঝরাস্তায় কিছুতেই থামে না। বেশ কিছুক্ষণ আর কোনো গাড়ি নেই। ততক্ষণে কাকাবাবু এসে পৌঁছেছেন। এবার দূর থেকে একটা জিপ আসতে দেখা গেল। কাকাবাবু বললেন, এসো, সবাই মিলে রাস্তার মাঝখানে পাশাপাশি দাঁড়াই। এটাকে থামাতেই হবে।

জিপটা প্রচণ্ড জোরে হর্ণ দিতে দিতে কাছাকাছি এসে গেল। সিদ্ধার্থদা হতাশ ভাবে বললেন, এটা মিলি-টারির জিপ। এরা কিছুতেই থামে না।

কাকাবাবু জোর দিয়ে বললেন, থামতেই হবে। না হলে চাপা দেয় দিক!

জিপটা আমাদের একেবারে সামনে এসে থেমে গেল। একজন অফিসার রুক্ষভাবে বললেন, হোয়াট্স দ্য ম্যাটার জেন্টেলমেন?

কাকাবাবু এগিয়ে গেলেন। অফিসারটির পোশাকের চিহ্ন দেখে বললেন, আপনি তো একজন কর্নেল? শুনুন

করনেল, আপনাকে আমাদের সাহায্য করতেই হবে। একটুও সময় নেই!

তারপর কাকাবাবু যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ব্যাপারটার গুরুত্ব বুঝিয়ে দিলেন, মনোযোগ দিয়ে শুনলেন করনেল। তারপর বললেন, হুঁ, বুঝতে পারছি। কিন্তু আমার করার নেই। আমাকে জরুরী কাজে যেতে হচ্ছে।

কাকাবাবু গাড়ির সামনে পথ জুড়ে দাঁড়িয়ে বললেন, যতই জরুরী কাজ থাক, আপনাকে যেতেই হবে।

কাকাবাবু গভর্নমেন্টের এক গাদা বড় বড় অফিসার, মিলিটারির অফিসারের নাম বললেন। করনেল বললেন, আপনি ওসব যতই নাম বলুন, আমার মিলিটারি ডিউটির সময় আমি অন্য কারুর কথা শুনতে বাধ্য নই।

কাকাবাবু হাত জোড় করে বললেন, মিলিটারি হিসেবে নয়, আপনাকে আমার দেশের একজন মানুষ হিসেবে আমি অনুরোধ জানাচ্ছি!

করনেল একটুক্ষণ ভ্রূ কুঁচকে বসে রইলেন। তারপর বললেন, ঠিক আছে, গেট ইন্!

আমরা উঠে পড়তেই গাড়ি চললো ফুল স্পীডে। করনেল পুরো ব্যাপারটা আবার শুনলেন। তারপর বললেন, ইতিহাস সম্পর্কে আমারও ইন্টরেস্ট আছে। সত্যি, এটা একটা মস্ত বড় আবিষ্কার। এটা নষ্ট হলে খুবই দুঃখের ব্যাপার হবে।

করনেলের নাম রণজিৎ দত্তা। বাঙালী নয়, পাঞ্জাবী। প্রথমে তিনি আমাদের নিতে রাজী হচ্ছিলেন না, পরে কিন্তু বেশ উৎসাহ পেয়ে গেলেন। ওঁর কাছেও এটা একটা অ্যাডভেঞ্চার।

গাড়ি এত জোরে যাচ্ছে যে হাওয়ায় কোনো কথা শোনা যাচ্ছে না। চেঁচিয়ে কথা বলতে হচ্ছে। করনেল বললেন, ওদের গাড়ি অনেক দূরে চলে গেছে। পাহাড়ী রাস্তায় একটা মুস্কিল কোনো গাড়িকে ওভারটেক করা যায় না। মাঝখানে যে-সব গাড়ি পড়েছে তাদের পার হবো কী করে?

কাকাবাবু বললেন, উপায় একটা বার করতেই হবে।

সিদ্ধার্থদা বললেন, একটা উপায় আছে। উল্টো দিকের গাড়িকে পাশ দেবার জন্য মাঝে মাঝে যে কয়েক জায়গায় খানিকটা করে কাটা আছে—

করনেল দত্তা বললেন, হ্যাঁ, সেটা একটা হতে পারে বটে। অবশ্য, যদি মাঝখানের গাড়িগুলো জায়গা দেয়।

আপনার মিলিটারির গাড়ি। আপনার গাড়ির হর্ণ শুনলে সবাই রাস্তা দেবে। আমাদের খুব ভাগ্য যে আপনাকে পেয়ে গেছি।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, সামনের গাড়ি দেখলেই দুবার করে জোরে হর্ণ দেবে। আপনারা সুচা সিং-এর গাড়ি চিনতে পারবেন তো?

আমি সঙ্গে সঙ্গে বললাম, হ্যাঁ, সাদা জীপ গাড়ি। নম্বরও আমি মুখস্থ করে রেখেছি।

সিদ্ধার্থদা আস্তে করে আমার পিঠ চাপড়ে দিয়েই উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠলেন। ওঁর ডান হাতে সাংঘাতিক ব্যথা এখনো।

পাহাড়ী রাস্তা এঁকে বেঁকে চলেছে। রাস্তাটা ওপরে উঠে গেলে নিচের রাস্তা স্পষ্ট দেখা যায়। একটু বাদেই আমরা যখন পাহাড়ের ওপর দিকে উঠছি পাহাড় পেরিয়ে নিচের দিকের রাস্তায় দেখতে পেলাম খেলনার মতন তিনটে গাড়ি। তার একটাকে বাস বলে চেনা যায়।

করনেল দূরবীন বার করলেন। আমাকে জিগ্যেস করলেন, গাড়ির নম্বরটা বলো তো, দেখি এর মধ্যে আছে কি না!

একটু দেখেই উত্তেজিত ভাবে বললেন, দ্যাটস ইট! ঐ তো সাদা জীপ!

আমরা সবাই উত্তেজনায় ছটফট করতে লাগলাম। এবার আর সুচা সিংকে কিছুতেই ছাড়া হবে না। কিন্তু পাহাড়ী রাস্তায় খুব জোরে তো গাড়ি চালানো যায় না, প্রত্যেক বাঁকে বাঁকে হর্ণ দিয়ে গতি কমিয়ে দিতে হয়। একদিকে অতলস্পর্শী খাদ, অন্যদিকে পাহাড়ের দেয়াল। খাদের নিচের দিকে তাকালে মাথা ঝিমঝিম করে। একটু আগে বৃষ্টি হয়েছে এক পশলা, ভিজে রাস্তা বেশী বিপজ্জনক।

কাকাবাবু হঠাৎ বলে উঠলেন, কী সুন্দর রামধনু উঠেছে দ্যাখো। এ পাশের সারাটা আকাশ জুড়ে আছে। অনেকদিন বাদে সম্পূর্ণ রামধনু দেখলাম—সাধারণত দেখা যায় না।

আমাদের চোখ নিচের রাস্তার সেই খেলনার মতন গাড়ির দিকে আবদ্ধ ছিল। সিদ্ধার্থদা অবাক হয়ে কাকাবাবুর দিকে ঘুরে জিগ্যেস করলেন, কাকাবাবু, আপনার এখন রামধনু দেখার মতন মনের অবস্থা আছে? আমি তো ধৈর্য রাখতে পারছি না!

কাকাবাবু শান্ত গলায় বললেন, মনকে বেশী চঞ্চল হতে দিতে নেই, তাতে কাজ নষ্ট হয়। দণ্ডকারণ্যে রাম যখন সীতাকে খুঁজতে বেরিয়েছিলেন, সেই সময়ও তিনি পম্পা সরোবরের সৌন্দর্য দেখে থমকে দাঁড়িয়েছিলেন।

করনেল ড্রাইভারকে বললেন, বাসটা কাছাকাছি এসে গেছে। হর্ণ দাও! হর্ণ দাও—দুবার!

বাসটা সহজেই আমাদের পথ ছেড়ে দিল। কিন্তু তার পরের গাড়িটা আর কিছুতেই জায়গা দিতে চায় না। আমরা সেটার পেছন পেছন এসে অনবরত হর্ণ দিতে লাগলাম। মাইল দুয়েক বাদে রাস্তাটা একটু চওড়া দেখেই বিপদের পুরো ঝুঁকি নিয়ে গাড়িটাকে পাশ কাটিয়ে গেলাম। সেই গাড়িটাতে শুধু একজন ড্রাইভার, আর কেউ নেই। সিদ্ধার্থদা বললেন, ও গাড়ির ড্রাইভারটা বোধহয় কালা—আমাদের এত হর্ণ ও শুনতে পায়নি।

করনেল বললেন, কালা লোকদের ড্রাইভিং লাইসেন্স দেওয়া হয় না। কালা নয়, লোকটা পাজী।

এবার আমাদের ঠিক সামনে সুচা সিং-এর গাড়ি। বড় জোর সিকি মাইল দূরে। আমরা দেখতেও পাচ্ছি, গাড়িতে সুচা সিং আর তার একজন সঙ্গী বসে আছে। ওরাও নিশ্চয়ই দেখেছে আমাদের।

সিদ্ধার্থদা গাড়ির সীট ছেড়ে উঠে দাঁড়াচ্ছেন প্রায়। ছটফট করে বললেন, ব্যাটার আর কোনো উপায় নেই, এবার ওকে ধরবোই।

আমাদের হর্ণে ও-গাড়ি কর্ণপাতও করলো না। দুটি গাড়ির মধ্যে ব্যবধান কমে আসছে একটু একটু করে। ওরা মরীয়া হয়ে জোরে চালাচ্ছে। সুচা সিং খুব ভালো ড্রাইভার—আমরা আগে দেখেছি।

করনেল বেল্ট থেকে রিভলবার বার করে বললেন, ও গাড়ির চাকায় গুলি করতে পারি। কিন্তু তাতে একটা ভয় আছে, গাড়িটা হঠাৎ উল্টে যেতে পারে।

কাকাবাবু আর্তনাদ করে উঠলেন, খবরদার, সে কাজও করবেন না। আমি সুচা সিংকে শাস্তি দিতে চাই

না, আমি আমার জিনিসটা ফেরত চাই।

সিদ্ধার্থদা বললেন, আর বেশী জোর চালালে আমাদের গাড়িই উল্টে একেবারে ঝিলম নদীতে পড়বে। ঐ দ্যাখো, সন্তু, ঝিলম নদী!

আমি একবার তাকিয়েই চোখ ফিরিয়ে নিলাম। অত নিচে তাকালে আমার মাথা ঝিমঝিম করে।

আট দশ মাইল চললো দুই গাড়ির রেস। ক্রমশ আমরাই কাছে চলে আসছি। কর্নেল জানলা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে খুব জোরে চিৎকার করে উঠলেন, হল্ট!

সুচা সিং মুখ ফিরিয়ে আমাদের দেখলো। কিন্তু গাড়ি থামালো না। কাকাবাবু বললেন, কর্নেল দত্তা, সাবধান! সুচা সিং-এর কাছে আমার রিভলবারটা আছে।

কর্নেল বললেন, মিলিটারির গাড়ি দেখেও গুলি চালাবে এমন সাহস এখানে কারুর নেই।

আর কয়েকমাইল গিয়েই ভাগ্য আমাদের পক্ষে এলো। দেখতে পেলাম উল্টোদিক থেকে একটা কনভয় আসছে। এক সঙ্গে কুড়ি-পঁচিশটা লরি। সুচা সিং-এর আর উপায় নেই। কনভয়কে জায়গা দিতেই হবে, পাশ কাটিয়ে যাবার উপায় নেই।

কর্নেল তাঁর ড্রাইভারকে বললেন, আমাদের গাড়ির স্পীড কমিয়ে দাও। আগে দেখা যাক্—ও কী করে!

সুচা সিং-এর গাড়ির গতিও কমে এলো! এক জায়গায় ছোট একটা বাই পাস আছে সেখানে গাড়ি ঘুরেই থেমে গেল, সঙ্গে সঙ্গে ওরা দুজনে গাড়ি থেকে নেমেই দু দিকে দৌড়েছে। কয়েক মুহূর্ত পরে, আমরাও গাড়ি থেকে নেমে ওদের দিকে ছুটে গেলাম। সুচা সিং-এর সঙ্গী প্রাণপণে দৌড়োচ্ছে উল্টো দিকের রাস্তায়। তার দিকে আমরা মনোযোগ দিলাম না। সুচা সিং পাহাড়ের খাঁজ দিয়ে দিয়ে ওপরে উঠে যাচ্ছে। এক হাতে সেই কাঠের বাক্স।

সিদ্ধার্থদাই আগে আগে যাচ্ছিলেন। সুচা সিং হঠাৎ রিভলবার তুলে বললো, এদিকে এলে জানে মেরে দেবো!

সিদ্ধার্থদা থমকে দাঁড়ালেন। আমরাও দাঁড়িয়ে পড়লাম। শুধু কর্নেল একটুও ভয় না পেয়ে গম্ভীর গলায় হুকুম দিলেন, এক্ষুনি তোমার পিস্তল ফেলে না দিলে মাথার খুলি উড়িয়ে দেবো!

আমি তাকিয়ে দেখলাম, কর্নেলের হাতে রিভলবার ছাড়াও, ওঁর গাড়ি যিনি চালাচ্ছিলেন তাঁর হাতে একটা কী যেন কিম্ভূত চেহারার অস্ত্র। দেখলেই ভয় করে। সুচা সিং সেই দিকে তাকিয়ে আস্তে আস্তে রিভলবারটা ফেলে দিল। কিন্তু তবু তার মুখে একটা অদ্ভুত ধরনের হাসি ফুটে উঠলো। কাঠের বাক্সটা উঁচু করে ধরে বললো, এটার কী হবে প্রোফেসারসাব? আমার কাছে কেউ এলে আমি এটা নিচে নদীতে ফেলে দেবো।

কাকাবাবু কর্নেলকে হাত দিয়ে বাধা দিয়ে বললেন, আর এগোবেন না। ও সত্যিই ফেলে দিতে পারে।

তারপর কাকাবাবু হাতজোড় করে বললেন, সুচা সিং, তোমাকে অনুরোধ করছি, ওটা ফিরিয়ে দাও!

সুচা সিং আর একটা পাথর ওপরে উঠে গিয়ে বললো, এটা আমি দেবো না। কিছুতেই দেবো না!

ফিরিয়ে দাও সুচা সিং! গভর্নমেন্টকে বলে তোমাকে আমি পুরস্কার দেবার ব্যবস্থা করবো। আমি নিজে তোমাকে পাঁচ হাজার টাকা দেবো বলেছি—

বিশ্বাস করি না। তোমরা মিলিটারি নিয়ে এসেছো।

এটা ফিরিয়ে দিলেই তোমরা আমাকে ধরবে?

না, সত্যি, বিশ্বাস করো, ঈশ্বরের নাম নিয়ে বলছি—

সূচা সিং বাক্সটা হাতে নিয়ে দোলাতে লাগলো। চোখ দুটো জ্বলজ্বল করছে। হুকুমের সুরে বললো, তোমরা এক্ষুনি গাড়িতে ফিরে যাও! না হলে আমি এটা ঠিক ফেলে দেবো!

কাকাবাবু অসহায়ভাবে কর্নেলের দিকে তাকালেন। ভাঙা গলায় বললেন, কী করা উচিত বলুন তো? আমাদের বোধহয় ওর কথা মতন গাড়িতে ফিরে যাওয়াই উচিত! ও যদি ফিরে যায়—

কর্নেল বললেন, ওর কথা বিশ্বাস করা যায় না। ওদিকে হয়তো নেমে যাবার রাস্তা আছে। ও পালাবে।

কথার ফাঁকে ফাঁকে সিদ্ধার্থদা এক পা এক পা করে এগিয়ে যাচ্ছিলেন। কেউ লক্ষ্য করেনি। আস্তে আস্তে পাথরের খাঁজে পা দিয়ে সিদ্ধার্থদা একেবারে সূচা সিং-এর সামনে পৌঁছে গেলেন। বাক্সটা ধরার জন্য সিদ্ধার্থদা যেই হাত বাড়িয়েছেন সূচা সিং ঠেলে দিতে গেল তাঁকে। তারপর মরীয়ার মতন বললো, যাক্, তাহলে আপদ যাক্!

সূচা সিং বাক্সটা ছুঁড়ে ফেলে দিল নিচে।

আমরা কয়েক মুহূর্তের জন্য দম বন্ধ করে রইলাম। কাকাবাবু মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন মাটিতে। সঙ্গে সঙ্গে অজ্ঞান। সিদ্ধার্থদা বাঘের মতন সূচা সিং-এর গায়ের ওপর ঝাঁপিয়ে চিৎকার করে উঠলেন, তোমাকে আমি কিছুতেই ছাড়বো না।

ঝটাপটি করতে করতে দুজনেই পড়ে গেলেন পাথরের ওপাশে।

হোক ভয়ংকর, তবু সুন্দর

তারপর মাস তিনেক কেটে গেছে। কলকাতায় ফিরে এসেছি, এখন আবার স্কুলে যাই। সামনেই পরীক্ষা, খুব পড়াশুনো করতে হচ্ছে। অনেকদিন পড়াশুনো বাদ গেছে তো!

তবু প্রায়ই কাশ্মীরের সেই দিনগুলোর কথা মনে পড়ে। মনে হয় স্বপ্নের মতন। গল্পের বইতে যে রকম পড়ি, সিনেমায় যে-রকম দেখি—আমার জীবনেও সে-রকম ঘটনা ঘটেছিল। অনেকেই বিশ্বাস করতে চায় না।

এক একবার ভাবি, সেই পাইথনটা গুহার একেবারে ভেতরের দিকে না থেকে যদি বাইরের দিকে থাকতো? যদি আমি পড়ে যাওয়া মাত্রই কামড়ে দিত? তাহলে এখন আমি কোথায় থাকতাম? সেই কথা ভেবে নতুন করে ভয় হয়। কিংবা তাঁবুর মধ্যে সূচা সিং-এর দলবল যখন আমার মুখ বেঁধে রেখেছিল, তখন ওরা তো আমাকে মেরে ফেলতেও পারতো!

কী সব ভয়ংকর দিনই গেছে। হোক ভয়ংকর, তবু কত সুন্দর। আমাকে যদি আবার ঐ রকম জায়গায় কেউ যেতে বলে, আমি এক্ষুনি রাজী! ঐ কটা দিনের অভিজ্ঞতাতেই যেন আমি অনেক বড় হয়ে গেছি।

রিণি আমার ওপর খুব রেগে গেছে। আমরা ঐ রকম একটা অ্যাডভেঞ্চারে গিয়েছিলাম আর ওরা বসে ছিল শ্রীনগরে—এই জন্য ওর রাগ। কেন আমরা ওকে সঙ্গে নিইনি! আমি বলেছি, যা যা ভাগ্। তোকে সঙ্গে নিলে আরও কত বিপদ হতো তার ঠিক আছে! সূচা সিং-এর রাগী মুখ দেখলেই তুই অজ্ঞান হয়ে যেতি!

সিদ্ধার্থদার হাতে বুকে এখনও প্লাস্টার বাঁধা। সিদ্ধার্থদা পাহাড় থেকে অনেকখানি গড়িয়ে পড়েছিলেন সূচা সিং-কে সঙ্গে নিয়ে। সূচা সিং-এর দেহের ভারেই সিদ্ধার্থদার বুকের তিনটে পাঁজরা ভেঙে গিয়েছিল আর ডান হাতটা ছেঁচে গিয়েছিল খানিকটা! সিদ্ধার্থদা এখন আস্তে আস্তে ভালো হয়ে উঠছেন। সিদ্ধার্থদার গর্ব এই, তবু তো তিনি একবার অন্তত সেই মহা মূল্যবান ঐতিহাসিক জিনিসটা ছুঁতে পেরেছিলেন।

সূচা সিং-ও বেঁচে গেছে। তারও চোয়ালের হাড় ভেঙে গেছে—এখন সে জেলে। সূচা সিং-এর ফুটফুটে ছেলেমেয়ে দুটির কথা ভেবে আমার কষ্ট হয়। ওরা যখন বড় হয়ে শুনবে, ওদের বাবা একজন ডাকাত, তখন কি ওদের খুব দুঃখ হবে না? চোর-ডাকাতের ছেলে-মেয়েরা নিশ্চয়ই খুব দুঃখী হয়।

কাকাবাবুও সেদিন খুব অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। ওঁকে তখন ধরাধরি করে খুব সাবধানে নিয়ে আসা হয়েছিল কুদ নামে একটা জায়গায়। সেখানে একজন ডাক্তার পাওয়া গিয়েছিল ঠিক সময় মতন। কর্নেল দত্তা যে আমাদের কত সাহায্য করেছিলেন, তা বলে বোঝানো যায় না। কাকাবাবু অবশ্য দু' তিনদিনের মধ্যেই সুস্থ হয়ে উঠেছিলেন খানিকটা। তারপরই আবার সেই পাথরের মুখ খুঁজতে বেরিয়েছিলেন।

সূচা সিং যেখান থেকে বাক্সটা ছুঁড়ে দিয়েছিল, সেখান থেকে ওটা ঝিলম নদীতেই পড়ার কথা। কিন্তু তিনদিন ধরে ঝিলম নদীর অনেক খানি এলাকা জুড়ে খোঁজাখুঁজি করা হয়েছে, পাওয়া যায়নি। সেই পাহাড়-টার সব জায়গাও তন্নতন্ন করে খোঁজা বাকী থাকেনি। অমন মূল্যবান জিনিসটা কোথায় যে গেল, কে জানে!

কাকাবাবু আমাকে বারণ করেছেন, ওটার কথা কারুকে বলতে। কারণ, এ রকম একটা ঐতিহাসিক ব্যাপারের সত্যি সত্যি প্রমাণ না পেলে কেউ বিশ্বাস করে না। আমার কিন্তু সবাইকে ডেকে ডেকে শোনাতে ইচ্ছে করে।

আমার এখনও ধারণা, কাঠের বাক্সটা সহজে ডুবে যাবে না। ঝিলম নদীর তীরে কোথাও না কোথাও একদিন ওটাকে আবার খুঁজে পাওয়া যাবে। সেদিন আমাদের কথা সবাই বিশ্বাস করবে।

ছবি এঁকেছেন বিমল দাস

বিচিত্র বর্ষামিলন

সুনীলচন্দ্র সরকার

একটা মাটি-ইটের গাঁথনি খোলার-চাল কুটির সামনে লম্বা ইটবাঁধানো রক। রকের খুঁটিতে কাপড় শুকোতে দেওয়া হয়েছে। বাইরে একটা ভাঙা বেঞ্চের ওপর আচারের বয়াম, কুলো ভরা বড়ি। একটা কুকুর চেন দিয়ে বাঁধা আছে খুঁটিতে। তিনটি সাত-আট বছরের মেয়ে কোমরে আঁচল শক্ত করে বেঁধে নাচের মত করে লাফাচ্ছে আর বলছে

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে......

ঘরের ভিতর থেকে হাতে খাতা নিয়ে বেরিয়ে এল তের-চোদ্দ বছরের ছেলে ননী

ননী ॥ খুকু, দূরে যাবি না। এখানেই থাকবি. বুঝলি? হয়তো বাবা সন্ধ্যার ট্রেনে আসবে।

খুকু ॥ হ্যাঁ দাদা, বাবা কলকাতায় গেছে পরীক্ষা দিতে, যদি না পারে?

ননী ॥ পরীক্ষা নয়। ইন্‌টারভিউ। সে কিচ্ছু না। কী রকম জানিস? আপনার নাম কী? না, শ্রীসুরেন্দ্রনাথ পালিত। গ্রাম? সোনামুখী। সেখানে কী কী আছে? ......বড় একটি হাট আছে, বর্ণচোরা নদী আছে, খ্যাপা সাধুর ঢিবি আছে, রানী রুক্মিণী কলেজ আছে। কী কী শিল্প হয়? তাঁতের কাজ, মাটির পুতুল, গালার কাজ—বাস্‌, একেবারে ফার্স্ট, আর অমনি চাকরি। বাবার কাছে আবার ঐ সব—হুঃ। ফার্স্ট হয়ে বাবা চাকরি নিয়ে আসবে। বুঝলি ভেলো? এখানকার বিক্রয়কেন্দ্রের সেক্রেটারি। প্রতিদিন এতখানি করে মাংস পাবি......চললুম......

ভেলো ॥ কুঁই কুঁই কুঁই কুঁই......

ননী ॥ আরে তুই কোথায় যাবি? আমি যাচ্ছি কোচিং ক্লাসে, যাবি নাকি? মাথায় অঙ্কের মাস্টারের গাঁট্টা খেলে চালাকি বেরিয়ে যাবে। চুপটি করে বসে থাক—

প্রস্থান

মেয়েরা 'আয় বৃষ্টি' নাচ নাচতে নাচতে বেরিয়ে গেল

গিন্নীর প্রবেশ

গিন্নী ॥ ঝড় এল যে, কোথায় গেলি, ও খুকু, ও ননী—
আচার বড়ি কাপড়চোপড় ভিজবে যে এক্ষণি।
ঝি-ও তো সাত তাড়াতাড়ি
মেঘ দেখে গিয়েছে বাড়ি
কোথায় গেলি খুকু—ওরে আয় না ছুটে ননী,
আচার বড়ি কাপড়চোপড় ভিজবে যে এক্ষণি।

নিজে কিছু তুলতে লাগল। ডাক শুনে খুকুও ছুটে এসে হাত লাগাল।

গিন্নী ॥ ননী কোথায়?

খুকু ॥ দাদা কোচিং ক্লাসে গেছে।

গিন্নী ॥ বেশ, তুই কোথাও যাবি না, এখানেই থাকবি, বুঝলি? পাড়ায় পাড়ায় হো হো করে বেড়ালে চুলের ঝুঁটি ধরে ঘাড় থেকে মুণ্ডুটা খুলে ফেলবো, বুঝলি?

খুকু বেশ বুঝতে পারল সে ব্যাপারটা কী রকম বিশ্রী হবে। রেগে

থ্ম হয়ে দাঁড়িয়ে রইল। ভেলো তাকে সান্ত্বনা দিতে গেল—কুঁই কুঁই কুঁই

খুকু ॥ যা যা আর ভালোবাসা দেখাতে হবে না—

দুই মেয়ের প্রবেশ

১ জন মেয়ে ॥ দেখ, কী সুন্দর মেঘের রঙ হয়েছে? চলো খুকু, তোমার বাবার শেখানো সেই গানটা গাইতে গাইতে বৈতালিক করি—

খুকু ॥ না ভাই, মা আমাকে—

মেয়েরা ॥ চলো চলো...

জোর করে খুকুকে ধরে নিয়ে গান গাইতে গাইতে বেরিয়ে গেল

দু-জন লোকের প্রবেশ

১ম ॥ সুরেন গেছে চাকরির ধান্ধায়. এদিকে থিয়েটারের রিহার্সাল বন্ধ।

২য় ॥ দেখি ফিরেছে কিনা। সুরেন, সুরেন! ফিরেছ?... আ মর এ কুকুরটা এরকম করে কেন? তুই থাম না...

১ম ॥ ফেরেনি মনে হচ্ছে। সুখে থাকতে এ কী গেরো বলতো। তুই তোর জমিজমা দেখবি, গান গাইবি. থিয়েটার করবি। সোনামুখী ড্রামাটিক ক্লাবের তুই হলি সেক্রেটারি। তোর একটা মান মর্যাদা আছে। আর টাকার লোভে তুই গেলি বিক্রয়কেন্দ্রের কেরানী হতে?

২য় ॥ আরে ঘাবড়াও কেন? ইনটারভিউ-এ পারবে ভেবেছ? তাদের সব কোশ্চেনের উত্তর দিতে গিয়ে গলায় আর স্বর ফুটবে না। ওহে বৃষ্টি এসে পড়ল, তাড়াতাড়ি ক্লাবের দিকে চলো।

১ম ॥ চলো। আরে কুত্তা, তুই অমন করিস কেন—ধ্যেৎ—

দু-জনের প্রস্থান

ভেলোর গান ॥

আমি কুঁই কুঁই কি সাধে করি হে,
এই কুঁই কুঁই কি সাধে করি?
আমি একলা কুকুর ক-দিক দেখি
প্রভু আমার দেশান্তরী।
ওই আকাশ জুড়ে কে অচেনা
কী করতে চায় তা বলছে না
শুধু হাঁসফাঁস ফেলছে শ্বাস
আর গর্জনে লাগাচ্ছে ত্রাস
তাই ল্যাজ নামিয়ে ভয়ে মরি।

এক গরুর প্রবেশ ও গান। গরু তো, ।ক্রয়ারুপগুলোর অনেক ভুল

গরু ॥ ওই ডম্বরু অম্বরে বেজেছে
হাম্বা—হাম্বা—
এবার অঝোর ধারে বৃষ্টি
নিশ্চয় নাম্‌বা...
যে বুড়ী আমাকে পোষে
কোথায় জিরোচ্ছে বসে
নুন দে খাচ্ছে কাঁচা আম বা...
ওমা কে ষাঁড় পালিয়ে তার চাকরি
আকাশে দিচ্ছে গলা খাঁকরি?
আমি যাবো ছাউনির নিচে
সেখানে জাবনা দিছে,
ঘরের গরমে গিয়ে ঘামবা।

প্রস্থান

তিন অফিসের বাবুর প্রবেশ

১ম ॥ আরে বিশ্বাস করছ না কেন? ও বিক্রয়কেন্দ্র পরিদর্শন নয়. আজ ছুটির দিন এসেছি ফুর্তি করতে। জায়গাটা চমৎকার, স্টেশনের হোটেলে খেয়ে ফিরব রাত নটার ট্রেনে। আর সঙ্গেও কিছু খাবার আছে।

২য় ॥ মনে আছে এখানকার কে একটা লোককে পরশুদিন ইনটারভিউ-এ নাজেহাল করে দিয়েছিলে? আজ যদি দেখা হয়ে যায়, তোমার পেছনে গুন্ডা লাগাবে।

৩য় ॥ আরে না না, সে হল নাট্যশিল্পী...এ কী বৃষ্টি যে এসে পড়ল হে...য়্যাঁ!

তিনজনের গান

১ম ॥ মেঘ ঘনিয়ে আসছে যে হে
কোথাও গিয়ে উঠবে নাকি
শহর তো নয় এ পাড়াগাঁয়
উপায় নেই যে ট্যাক্সি ডাকি।

৩য় ॥ কিম্বা একটা রিকসা ডাক...

২য় ॥ বাসট্রাম আর অফিস নিয়ে
সুখে থাকুক গে কলকাতা,
ঝড় জল আজ মানবো না হে
সঙ্গে আছে ভাঙ্গাছাতা।

১ম ॥ আর এ বর্ষাতি।

৩য় ॥ আর এই খোলা মাথা।
১ম ॥ সামান্য এই ঝড়ের ভয়ে
নষ্ট করা যায় না ছুটি,
ঠেলায় পড়লে উঠব কোথাও,
এই সঙ্গে মুড়ি কড়াইশুঁটি—
২য় ॥ এই দেখ না লুচিমিষ্টি
৩য় ॥ মাংসরুটি

প্রস্থান

ঘোড়ার প্রবেশ

ঘোড়া ॥ এসে পড়ল এসে পড়ল
বৃষ্টি হাতের চাপড়,
পিঠে মাথায় ঘাড়ে পাছায়
বৃষ্টি হাতের চাপড়!
ছুটি ছুটে কোথায় ঢুকি?
ঘাড় গা কাঁপাই আর পা ঠুকি?
ছুটতে ছুটতে ছুটতে ছুটতে
হাঁফাই যেন হাফর...ফর্‌র্‌র্‌র্

প্রস্থান

ছেলেমেয়েরা—

আয় বৃষ্টি ঝেঁপে ধান দেব মেপে
যা বৃষ্টি চলে যা নেবুর পাতা করমচা

বৃষ্টিরানী তাঁর সখীদের নিয়ে ঢুকছেন, আবার ভাব করছেন যেন চলে যাবেন। ছেলেমেয়েরা চলে গেল, তখন...

বৃষ্টিরানী ॥ ডেকে এনে যেতে বলে
এ কী হায়রানি ঃ
সখীরা ॥ তাই অত মুখ ভার
ওগো অভিমানী।
ধরো না ধরো না দোষ
থামাও বিদ্যুৎ-রোষ
ঝরাও করুণাধারা
হে বৃষ্টিরানী।
বৃষ্টিরানী ॥ গাছেরা নীরব কেন
জানে না কি নাচ গান?
সখীরা ॥ ওগো জুঁই, ও পারুল,
ও কদম, ও বকুল,
ও মালতী, ও মাধবী,
রানী উৎসব চান।
গাছ ও লতারা ॥
দু এক শুকানো পাতা
প্রথমটা ঝরে
কী এক কাঁপন যেন
বুকে পিঠে ধরে,
তারপর তারপর
ঝরঝর ঝরঝর
ঝরঝর ঝরঝরো ঝরোঝর
চুমকি সবুজ সাজ

ধুয়ে মুছে ঝলে
জলের হীরকহার
হাতে মাথে গলে।
তারপর তারপর
ঝরঝর ঝরঝর
ঝরঝর ঝরোঝরো ঝরোঝর...

একদল ছেলের প্রবেশ

এই মাঠে—খোলা দেশে—এই মুক্ত দিক্‌সীমানায়;
এই ঝড়ে, এই জলে, ভাই কী করলে আজ মানায়?
কাদা মাখি—দৌড়োই, কাটি জলের মধ্যে সাঁতার,
দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভিজি. তা কেন ঢুকিগে মধ্যে ছাতার।

ননী ও আর কয়জন ছেলে

ওরে কে কোথায় আছ রসিক হে
বাদল দিনের যত নির্ভীক হে
দু চার মুরগী চুরি, যদি না করতে পারি
তবে দুয়ো দুয়ো বলে দিও ধিক্ হে।

সব ছেলেদের প্রস্থান

বর্ষায় নাজেহাল তিন বাবুর পুনঃপ্রবেশ। তাদের ভাবভঙ্গি একেবারে বদলে গেছে

১ম ॥ ওঃ, এখন প্রাণটা নিয়ে ফিরতে পারলে হয়—
২য় ॥ মরতে হবে বেঘোরে, সাপের কামড়ে, না হয় ডোবায় ডুবে—
৩য় ॥ এস সকলে মিলে চেঁচাই:...ও সুরেন পালিতমশাই, দয়া করে আপনার বাড়ির পথটা একটু দেখিয়ে দিন।
২য় ॥ কুকুরের ডাক শুনছি, মেয়েগুলোর গানও ভেসে আসছে কানে। আপনি নিকটেই কোথাও আছেন, শুধু আপনার দেখাটি—

৩ জন একসঙ্গে—'ও সুরেন পালিতমশাই বলে ডাকতে গিয়ে হঠাৎ স্তব্ধঃ— ও বাবা, এ কীরে!

চারদিক অন্ধকার হয়ে এল। এক আবছা বিকট মেয়েমূর্তির আবির্ভাব।

বেয়াড়া রাতের গান ॥

আমি বেয়াড়া রাত—
আমার চেহারা দেখে
শেয়াল কাঁদতে শেখে
বিশ্বাসী ঘোড়া কুপোকাৎ।
আমার প্রহরী সব কই?
ওরে শেয়াল! বাদুড়! কালো পেঁচা—
চেঁচা

জন্তু ও পাখির বিকট চীৎকার

বৃষ্টি! ছাদ ফুটো কর,
দরজা জানলা কাঁপা ঝড়!
হ' হ' বজ্রাঘাত

বাজের আওয়াজ

লণ্ঠনে ফুরোক তেল
বেরোক চোর সিঁধেল
বিছানায় অচেনা হাত...

আবছায়া একটা প্রকাণ্ড হাত এসে ঘুরতে লাগল, আর আঁ আঁ করে বিকট চিৎকার করে তিন বাবু এদিক ওদিক পালাবার চেষ্টা করতে লাগল

সুরেনের প্রবেশ

সুরেন ॥ আমারি নাম ধ'রে কে যেন ডাকছিল। কই, কে বাবা? আরে এটা কী—য়্যাঁ, হার্টফেল হয়ে মরব নাকি?

বেয়াড়া রাত ॥

ওরে শেয়াল! বাদুড়! কালো পেঁচা—
চেঁচা

সুরেন ॥ আঁ, আঁ, বাবা পারলে মরতুম। ফেল করে মরমে মরে রয়েছি আর চেষ্টা করেও মরতে পারছি না...

বেয়াড়া রাত ॥

লণ্ঠনে ফুরোক তেল
বেরোক চোর সিঁধেল
বিছানায় অচেনা হাত...

সেই হাতটা এগিয়ে আসতে লাগল

সুরেন দু একবার পালাবার চেষ্টা করে হঠাৎ রুখে দাঁড়াল—নে আয়, কী করবি কর। মরার বাড়া গাল নেই। আয় বেয়াড়া রাত, তুমি আমাদের এই সোনামুখী গ্রামে ডাইনীগিরি ফলাতে এসেছ? বিছানায় অচেনা হাত? তা এখানে বিছানা কোথায় মিথ্যুক। ইয়ার্কি হচ্ছে? দাঁড়া তো—

হাতটাকে ধরতে গেল, অমনি ডাইনী পশুপক্ষীর ছায়া সব অন্তর্ধান

২য় বাবু ॥ এই যে, আপনিই কি সুরেন পালিত মশাই?

সুরেন ॥ আজ্ঞে হ্যাঁ।

১ম বাবু ॥ ইনিই হচ্ছেন সিদ্ধেশ্বর চক্রবর্তী যাঁর কাছে আপনি ইনটারভিউ—

সুরেন ॥ কি, আবার ইনটারভিউ? নিজের বাস্তুভিটেয় পোঁছেও আবার ইনটারভিউ! বলুন কী জানতে চান—ঘানিকে কুটির শিল্প বলে কিনা?

২য় বাবু ॥ আরে না মশাই, চটছেন কেন? এত ঘানি ঘোরানোর পর আবার ঘানি?

৩য় বাবু ॥ আর কুটির শিল্পের মধ্যে আমাদের নজর এখন শুধু আপনার কুটিরটিতে

১ম ॥ এই দুর্যোগে আমাদের সেখানে নিয়ে গিয়ে গার্হস্থ শিল্পটা একটু দেখিয়ে দিন...

সুরেন ॥ তারপর সকলের সামনে আমার ছেলে ননী যদি জিজ্ঞাসা করে বসে—বাবা পাশ না ফেল?

২য় ॥ বলবেন পাশ। আপনার মত লোক কখনো ফেল হয়? বেয়াড়া রাত আপনাকে দেখে দূর হল।

৩য় ॥ আরে মশায় আপনাকেই সিদ্ধেশ্বর কেন্দ্রকর্তা করেছে, এই মানে করবে। য়্যাঁ, না কি সিদ্ধেশ্বর?

১ম ॥ নিশ্চয়

সুরেন ডাক ছাড়লো ॥ এই ননী লণ্ঠন নিয়ে আয়। খুকু তোর মাকে বল কলকাতা থেকে আমরা এসেছি চারজন—

ননী ॥ মুরগী রান্না হয়েছে বাবা। (কাছে এসে) কী হল বাবা?

সুরেন ॥ পাশ, পাশ

ননী ॥ কীরে খুকু বলেছিলুম কিনা...

ঘরের রকে সকলে গিয়ে উঠল

ক্লাবের কয়েক বন্ধুর প্রবেশ

সুরেন ॥ আরে এই জলঝড়ের মধ্যে এসে পড়েছ? এস এস, এই বিচিত্র বর্ষা মিলনের গান ধরো। পরে এক আধ প্লেট গরম গরম কিছু পাবে।

সকলের গান ॥

সরেন বানিয়ে বানিয়ে এক এক লাইন গায়,
অপররা তাই আবার ধরে...

মধ্য বর্ষা রজনীর এই উৎসবে
এস কে কোথায় আছ, এস এস সবে,
এস গৃহিণী তনয় তনয়ারা
এস কুক্কুর রক্ষী
এস খেয়ালী ঘোড়া মাতোয়ারা,
গৃহপালিত গাভীলক্ষ্মী
সঙ্গীত সমবায়ে গাও গাও বিচিত্র রবে।
এস সোনা কোলা গেছো ব্যাং
এস এস বেয়াড়া রাত
কিন্তু সাবধান, সাবধান,
কোনো বিপদ্ হয় না যেন পাত,
শেয়াল বাদুড় পেঁচা কথাটি না কবে।
এস শহরের বাবু সন্ধানী
এস সোনামুখী ক্লাবের সভ্য
এস গাছলতা আর পশুপ্রাণী
শোনো বৃষ্টিরানীর বক্তব্য,
শেষে যোগদাও দৈবাৎ লব্ধ
এই কলকল ভোজ কলরবে।

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

কুমির

নরেন্দ্রনাথ মিত্র

এ গল্প আমরা শুনেছিলাম জেঠিমার কাছে। জেঠিমা দুটি ছেলেমেয়ে নিয়ে অল্প বয়সে বিধবা হয়েছিলেন। তেমন সুন্দরী না হলেও বেশ বুদ্ধিমতী ছিলেন। আর খুব সাহস ছিল মনে। কখনো দিদি-ভাই কখনো জেঠিমা আমাদের কাছে সন্ধ্যাবেলায় গল্প করতেন। মানুষের গল্পের চেয়ে ভূত প্রেত দৈত্য দানা রাক্ষস খোক্কসের গল্পই আমাদের বেশি ভালো লাগত। বাঁশঝোপে, শেওড়াতলা, আশেপাশের জংলা ভিটেগুলিতে ছিল তাদের বসবাসের জায়গা। তাদের আমরা দেখতাম না কিন্তু অনুভব করতাম।

যতদূর মনে পড়ছে তখন বর্ষাকাল। চারদিকে জল থৈ থৈ করছে। আমাদের বাড়িখানি সেই জলের মধ্যে দ্বীপের মত জেগে আছে। সন্ধ্যা হতে না হতেই পাড়া স্তব্ধ। আর রাতটা কৃষ্ণপক্ষের হলে তো কথাই নেই। জলে ডোবা গ্রামখানি আঁধারে আর একবার ডুব দিত।

একটু দূরে ছোট একটা হ্যারিকেন জ্বলত। মাঝে মাঝে তার চিমনি ফেটে যেত। সংগে সংগেই যে বদলানো হত তা নয়। সেই ফাটা চিমনিই আরো কিছুদিন ধরে আলো দিয়ে যেত। চুন আর কাগজ দিয়ে সেই চিমনি জুড়ে দেওয়া হত। আবার কখনো কখনো দেখতাম সেই চিমনিতে কালি মাখা। ভূতের গল্প শুনতে শুনতে জেঠিমার এই হ্যারিকেনটিও যেন ভূতুড়ে হয়ে উঠেছিল।

জেঠিমা সেদিন বললেন, আজ তোমাদের নদেরচাঁদ কুমিরের গল্প বলব। খবরদার ঘুমুতে পারবে না। আজ হাটবার। ভাঙ্গার হাট থেকে মাছ আসবে। সেই মাছ কোটা হবে, রান্না হবে, তবে তোমাদের খেতে দেব।

দক্ষিণ-পাড়ায় আমার বাপের বাড়ির পাশের বাড়িই ছিল নদেরচাঁদদের বাড়ি। লম্বা ছিপছিপে ছিল নদের-চাঁদ। রং মিসমিসে কালো। কিন্তু ভারী সুন্দর চেহারা। টানা নাক চোখ। এক মাথা ঝাঁকড়া বাবরি চুল। সাত-পুরুষ ধরে ওরা চাষবাস করে খায়। কিন্তু ওর চাষবাসে মন ছিল না। কাজে কাজেই ঘর সংসারের কোন কাজই ওর ভালো লাগত না। ঘুরে বেড়ানোই ছিল ওর নেশা। যেখানে যাত্রা হত, কবিগান হত, ও গিয়ে জুটত। পুজোর সময় যখন দুর্গা প্রতিমা কি কালী প্রতিমা গড়া হত ও গিয়ে কুমোরদের সংগে জোগান দিত। ও কারো কাছে পয়সা চাইত না। কেউ ওকে সেধে পয়সা দিতেও যেত না। বেগার খেটেই ও আনন্দ পেত। ছেলে বেলা থেকেই ও বাঁশি বাজাতে পারত। তল্লাবাঁশ কেটে ও সুন্দর সুন্দর বাঁশি বানাত। অনেক রাত অবধি ওর ঘর থেকে সেই বাঁশির সুর ভেসে আসত। আমরা শুয়ে শুয়ে শুনতাম। শুনেছি ওর বাঁশির শব্দে আশেপাশের সাপগুলি স্থির হয়ে দাঁড়াত। মুগ্ধ হয়ে শুনত।

কিন্তু সেই বাঁশির শব্দে সাপ মুগ্ধ হলে কী হবে ওর বাপ মুগ্ধ হল না। ছেলের বাঁশি যত শোনে বদন মণ্ডল তত খেপে যায়। হারামজাদা, তুই কি ঢুলীর ঘরে জন্মেছিস যে বাঁশি বাজাবি, কাঁসি বাজাবি? ওতে কি পেট ভরবে? নদেরচাঁদ বাপের মুখে মুখে কী যেন জবাব দিয়েছিল। বদন রেগে গিয়ে বাঁশি টাসি ভেঙে ছুঁড়ে ফেলে দিল, যে পাচনবাড়ি দিয়ে সে হালের গরু তাড়ায় তাই বদন ছেলের পিঠের ওপর ভাঙল। নদেরচাঁদ একদিন রাতের অন্ধকারে মনের দুঃখে দেশ ছেড়ে চলে গেল। ওর ঘরে মা ছিল না। অল্প বয়সেই মা মারা গিয়েছিল। ছেলে ঘর ছেড়ে চলে যাওয়ার পর ওর বাবা ঠিক মার মতনই ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল।

অনেকদিন পর্যন্ত নদেরচাঁদের কোন খোঁজ মিলল না। সে নাকি পাড়াপড়শীকে বলে গিয়েছিল মানুষ না হয়ে আর দেশে ফিরবে না।

ঘরে ঘরে আজ শিশুরা নতুন বেবী সোপ নিয়ে কানাকানি করছে আর তা হল

বেঙ্গল কেমিক্যালের

বেবী সোপ

প্রত্যেক মায়েরা চান এমন একটী বেবী-সোপ যার ব্যবহারে শিশুদের গাত্রত্বক কোমল, মোলায়েম ও স্নিগ্ধ রাখে। বেঙ্গল কেমিক্যালের বেবী সোপে এই সমস্ত গুণই বর্তমান—ঘরে ঘরে তাই এই সাবানের এত কদর।

কস্‌মেটিক ডিভিসন

বেঙ্গল কেমিক্যাল

কলিকাতা, বোম্বাই, কানপুর, দিল্লী, মাদ্রাজ, পাটনা

ছেলে মেয়েদের পছন্দ

Kennedy

DRESSES

শার্ট • প্যান্ট

ফ্রক • বাবা-সুট

প্রস্তুতকারক:

রেনবো গারমেন্ট সাপ্লায়ার্স

প্রাইভেট লিমিটেড

৫৬/১, ক্যানিং স্ট্রীট, কলিকাতা-১

ফোন-৩৪-৫৩৯৫

তারপর একদিন শুনলাম নদেরচাঁদ কামরূপ-কামাখ্যায় চলে গিয়েছে। ওমা, সেখানে গেলে তো মানুষ ভেড়া হয় শুনেছি। আমার এক কাকা গিয়েছিলেন কামাখ্যায়। আর ফেরেননি।

বাপ্পা বলল, ভেড়া হয়ে গিয়েছিলেন?

জেঠিমা হেসে বললেন, গুরুজন মানুষ। সে কথা আর কী করে বলি?

আমি বললাম, যে ভেড়ার গায়ের লোম থেকে পশম হয় সেই ভেড়া?

জেঠিমা হেসে বললেন, নারে বাবা না। মানুষ যখন সুন্দরী বউ বিয়ে করে সেই বউয়ের কথায় ওঠে বসে তখন তাকে ভেড়া বলে। তোমরাও একদিন তাই হবে।

আমি বললাম, দূর। আমি তা হলে সুন্দরী বউ বিয়েই করব না।

বাপ্পা বলল, না জেঠিমা। আমার জন্যে সুন্দরী বউই এনো। তারপর যা হয় হবে।

বাপ্পার চোখে ঘুম আসছিল। জেঠিমা তাকে ঠেলা দিয়ে বললেন, এই ঘুমিয়ো না। নদেরচাঁদ কী হয়, শোন।

নদের চাঁদ বছর পাঁচেক বাদে দেশে ফিরে এল। তখন তার বাপ মারা গেছে। ঘরখানা ঝড়ে পড়ে গেছে। ভিটেটা জঙ্গলে ভরতি। নদেরচাঁদ কামাখ্যায় গিয়ে ভেড়া বনে যায়নি। অনেক তুকতাক মন্তর তন্তর শিখে এসেছে। টাকাকড়িও এনেছে অনেক। সেই টাকায় সে নতুন করে ঘর তুলল, ভিটের জঙ্গল সাফ করল। বাড়ির সামনে যে ছোট একটা এঁদো পুকুর ছিল সেটাকে বড় করে কাটল। পুকুরের চার ধার দিয়ে কত ফুলের গাছ ফলের গাছ লাগাল। ভারি সৌখীন পুরুষ নদেরচাঁদ। হ্যাঁ এবার সে মানুষের মত মানুষ হয়েছে। আমার বাবা বললেন, নদেরচাঁদ এবার একটি বউ আনো ঘরে! নদেরচাঁদ বলল, আনব কর্তা। ঘরদোর গুছিয়ে নিই। তারপর আনব।

কয়েক মাস পরে সত্যিই নদেরচাঁদ বউ নিয়ে এল ঘরে। পরমা সুন্দরী বউ। ওদের জাতের মধ্যে অমন সুন্দর মেয়ে বড় একটা দেখা যায় না। কেউ কেউ বলল নদেরচাঁদ দূর দেশ থেকে বামুন কায়েতের মেয়েকে ভুলিয়ে নিয়ে এসেছে। কেউ কেউ বলল মন্ত্র পড়ে বনের হরিণকে ও মেয়ে বানিয়ে নিয়ে এসেছে। কারণ টুকটুকে বউয়ের চোখ দুটি হরিণের মতই সুন্দর। স্বভাব হরিণের মতই চঞ্চল আর মিষ্টি। এত সুন্দর বউ কিন্তু পাড়ার বকাটে ছোড়ারা নদেরচাঁদের বাড়ির ত্রিসীমানায় ঘেঁষতে সাহস পায় না। তাদের ভয় আছে প্রাণে। নদেরচাঁদ যেমন বনের হরিণকে মেয়ে বানাতে পারে, তেমনি বকাটে ছোঁড়াদের শিয়াল কুকুর বিড়াল এমন কি ইঁদুর বানিয়েও রাখতে পারে। তার মন্ত্রের এমনই জোর। সে যেমন মন্ত্র পড়ে মানুষের ঘাড় থেকে ভূত নামাতে পারে, তেমনি শত্রুতা করলে মানুষের ঘাড়ে ভূত চাপিয়েও দিতে পারে। ওঝাগিরি গুণিনগিরির কাজ নিয়ে নদেরচাঁদ অনেক দূরের গাঁয়ে-গঞ্জে চলে যেত। দু তিন দিনের মধ্যে হয়তো বাড়িতেই ফিরত না। বউ একলা থাকত ঘরে। কোন কোন সময় নদেরচাঁদের বুড়ী এক মাসী এসে বউয়ের কাছে থাকত। আর বেশি পাহারার দরকার হত না। নদেরচাঁদ মন্ত্র পড়ে বাড়ির চারদিকে গণ্ডি কেটে রেখে যেত। চোর ডাকাত জীব জন্তু কেউ সেই গণ্ডি পার হতে সাহস পেত না।

গুণিন হিসাবে নদেরচাঁদের নাম ডাক ছড়িয়ে পড়ল। পুবের ভিটেয় আরো একখানা ঘর তুলল নদেরচাঁদ। নানা রকমের শিকড়-বাকড়-গাছগাছড়া তাবিজ কবচে সেই ঘর বোঝাই হয়ে উঠল।

তারপর শুনলাম নদেরচাঁদ নিজেও অন্য জীবজন্তু হতে পারে। বাঘ হয়, ভাল্লুক হয়, সাপ হয়ে ফোঁস ফোঁস করে। আমাদের গ্রামের যাত্রার দলের বহুরূপী ফটিক দাস যেমন বাঘ ভাল্লুক সাজে তেমন নয়। এ হল সত্যি-কারের বাঘ ভাল্লুক। তবে এ বিদ্যার চর্চা সে বাড়িতে বসে করে না। লোকালয়ে কাউকে এ সব দেখায় না। সাকরেদ সোনা মিঞাকে নিয়ে চলে যায় গভীর বনে জঙ্গলে। সেখানে একজন ইচ্ছামত জীবজন্তু হয়। আর একজন বসে থাকে। ঘটিতে থাকে মন্ত্র পড়া জল। খেলা শেষ হবার পর সেই জল ছিটিয়ে তার গায়ে দিলে সে আবার মানুষ হয়ে ওঠে।

হঠাৎ এক কাণ্ড ঘটল। সোনা মিঞাকে আর খুঁজে পাওয়া গেল না। লোকে কানাঘুষা করতে লাগল নদের-চাঁদই বাঘ হয়ে তাকে খেয়ে ফেলেছে। এখন আর পেট থেকে বের করতে পারছে না। থানায় ডায়েরি করা হল। পুলিশ খোঁজ খবর করতে লাগল। কিন্তু করলে কী হবে? সোনা মিঞার কোন উদ্দেশ নেই। পুলিশ নানা রকম সন্দেহ করতে লাগল। কিন্তু নদেরচাঁদের গায়ে হাত দেবার কারো ক্ষমতা নেই। সে হয়তো পুলিশের ইনসপেক্টরকে বাজারের নেড়ী কুকুর বানিয়ে ছেড়ে দেবে। আর দারোগা নিজের টেবিলের তলায় পোষা বিড়াল হয়ে মিউ মিউ করবে।

তারপর সেও এখনকার মতই এক বর্ষাকাল। সেবার বর্ষাটা আরও বেশী হয়েছিল। বন্যার মত। নদেরচাঁদ এই বর্ষাবৃষ্টির মধ্যে কয়েকদিন আর বেরোয়নি। বউ খুব আদর যত্ন করছে নানা রকম রান্নাবান্না করে স্বামীকে খাওয়াচ্ছে। খাওয়া দাওয়ার পর সেদিন বিকাল বেলায় সুন্দরী বউ খুব সোহাগ করে বলল, আচ্ছা, তুমি নাকি ইচ্ছা করলেই বাঘ-ভাল্লুক হাতি-গণ্ডার সব হতে পার?

নদেরচাঁদ বলল, 'পারিই তো। কিন্তু এখন আর আমার অন্য কিছু হতে ইচ্ছা করছে না।'

কিন্তু সোহাগী বউ নাছোড়বান্দা! সে আদর আহ্লাদে স্বামীকে বশ করে ফেলল, লক্ষ্মীটি একটি বার হও। সবাই দেখতে পেয়েছে আমিই শুধু দেখতে পেলাম না। জীবনভর শুধু কুকুর বিড়ালই দেখলাম। একটি

বারের জন্যে একটা বড় জন্তু হয়ে আমাকে দেখাও। তোমার পায়ে পড়ি।

অমন আদরের বউ, অমন সুন্দরী বউ যাকে নদের-চাঁদ মাথার মণি করে রেখেছে সে যদি অমন পায়ের কাছে পড়ে নদেরচাঁদের কি না করবার সাধ্য আছে?

নদেরচাঁদ একটু ভেবে চিন্তে বলল, 'ঠিক আছে। আমি কুমির হয়ে তোমাকে দেখাব। অন্য সব জীবজন্তু হয়েছি। কুমির এর আগে হইনি। এই বর্ষাকালে কুমির হওয়াই ভালো। জলের অভাব হবে না। বাড়ির নিচেই সমুদ্দুর।

বউ তো মহা খুশী। ঘরে বসে সে জ্যান্ত কুমির দেখবে।

নদেরচাঁদ তখন একটা জলের ঘটি নিয়ে বিড়বিড় করে মন্তর পড়ল। তারপর বউয়ের হাতে সেই ঘটিটি তুলে দিয়ে বলল, কুমির হবার পর তোমার যতক্ষণ সাধ হয় দেখে নিয়ে এই ঘটির জল আমার গায়ে ঢেলে দিয়ো। আমি আবার হাসতে হাসতে মানুষ হয়ে উঠব। ভয় পেয়ো না কিন্তু।

বউ হেসে বলল, বাঃ রে ভয় কেন পাব? কুমিরই হও আর যাই হও তুমি তো তুমিই।

তখন নদেরচাঁদ বিড়বিড় করে আবার এক রাশ মন্তর পড়ল। সঙ্গে সঙ্গে সে বিরাট এক কুমির হয়ে উঠল। বউ তো তা দেখে ওরে বাবারে বলে এক লাফ দিয়ে ঘর থেকে উঠানে নামল। কুমির যত তার কাছে যায় তত সে দূরে পালায়। মন্ত্রপড়া ঘটির জলের কথা সে প্রাণের ভয়ে ভুলেই গেছে। সারা রাত এই রকম এগোন পেছোন চলল। কিন্তু কুমির তো আর বেশীক্ষণ ডাঙায় থাকতে পারে না, বাঘ হলে পারত। কুমিরকে জলে নামতে হল। বাড়ির নিচেই নিজেদের সেই সাধের পুকুর। কুমির সেই পুকুরে ঝাঁপিয়ে পড়ল।

অনেকক্ষণ বাদে বউয়ের মনে পড়ল ঘটিতে তো মন্ত্র-পড়া জল আছে। ঘটি নিয়ে সে ঘাটের কাছে এগিয়ে গেল। কিন্তু ভরসা পেয়ে কুমির যেই বউয়ের পায়ের কাছে এল অমনি বউ বাবারে মারে বলে ঘটি ফেলে ছুট।

ঘটির জল গড়িয়ে পুকুরের জলে পড়ল। কুমিরটা সেই জলে একবার চিৎ হল আর একবার উপুড় হল। কিন্তু তাতে ফল হল না। মন্ত্রের শক্তি নষ্ট হয়ে গেছে।

বউ তখন নিজের ভুল বুঝতে পারল। কপাল চাপড়াতে চাপড়াতে বলল, ওগো আমাকে খাও! আমাকে খেয়ে ফেল!

কিন্তু বলে বটে খাও খাও কিন্তু বউ কি আর জলের কাছে যেতে পারে! কুমির যেই এগিয়ে আসে বউ পিছিয়ে যায়।

এমনি করে সাত দিন সাত রাত্তির কাটল। কুমিরের পেটে দারুণ খিদে। আর উপোস করলে তার প্রাণ বাঁচে না। সে তখন চোখের জল ছেড়ে দিয়ে আস্ত একটা কচ্ছপ গিলে ফেলল। নিয়ম এই একবার যদি ইতর জন্তু জানোয়ার খেয়ে ফেলে তাহলে কুমির আর মানুষ হতে পারে না।

নদেরচাঁদও আর মানুষ হতে পারল না। কিন্তু তাকে তো বড় বড় মাছ কি জীবজন্তু খেতে হবে। তাই পুকুর থেকে সে খালে গিয়ে পড়ল। খাল থেকে নদীতে, নদী থেকে সমুদ্রে।

আমি বললাম, আর বউটা কী করল?

জেঠিমা বললেন, বউ আর কী করবে? মেয়ে মানুষ, সে তো সমুদ্দুর পর্যন্ত যেতে পারে না। নদীর ঘাট পর্যন্ত গেল। বর্ষা কাল শেষ হল। শীতের পরে গ্রীষ্ম এল। বউ ঘাটে গিয়ে ঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। আড়াল থেকে একটা কুমিরকে দেখবে বলে।

কিন্তু আমাদের ছোট গাঙে তো আর কুমির আসে না। নানা রকমের ছোট বড় মাছ আসে। মাছরাঙা পাখি আকাশে ওড়ে। ছোঁ দিয়ে ছোট ছোট মাছ নিয়ে যায়। আর কালো কালো কোলার মত শুশুক মাঝে মাঝে জলের ওপর মাথা জাগায়। আবার ডুব দিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে যায়। বউয়ের আর কুমির দেখা হয় না।

জেঠিমা একটু কাল চুপ করে রইলেন। তারপর দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বললেন, হরি বোল হরি বোল! চল তোদের খেতে দিই গিয়ে।

ছবি এঁকেছেন সুবোধ দাশগুপ্ত

গল্পটা আমাদের ছেলেবেলার।

আমাদের শহরে এক যোগীবাবা এসেছিল। প্রথমে রেলস্টেশনের কাছে, তারপর বাজারের গায়ে শিবমন্দিরের গোড়ায়, শেষে ধর্মশালার পাশে একটা খাপরা-ছাওয়া বাড়িতে যোগীবাবাকে দেখা যেতে লাগল। দেখতে দেখতে যোগীবাবার খুব নাম ছড়িয়ে গেল শহরে, রাজ-বাঁধের কাছে একটা বাগানঅলা বাড়িতে যোগীবাবা বেশ জাঁকিয়ে বসে পড়ল।

আমরা ছিলাম মফস্বলের মানুষ। বিহারের একটা বড়সড় শহরেই থাকতাম। মাস কয়েক আগে এক সাঙ্ঘাতিক ভূমিকম্প হয়ে গেছে বিহারে, অত বড় ভূমি-কম্প বিহারে তো নয়ই, ভারতবর্ষের আর কোথাও ঘটেছে বলে লোকে মনে করতে পারে না। আধখানা বিহার একেবারে লণ্ডভণ্ড হয়ে গেছে। কত মানুষ মরেছে, কত ঘরবাড়ি ভেঙে মাটিতে মিশে গেছে, কত যে মাঠঘাট ফেটে চৌচির হয়েছে তার কোনো হিসেব নেই। সেই ভয়টা তখনও আমাদের মনে থমথম করছিল।

দেখতে দেখতে একটা খবর ছড়িয়ে গেল, যোগীবাবা ভূমিকম্পের সময় হিমালয় থেকে নেমে এসেছে। এসেছে মানুষকে সাবধান করতে, বাঁচাতে। যোগীবাবা ত্রি-কালজ্ঞ পুরুষ। ভবিষ্যৎটা চোখের সামনে দেখতে পায়। এরই মধ্যে যোগীবাবা আমাদের শহরের দু চারটে ব্যাপারে এমন ভবিষ্যৎ-বাণী করেছে যে সেগুলো সব অক্ষরে অক্ষরে মিলে গেছে। তারপর থেকে দিনে দিনে খাতির বাড়ছে যোগীবাবার, মানুষজন তার কাছে ছুটছে, ছুটছে মাড়োয়ারি আর কচ্ছিরা, পাড়ার ঠাকুমা-পিসিমারা, বাবা-কাকারা। আমরা ছেলেমানুষ, অতশত বুঝি না, যা শুনি বিশ্বাস করে নিই। যোগীবাবাকে আমরাও দেখে এলাম। বিশাল চেহারা, মস্ত জটা, বড় বড় চোখ, দীর্ঘ নাক। চেলা-চামুণ্ডা গণ্ডা দুয়েক জুটে গেছে যোগীবাবার। বিস্তর প্রণামী পড়ছে যোগীবাবার পায়ে, মনোহরলালের বাড়ি থেকে এক বালতি করে টাটকা দুধ যাচ্ছে রোজ বাবার সেবায়, পাপেটলাল ঝুড়ি ভর্তি ফল রেখে আসছে বাবার পায়ে, ম্যাকসাহেবের মতন শাদা চামড়ার ইংরেজও বাবাকে দেখে এসেছে।

যোগীবাবাকে নিয়ে নানান গল্প ছড়াল। বাড়িতে বাড়িতে সে-গল্প শোনা যেতে লাগল।

শেষে বাবা একদিন সরাসরি জানিয়ে দিলেন : অমুক দিন, অমুক সময়ের মধ্যে বিরাট এক ভূমিকম্প হবে। মানুষ মরবে, পশু মরবে, গাছপালা বলে কিছু থাকবে না। আর, ঘরবাড়ি তছনছ হয়ে যাবে। খুব সাবধান।

আগের ভূমিকম্পে আমাদের শহরের বিশেষ ক্ষতি হয় নি। কিন্তু অন্য অন্য জায়গায় যা হয়ে গেছে তার ভয়ে আমরা তখনও কাঁটা হয়ে আছি। এবার আমাদের পালা। কে বাঁচবে, কে মরবে, কার ঘর ভাঙবে কে জানে! আমরা তটস্থ হয়ে পড়লাম।

যোগীবাবার দিনক্ষণ আসতে মাসখানেক দেরী ছিল। বাবার পায়ে লোকজন হত্যে দিয়ে পড়ল, বাবা আপনি বাঁচান। বাবা বলল, আরে বেটা, তোমাদের বাঁচাবার জন্যে আমি নিজে থেকে এখানে এসেছি। আমি পরমেশ্বর নই, পরমেশ্বর মরজি করলে তাকে আটকানো যায় না। তবে হ্যাঁ, আমি অত ক্ষতি করতে দেব না, থোড়া থোড়া হবে, তোমরা সাবধানে থাকবে, ঘরকা অন্দর থেকো না।

ভূমিকম্পের ভয়ে দু চারজন শহর ছেড়ে চলে গেল। কেউ কেউ ছেলেপুলে সরিয়ে দিল, টাকাপয়সা গয়না-গাটি সাবধান করল। আতঙ্কটা দেখতে দেখতে সারা শহরের টুঁটি টিপে ধরল।

শেষে ভূমিকম্পের দিন এগিয়ে এল। যোগীবাবার কথা মতন রাত দুটা নাগাদ ঘটনাটা ঘটবে। আমাদের

ছেলে মেয়েরা কিষাণ লণ্ঠনই পছন্দ করে
গৌর মোহন দাস এণ্ড কোং
ফোন-২২-৬৫৮০
২৩৩, ওল্ড চীনা বাজার স্ট্রীট-কলি-১
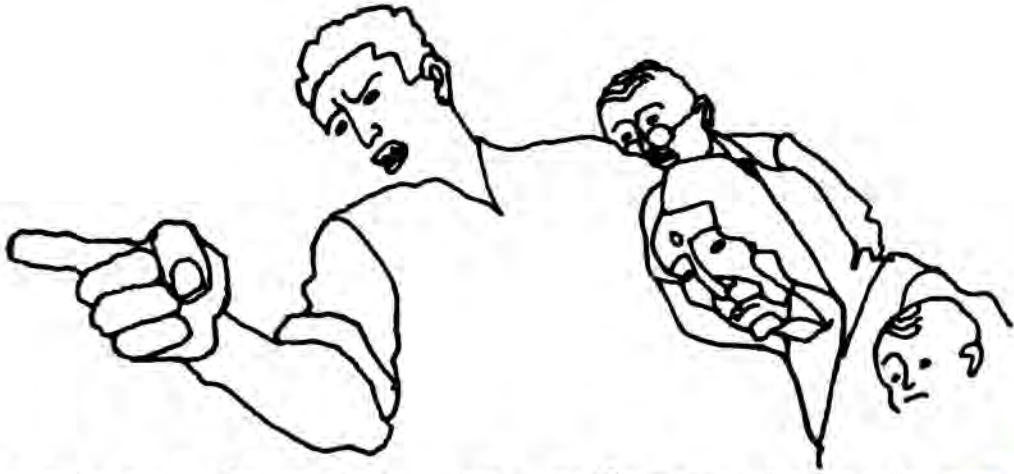
পাড়ার ছেলে-বুড়ো-মেয়েরা রাত বারোটার মধ্যে খাওয়া-দাওয়া সেরে ঠাকুর দেবতাকে প্রণাম করে সব মাঠে গিয়ে বসল। মাঠে মস্ত মস্ত তেরপল পাতা। ডে-লাইট বাতি জ্বলছে দু চারটে। বড় ছেলের দল ভলেণ্টিয়ারি করছে। মতি পাঁড়ে চা বিলি করছে। ছেলেমেয়ে চেঁচাচ্ছে। কচি-কাচারা মায়ের কোলে শুয়ে ঘুমোচ্ছে। বড়রা অনেকেই নিজের নিজের বাড়িঘর দেখছে। ভূমিকম্প শুরু হলেই দৌড়ে মাঠে এসে পড়বে। ওরই মধ্যে নিতাইমামা কীর্তন শুরু করল, যেন শেষ সময় সাহস জোগাড় করছে। অনেকগুলো গলা তার সঙ্গে মিলে গেল।

ওদিকে সময় জানান দিয়ে কার্তিকদা পেটা ঘড়িতে ঘণ্টা বাজাচ্ছে। একটা, সোয়া একটা, দেড়টা...। সময় যতই এগিয়ে আসতে লাগল, মেয়েরা কেউ কাঁদতে শুরু করল, কেউ কেউ বমি করছে, কেউ বা আবার নিজের ছেলেপুলেকে ডেকে নিয়ে কাছে বসিয়ে ইষ্টনাম জপছে। মিত্তিরঠাকুমা ওরই মধ্যে তাঁর ছেঁচা পান গালে পুরে নিয়ে বউঝিদের সামলাতে লাগলেন।

দুটো বাজল। আমাদের বুকের মধ্যে হাতুড়ির ঘা লাগল। সবাই চুপ। ডে-লাইটের আলো না থাকলে সবই অন্ধকার থাকত। ঘুটঘুটে অন্ধকার। আকাশভরা তারা, দূরে থমথম করছে অন্ধকার। চাঁদমারির দিক থেকে বাতাস ছুটে আসছে। আমরা মাটি আঁকড়ে বসে আছি, বুক কাঁপছে, কী হয় কী হয় করে সময় কাটাচ্ছি।

আড়াইটে বাজল, কিছু হল না। তিনটে বাজল, কিছু হল না। আর যেন সহ্য হচ্ছে না মানুষের। সাড়ে তিন, চার বেজে গেল। নিতাইমামা একাই গাইতে লাগল:
হরে মুরারে!

ফরসা হবার মুখে দেখা গেল ক্লান্ত শ্রান্ত হয়ে সবাই ঢুলছে, কেউ কেউ ঘুমিয়ে পড়েছে। কারও বা চোখ দুটি তখনও আকাশের দিকে।

শেষে সকাল হল। হাঁফ ছেড়ে যে যার বাড়ি ফিরতে লাগল যোগীবাবার সম্পর্কে নানারকম মন্তব্য শোনা যেতে লাগল। রঞ্জিৎদা বলল, বেটার মাথা ফাটাব। ধাপ্পা-বাজি। কী হায়রানিতে ফেলল!

যোগীবাবার ওপর সবাই দেখলাম আস্তে আস্তে খেপে যাচ্ছে। কেউ বলছে লোকটা চোর! কেউ বলছে, ধাপ্পাবাজ! কেউ বলল, ঠগ, জোচ্চোর!

খানিকটা বেলায় দেখি বাতাস ঘুরে গেছে। অন্য পাড়া থেকে কে শুনে এসেছে দুটো বেজে বিয়াল্লিশ মিনিটে ভূমিকম্প হয়েছিল। বাজার থেকে দত্তকাকা ফিরে এসে বলল, দুটো একচল্লিশে হয়েছে। বাজারপাড়া বলছে, ভূমিকম্প হয়েছিল, স্টেশনপাড়া বলছে হয়েছিল, হীরাপুরের লোক বলছে হয়েছিল। আমাদের পাড়ার চাটুজ্যেজ্যাঠা বলল, আমারও মনে হয়—দুটো পঞ্চাশ নাগাদ আমি ভূমিকম্পটা বুঝতে পেরেছিলাম। তবে খুব আস্তে। মেয়েরা ভয়ে ছুটোছুটি করবে বলে কিছু বলি নি। কী আশ্চর্য, আমাদের পাড়ার ঘরে ঘরেও তারপর শোনা যেতে লাগল, ভূমিকম্প হয়েছিল। সবাই প্রায় বুঝতে পেরেছিল।

আমার বন্ধু নীলু বলল, তুই বুঝেছিলি?

আমি বললাম, না ভাই, আমি বোধ হয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম।

নীলু বলল, ভূমিকম্প হয় নি।

আমি বললাম, তা হলে?

নীলু বলল, কী জানি!

ভূমিকম্প সত্যিই হয় নি। অন্তত আমারও ধারণা নীলুর কথাই ঠিক। কিন্তু ভূমিকম্প না হয়েও দিব্যি হয়ে গেল। শুধু তাই নয়—তার হবার সঠিক সময় নিয়ে আমাদের আট-দশটা পাড়ার লোকেদের মধ্যে মন কষা-কষি চলেছিল অনেক দিন। সবাই সত্যবাদী এটা প্রমাণ করার জেদে একবার প্রায় লাঠালাঠি বেঁধে গিয়েছিল।

যোগীবাবার আশ্রমের জন্যে মাড়োয়ারি আর কচ্ছিরা বিস্তর চাঁদা দিয়েছিল তারপর। মস্ত আশ্রম হল যোগী-বাবার। সে আশ্রম বোধ হয় আজও আছে।

ছবি এঁকেছেন সমীর সরকার

ছুটির চিঠি
ভাই ভোম্বোল
৬দিন হোল দার্জিলিং এসেছি। কি করে যে কেটে গেল
জানি না। প্রায় রোজই ঘোড়ায় চড়ছি
এর মধ্যে একদিন খুব ভোরে টাইগার হিল থেকে সানরাইজ দেখতে গেলাম।
এখানে প্রত্যেক দিন দারুন মজা।
আজ শেষ করি। কাল সকালে
গাড়ী করে জলদাপাড়ায় গন্ডার দেখতে যাব কিনা।
—ইতি তোর বন্ধু খোকন।
পুনঃ পড়াশুনা কিছু হচ্ছে না।
TCP/TB 192 A1
TOURIST LODGE
Government of West Bengal, Darjeeling Phone 656
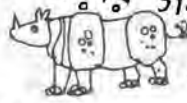
ননীদা

মতি নন্দী

ক্রিকেট সিজনের শুরুতেই ক্রিকেট ক্লাব অব হাটখোলার অর্থাৎ সি সি এইচ-এর নেট পড়ে মহামেডান মাঠের ধারে, মেম্বার গ্যালারিগুলোর পিছনে। শরিকী মাঠ, ফলে ভাগের মা-র গঙ্গা না পাওয়ার মত অবস্থা। কোন শরিকই মাঠের যত্ন করে না। পুজোর পর মাঠের মাঝখানটায় জল ঢেলে রোলার টেনে মালীরা একখণ্ড জমিকে ক্রিকেট পীচ বলে চালাবার চেষ্টা করে বটে কিন্তু ননীদা মানতে রাজী হন না। প্রতি বছরের মত ননীদা এবারও চীৎকার করে বলেন, "য়্যাঁ, শার্টের ইস্ত্রি করা কলারের মত পীচ না হলে ব্যাটসম্যান স্ট্রোক দেখাবে কী করে? ক্রিকেট কি ডাংগুলি খেলা! ভদ্দরলোকের খেলা ভদ্দর পীচ না হলে হয় কখনো? ধান ছড়িয়ে দেরে, দুর্যোধন! ধান ছড়িয়ে দে, যা একখানা পীচ বানিয়েছিস!"

"জল ঢালি রোলার দিয়েছি সকাল-সন্ধ্যা। তংকা বাড়াও বাবু ইডেন মত, মো পীচ বনাই দিব।"

"হ্যাঁ, তারপর এই মাঠেই টেস্ট খেলা হবে!"

প্রতি বছর ননীদা ঝগড়া করবেন মালীর সঙ্গে, প্লেয়ারদের সঙ্গেও। দ্বিতীয় ডিভিশনের ক্লাব। প্রতি বছরই দু-চারটে নতুন ছেলে আসে। নেটে ট্রায়াল নেওয়া হয়। সিনিয়ার প্লেয়ার হিসাবে আমি এবং আরও দু-একজন থাকি। আর ননীদা তো থাকবেনই।

আমাদের ক্লাবের তিনটি মাত্র ব্যাট। ম্যাচের দিন সেগুলির মুখ দেখা যায়। চার জোড়া প্যাড। ব্যাটিং গ্লাভস বলতে যা আছে, সেগুলো ঘামে আর ময়লায় এমন দুর্গন্ধ ছড়ায় যে উইকেটকীপাররা পর্যন্ত পিছিয়ে বসে। দুর্যোধন মালী প্র্যাকটিসের জন্য যে নেটটা বাঁশ দিয়ে খাটায় তাতে গোটাতিনেক ফুটো, যার মধ্য দিয়ে আধমণী কচ্ছপরাও অনায়াসে বেরিয়ে যেতে পারে। প্র্যাকটিসের জন্য একটা ব্যাট ঠিক করা আছে। ওজন ছ-সাত পাউন্ড, হ্যান্ডেলটা মচমচ শব্দ করে, ব্লেডের আধখানা কালো সুতোর ব্যান্ডেজে দেখা যায় না, বাকিটুকুর রঙ তেল খেয়ে খেয়ে ঘোর বাদামী। গোটাচারেক

বল প্র্যাকটিসে দেওয়া হয়। গত বছরে বা তার আগের বছরের ম্যাচে এগুলো ব্যবহৃত। এখন টিপলে ডেবে যায়, আকারে বেড়ে গেছে, সেলাইয়ের সুতোগুলো মসৃণ।

ননীদা নেটের ইন-চার্জ। নেটের পাশে সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকেন। ঘড়ি ধরে এক একজনকে দশ মিনিট ব্যাট করতে দেন। ব্যাটসম্যান বা বোলারের নানাবিধ ত্রুটির সংশোধন করাতে অনবরত কথা বলেন। ননীদা দু বছর আগেও আমাদের টিমের ক্যাপ্টেন ছিলেন। এখন উনি যে কী, সেটা বলা শক্ত। প্রেসিডেন্ট, সেক্রেটারী, ট্রেজারার, সিলেকটর, স্কোরার, মালী, সাবস্টিটিউট ফিল্ডার প্রভৃতিকে একত্রে একটা লোকের মধ্যে ভরে দিলে যা হয়, ননীদা তাই। ওর মুখের উপর কথা বলতে পারে এমন কেউ ক্লাবে নেই। দুর্যোধনের নেড়িকুত্তাটা পর্যন্ত ওর গলার আওয়াজে লেজটাকে গুটিয়ে নেয়। ননীদাকে এল-বি-ডবলু্য আউট দিয়ে একবার একজন আম্পায়ার খেলা শেষে তাঁবুতে চা-খাওয়ার জন্য আর না ফিরে, হনহনিয়ে সাইট স্ক্রীনের পাশ দিয়ে হাইকোর্ট মাঠ পেরিয়ে মহামেডান তাঁবুর পাশ দিয়ে অদৃশ্য হয়ে গেছল।

বারো বছর আগে আমি আর চিতু অর্থাৎ চিত্তপ্রিয় প্রথম যখন ননীদার সামনে পরীক্ষা দেবার জন্য হাজির হই তখন উনি আমাদেরই বয়সী একটি প্যাঙলা ফ্যাকাসে দামী শার্ট-প্যান্ট—বুট এবং চশমা-পরা ছেলেকে নেটের বাইরে দাঁড়িয়ে বোঝাচ্ছিলেন কীভাবে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলতে হয়।

"ল্যুক্। এই হচ্ছে স্টান্স। লেফট শ্যোলডার এই-ভাবে...ভালো কথা তুমি কি লেফট হ্যান্ডার?...গুড গুড, আমি একটা লেফট হ্যান্ডারই চাইছি। তিনজন আছে আরো একজন চাই। হ্যাঁ, তাহলে হবে রাইট শ্যোলডার। বোলার ডেলিভারি স্ট্রাইডে দ্যাখো, ভালো করে দ্যাখো, তখন ব্যাটের ব্যাক লিফট এই,...তারপর কী করবে?"

"ফরোয়ার্ড খেলব।" ছেলেটি খুব উৎসাহভরে চটপট জবাব দিল। ননীদা প্রায় ৩৫ সেকেন্ড ওর মুখের দিকে ঠায় তাকিয়ে রইলেন ছবির প্রদর্শনীতে দুঁদে সমালোচকের মত। তারপর বললেন, "গবেট কোথাকার। আমি কি বলেছি বলের ডেলিভারি হয়েছে? বল এখনো তো বোলারের হাতে! উইকেটের পেস কী, বাউন্স্ কী তাই জান না, আগে থেকেই বলে দিলে ফরোয়ার্ড খেলব?"

"আপনি ফরোয়ার্ড খেলাই শেখাচ্ছেন তো, তাই ফরোয়ার্ড খেলব বললুম।" ছেলেটি ঢোক গিলে বলল। ননীদা এবার ১৫ সেকেন্ড তাকিয়ে থেকে বললেন, "বলটা শর্ট পীচ কি ওভার পীচ, স্টাম্পের মধ্যে না বাইরে, কতটা সুইং বা কতটা স্পিন এ সব না দেখেই ফরোয়ার্ড খেলবে?"

ননীদার কথায় এবং ছেলেটির ভ্যাবচ্যাক মুখ দেখে চিতু মুচকি হেসেছিল। সঙ্গে সঙ্গে ডান হাতের তর্জনীটি বাঁকিয়ে ঘুড়িতে টুস্কি দেবার মত তিনবার নেড়ে ননীদা ডাকলেন, "কাম হিয়ার।" চিতু খুব স্মার্ট ছেলে। আজ পর্যন্ত ট্রামে-বাসে টিকিট কাটেনি। সিনেমা এবং ফুটবল মাঠে লাইনে না দাঁড়িয়েই টিকিট পায়।

চিতু কাছে আসতেই ননীদা কিছু বলার জন্য সবে ঠোঁট ফাঁক করেছেন, চিতু অমনি বলল, "আই অ্যাম এ লেফট হ্যান্ডার।"

ননীদার খোলা ঠোঁট দুটি একটা ফাস্ট ইয়র্কারকে সামাল দেবার মত ঝটিতি বন্ধ হয়ে গেল।

"অ্যান্ড অ্যান ওপেনিং ব্যাট লাইক নরী কন্ট্রাক্টর।" চিতু বুক চিতিয়ে বলল। কন্ট্রাক্টর তখন দারুণ খেলে। সবে অস্ট্রেলিয়ার সঙ্গে টেস্ট সেঞ্চুরি করেছে। ননীদার ঠোঁট দুটি এবার ফুলটস লেগব্রেক দেখে ব্যাট তোলার মত খুলতে শুরু করল এবং সপাটে পুল করল—"ব্যাট করতে জানে না।"

অবধারিত বাউন্ডারি সুতরাং রানের জন্য আর দৌড়ের দরকার কী, এই রকম ভঙ্গিতে ননীদার দৃষ্টি চশমা পরা ছাত্রটির মুখে আবার ফিরে এল। "ব্যাট যখন ওপর থেকে নামবে একদম পারপেন্ডিকুলার, স্ট্রেট নামবে। চলো দেখাচ্ছি।"

ননীদা যখন গুড লেংথ বরাবর পীচের উপর একটি বল রেখে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভের মহড়া দিয়ে দেখা-চ্ছিলেন চিতু তখন দাঁতে দাঁত চেপে আমায় বলল, "ব্যাট করতে জানে না কন্ট্রাক্টর! আচ্ছা!"

নেট থেকে বেরোলেন ননীদা। তাঁবুর ফেন্সিং-এর ধারে একটা জায়গার দিকে আঙুল দেখিয়ে ছাত্রটিকে বললেন, "ওখানে গিয়ে, যেমন দেখালাম ঠিক তেমনি করে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভের শ্যাডো প্র্যাকটিস করো। দুশো বার।" তারপরই চিতুর দিকে ফিরে বললেন, "ইয়েস কন্ট্রাক্টর, প্যাড অন।"

তারপর আমার দিকে তাকিয়ে চোখ সরু করে, "তোমার নাম মতি? ফাস্ট বল করো?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ।" এবং চোখের নিমেষে লিন্ডওয়ালকে হুক্ করার জন্য প্রয়োজনীয় ফুটওয়ার্কের মত যোগ করলাম, "মানে চেষ্টা করি।"

"দেখি কেমন চেষ্টা করো! যাও কন্ট্রাক্টরকে বল করো।"

এবার আমার উভয়-সঙ্কট। যদি চিতু খেলতে না পারে তাহলে ননীদাই ঠিক অর্থাৎ 'কন্ট্রাক্টর ব্যাট করতে জানে না।' সুতরাং নরীর মানসম্মান এখন আমার উপরই নির্ভর করছে আবার চিতুর হাতে বেধড়ক মার খেলে আমিই হয়তো আউট হয়ে যাব ক্লাব থেকে। মাঝামাঝি একটা পথ নিলাম। গায়ে যত জোর আছে খরচ করে বল

করতে লাগলাম, উইকেটের বাইরে দিয়ে। বলের পেসটা কেমন, ননীদা সেটুকু অন্তত বুঝুন!

চিতু প্রথমে একটু অবাক হয়ে গেছল। কিন্তু স্মার্ট ছেলে। ব্যাপারটা বুঝে গিয়ে ডাইনে-বাঁয়ে ব্যাট চালাতে শুরু করল। যেগুলো ব্যাটে-বলে হল তার বেশির ভাগই ব্যাটের কানায় লেগে স্লিপ বা উইকেটকীপারের (যদিও নেটে কেউ ছিল না) মাথার উপর দিয়ে উড়ে গিয়ে মহামেডান মাঠের কাঠের দেয়ালে ঠকাস-ঠকাস শব্দ করল।

আড়চোখে ননীদার দিকে বারকয়েক তাকালাম। দেখি একদৃষ্টে আকাশে তিনি যেন 'উড়ন্ত পিরিচ' খুঁজছেন। নেটের মধ্যে কী হচ্ছে বা না হচ্ছে সে সম্পর্কে উদাসীন। ফেনসিং-এর ধারে চশমাপরা ছেলেটি সমানে টিউবওয়েলের হ্যানডেল টেপার মত ব্যাট হাতে ওঠানামা করে যাচ্ছিল। পাম্প করা থামিয়ে এখন সে ফ্যালফ্যাল করে আমাদের দিকে তাকিয়ে। ননীদা ধীরে ধীরে আকাশবাণী ভবনের গা-বেয়ে আকাশ থেকে চোখ নামালেন। অর্ধ-নিমীলিত চোখে দূরে ইডেনের প্রেস বক্সের দিকে তাকিয়ে গুরু-গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, "কটা হল?"

বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছিলাম বল হাতে। থমকে বললাম, "গুনিনি তো!"

ননীদা আর একটু গলা চড়িয়ে বললেন, "দুশো হয়েছে?"

সঙ্গে সঙ্গে ফেনসিং-এর ধারে দ্রুতগতিতে টিউবওয়েল পাম্প শুরু হল। ননীদার আঙুলের তিনটি টুস্কিতে চিতু নেট থেকে বেরিয়ে এল।

"উই ডোণ্ট প্লে ফর ফান। ক্রিকেট একটা আর্ট, এতে সাধনা লাগে। দু রকমের ক্রিকেটার হয়। একদল ব্যাটকে কোদাল ভাবে, বাকিরা ভাবে সেতার। একদল কুলি, অন্যরা আর্টিস্ট।"

চিতুর মুখ অপমানে কালো হয়ে উঠল। আস্তে আস্তে সে নেটের পিছনে গিয়ে প্যাড খুলতে শুরু করল। ননীদা আমার দিকে তাকিয়ে চিতুকে শুনিয়েই বললেন, "উইকেট সোজা বল করবে আর লেংথে বল ফেলবে। এই দুটো কথা মাথায় ঢুকিয়ে রাখ। শুধু তখনই কথা দুটো ভুলবে যখন এই সব ফোতো ব্যাটসম্যানদের বল করবে। সোজা মাথা টিপ করে বল দেবে। কাল থেকে রেগুলার আসবে।"

চিতু আর একটিও কথা বলেনি। চশমাপরা ছেলেটির সঙ্গে আলাপ হল। নির্ভেজাল ভালোমানুষ। নাম অঞ্জন কর। অত্যন্ত সম্পন্ন ঘরের ছেলে বলেই মনে হল। ব্যাগ থেকে স্যাণ্ডউইচ বার করে আমাদের দিল। আমি নিলাম, চিতু মুখ ফিরিয়ে রইল। বললাম, "ও ভীষণ রেগে গেছে। আপনি কিছু মনে করবেন না।"

অঞ্জন বলল, "জানি, রাগ করারই কথা। কাল ব্যাক লিফট শিখেছি—দুশোবার ব্যাট তুলতে হয়েছে আর নামাতে হয়েছে। কাল ব্যাক ডিফেন্সিভ স্ট্রোক শিখতে হবে!"

অঞ্জন কোমরে হাত দিয়ে অসহায়ের মত আমার দিকে তাকিয়ে রইল। স্যাণ্ডউইচ চিবোতে চিবোতে বললাম, "তারপর আছে ড্রাইভ, হুক, পুল, কাট।"

"তারপর স্ট্রোক শেখা?" আমি জানতে চাইলাম।

শিউরে উঠে অঞ্জন বলল, "না, না, তারও আগে ফিলডিং শিখতে হবে বলেছে ননীদা। দুশো থ্রো আর দুশো ক্যাচ লোফা—রোজ!"

"না, না, তারপর রানিং বিটুইন দ্য উইকেট। প্যাড পরে ব্যাট হাতে দুশোবার।"

এই সময় চিতু খুব বিরক্ত স্বরে আমায় বলল, "খাওয়া হল তোর, না, সারাদিন শুধু দুশোর গপ্পোই শুনবি। ঢের ঢের ক্লাব আছে গড়ের মাঠে।" তারপর অঞ্জনকে উদ্দেশ্য করে বলল, "কিসসু হবে না আপনার। এভাবে উজবুকের মত শিখে ক্রিকেটার হওয়া যায় না, বুঝলেন?"

হতভম্ব অঞ্জনকে ফেলে রেখে চিতু আমায় টানতে টানতে রেড রোড পর্যন্ত নিয়ে এল। "ফোতো কিনা দেখাব, একবার বাগে পাই।"

ক্রিকেট ক্লাব অব হাটখোলার বরাবরের প্রতিদ্বন্দ্বী রূপোলি সঙ্ঘের সম্পাদকের সঙ্গে পরদিনই চিতু দেখা করল। আমি কিন্তু হাটখোলাতেই রয়ে গেলাম।

॥ দুই ॥

বারো বছর পর আজ হঠাৎ প্রথম দিনের অভিজ্ঞতার কথা আমার মনে পড়ল।

নেটের ধারে আমি, ননীদা আর ভবানী। সাত-আটটি ছেলে বোলারদের পিছনে ছড়ানো।

"হল না, হল না," বলতে বলতে ননীদা নেটের মধ্যে ঢুকে ছেলেটির হাত থেকে ব্যাটটা ছিনিয়েই নিলেন। "বলের লাইন হচ্ছে এই আর তোমার পা থাকছে এখানে......লাইনে পা আনো।" ননীদা কাল্পনিক বলের লাইনে পা রেখে ব্যাট চালালেন এবং একস্ট্রা কভারে কাল্পনিক বলটির বাউণ্ডারি লাইন পার না হওয়া পর্যন্ত উঠলেন না।

"এইভাবে ড্রাইভ করবে, বলের উপর কাঁধ আর মাথা এনে।"

ননীদা বেরিয়ে এসে আমার পাশে দাঁড়িয়ে বললেন, "স্ট্রেট ব্যাট, বুঝলে, আর ডিফেন্স। এই দুটো না শিখেই আজকালকার ছেলেরা ভাবে সোবারস হওয়া যায়।"

ছেলেটি মুখ ঘুরিয়ে ননীদার দিকে তাকাল একবার। কাঁধটা ঝাঁকিয়ে ব্যাট হাতে স্টান্স নিল। তিনটি ছেলে বল করছে। প্রথম বলটি লেগ স্টাম্পের অনেক বাইরে। ছেড়ে দিল। ননীদা বলে উঠলেন, "গুড।" পাঁচে কতকগুলো ইঁটের টুকরো মাটির উপরে মাথা তুলে

রয়েছে। তারই একটিতে পড়ল দ্বিতীয় বলটি। সোজা ফণা তোলার মত বলটি খাড়া হয়ে ছেলেটির কপাল ছুঁয়ে নেটের বাইরে পড়ল। ছেলেটির মুখ মুহূর্তের জন্য ফ্যাকাসে হয়ে গেল। ননীদা আক্ষেপ করলেন, "আহ্, হুক করার বল ছিল এটা।"

তৃতীয় বল পীচে পড়ার আগেই ছেলেটি লাফিয়ে বেরোল। বোধ হয় ড্রাইভ করতেই চেয়েছিল। ব্যাটটা একটু তাড়াতাড়ি চালানোয় বলটা উঠে গেল এবং রাস্তা পার হয়ে অন্তত ৭০ গজ দূরে কাস্টমস মাঠে গিয়ে পড়ল। ননীদা উত্তেজিত হয়ে বললেন—

"দ্যাখো, দ্যাখো, বলের লাইন থেকে পা কতদূরে!"

"তার আগে বলটা দেখুন।" ছেলেটি ব্যাট তুলে দেখাল এবং আবার বলল, "এতে ছটা রান পাওয়া যাবে। সোবারস হলে তাই করত।"

"তাই নাকি, সোবারস এইভাবে ব্যাট চালাতো?"

"মনে তো হয়। এরকম পীচে বলের লাইনে এসে খেলা মানে মাথাটা ফাটানো।"

ননীদার মুখ থমথমে হয়ে উঠল। ভবানী আর আমি দ্রুত চোখ মেলালাম পরস্পরে। ননীদা হঠাৎ "দুর্যোধন, দুর্যোধন" বলে চীৎকার করতে করতে তাঁবুর দিকে রওনা হলেন।

ভবানী বলল, "ঠিকই জবাব দিয়েছে।"

আমি বললাম, "ননীদা এখন আগের তুলনায় অনেক নরম হয়ে গেছে। এরকম জবাব বারো বছর আগে শুনলে সহ্য করত না।"

"তোমার নামটা কী ভাই!" ভবানী চেঁচিয়ে বলল।

"তন্ময় বোস।" ছেলেটি আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসল। তারপরই নিখুঁত একটি লেট কাট করল। আমি সঙ্গে সঙ্গে তাঁবুর দিকে তাকালাম—ননীদা কোথায় দেখার জন্য। ফেনসিং-এর গেটে দাঁড়িয়ে দুর্যোধনের সঙ্গে কথা বলছেন, কিন্তু চোখ নেটের দিকে। দেখলাম মাথাটা বিরক্তিভরে দুবার নেড়ে নিলেন। আমি জানি ননীদা এখন মনে মনে কী বলছেন। বারো বছর আগে আমায় বলেছিলেন, "ফ্যানসি শট, এ সব হচ্ছে ফ্যানসি শট। সিজন শুরু হবার একমাসের মধ্যে খবরদার লেট কাট করবে না।"

"ন্যাচারাল ক্রিকেটার। ছেলেটার হবে মনে হচ্ছে।" ভবানী ভারিকি চালে বলল, "অবশ্য যদি গেঁজে না যায়।"

আমি মাথা নেড়ে সায় দিলাম।

কালো কুচকুচে। ঝকঝকে দাঁত। ছিপছিপে বেতের মত দেহ। তন্ময়কে অনায়াসে ওয়েস্ট ইণ্ডিয়ান বলে চালিয়ে দেওয়া যায়। খেলেও সেই রকম। কোন কিছুর তোয়াক্কা নেই। চলনে বলনে ঔদ্ধত্য ফুটে ওঠে। একদিন সে বলল, "আরে ধ্যেৎ, ক্রিকেট খেলে কোন লাভ নেই। ফুটবলে পয়সা আছে।" আর একদিন বলল, "শীত-কালটায় রোদ পোয়াব বলেই ক্রিকেট খেলি। নয়তো কে এই খুটখাট খেলার জন্য সময় নষ্ট করে!" ননীদা এসব কথা শুনেছেন। একদিন আমায় বললেন, "ঘাড় ধরে ক্লাব থেকে বার করে দেবো। নেহাত ছেলেটার পার্টস আছে তাই সহ্য করে যাচ্ছি।" আর একদিন তন্ময় সিগারেট টানতে টানতে তাঁবুতে ঢুকল। ননীদা আর একটি ছেলেকে দিয়ে বলাল, তাঁবুর মধ্যে সিগারেট খাওয়া চলবে না। তন্ময় আড়চোখে ননীদার দিকে তাকিয়ে তাঁবুর দরজার ঠিক বাইরে দাঁড়িয়ে সিগারেটটা শেষ করল।

॥ তিন ॥

প্রতি বছর মরশুম শুরুর আগে ক্লাবের মেম্বারদের নিয়ে একটা ম্যাচ হয়। নেহাতই এলেবেলে ধরনের খেলা। ক্লাবের প্রেসিডেন্ট একদলের ক্যাপটেন অন্য দলের ননীদা। যাদের দাক্ষিণ্যে ক্লাব চলে তাদের খুশী করার জন্যই খেলাটা হয়। সেদিন লাঞ্চটাও হয় একটু বিশেষ রকমের। সদস্যদের বাড়ির বউ মেয়েরাও খেলা দেখতে আসে।

এবারের প্রেসিডেন্ট চাঁদমোহন শ্রীমানী নাকি এক-কালে ক্রিকেট খেলতেন বলে জানিয়েছেন। চিনি, মাছ আর ঘি-এর আড়তদার। রেশনের আর কাপড়ের দোকানও গুটি কয়েক আছে। ননীদা জানালেন, "ব্যাটা এখনো ব্যাটের সোজাদিক-উল্টোদিক কোনটে জানে না।"

শ্রীমানী বছরে দেড় হাজার টাকা দেবেন এবং পাঁচটি টেস্ট ম্যাচের টিকিট পাবেন, এই কড়ারে প্রেসিডেন্ট হয়েছেন। গৃহিণী, চার ছেলে এবং দুই মেয়েকে নিয়ে দুটি মোটরে হাজির হলেন। সঙ্গে পাঁচ বাক্স সন্দেশ, পাঁচ হাঁড়ি দই ও এক ঝুড়ি কমলালেবু। অ্যাটর্নি মাখন দত্ত ত্রিশ কিলো আলু, দশ কিলো পাঁউরুটি, দশ কিলো তেল ও কুড়ি কিলো মাংসের দাম এই মরশুমে দেবেন তাই ভাইস-প্রেসিডেন্ট। তিনিও সপরিবারে হাজির। শ্রীমানীগিন্নীর পাশে বসলেন দত্তগিন্নী।

ননীদার টিমে ক্লাবের এবারের নবাগতরা। নিয়মিত খেলোয়াড়দের অধিকাংশই এ ম্যাচে খেলে না। প্রেসিডেন্টের টিমে কর্মকর্তারা এবং তাদের বাচ্চা ছেলেরা। তবে একজন উইকেটকীপার ও দুজন বোলার রেগুলার টিম থেকে মজুত রাখা হয় ওদের জন্য। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সাধারণত, তাদের ডাক পড়ে। দু দলে পনেরোজন করে খেলে। কতকগুলো অ-ঘোষিত নিয়ম এই ম্যাচটির জন্য আছে। সেগুলো দুই আম্পায়ার, ননীদা আর আমার মত খুব পুরনো দু একজনই শুধু জানে। ননীদা চার বছর আগে রিটায়ার করে গেলেও এই ম্যাচটিতে অধিনায়কত্ব করেন। গত আঠারো বছর ধরে করছেন এবং আমার মত অনেকেরই ধারণা, আমৃত্যু করবেন।

লাঞ্চ পর্যন্ত আমি স্কোরার। তারপর আম্পায়ার হব। আমার পিছনে দর্শকরা চেয়ারে ও বেঞ্চে বসে। কানে এল শ্রীমানীগিন্নী বলছেন, "সেই কবে খেলতেন, কোন জিনিসই তো আর নেই। প্যান্ট পরাও অনেকদিন হল ছেড়ে দিয়েছেন। তাই আর্জেন্ট অর্ডার দিয়ে প্যান্ট, জামা, বুট করালেন। খেলার যে কী শখ কী বলব। তিরিশ বছর আগে গোরাদের সঙ্গে খেলায় একবার নিয়ে গেছলেন। তখন সবে বিয়ে হয়েছে। একটা লালমুখো কী জোরে জোরে বল দিচ্ছিল, বাব্বাঃ, দেখে তো আমি ভয়ে কাঁপছি। একজনের মাথা ফাটল, আর একজনের আঙুল ভাঙল। উনি বললেন, দাঁড়াও ব্যাটাকে দেখাচ্ছি। তারপর ব্যাট করতে গিয়ে বলে বলে ছক্কা মারতে লাগলেন। শেষকালে সাহেবটা হাতজোড় করে বলল, মিস্টার শ্রীমানী অপরাধ হয়েছে এবার ক্ষান্ত হোন। তখন উনি বললেন, "মনে রেখো টিট ফর ট্যাট উই ক্যান ডু।"

"ওর চেহারা দেখে মনে হচ্ছে খুব হাঁকড়ে খেলতেন!" দত্তগিন্নীর সম্ভ্রমসূচক কণ্ঠস্বর কানে এল।

"একটু অপেক্ষা করুন, নিজেই দেখতে পাবেন।" শ্রীমানীগিন্নীর গলায় চাপা অহঙ্কার, চট করে ঘাড় ফিরিয়ে দেখলাম ডিবে থেকে পান বার করে তিনি দত্ত-গিন্নীকে দিচ্ছেন।

খেলাটা ভালো ভাবেই শুরু হল। শ্রীমানী ইলেভেনের পক্ষে প্রথম ব্যাট করতে নামল মাখন দত্ত আর পল্টু চৌধুরী। তার আগে ক্যাপ্টেন শ্রীমানী দুজনকে জানিয়ে দিলেন, "তাড়াহুড়ো করবেন না। দেখে দেখে খেলুন, বলের পালিশ উঠে গেলে একটুখানি হাত খুলবেন। তারপর আমি তো আছিই।"

ননীদা বরাবরই সি কে নাইডু ভক্ত!

মাঠে চলাফেরা, বোলারদের সঙ্গে পরামর্শ, ফিল্ড সাজানো, অ্যাপীল করা, সব কিছুই সি কে-র মত। নতুন একটি ছেলেকে দিয়ে মাখন দত্তর বিরুদ্ধে বল শুরু করলেন। প্রবল উৎসাহের জন্যই ছেলেটির প্রথম বলটি ফুলটস হয়ে গেল। মাখন দত্ত ঘাবড়ে গিয়ে পিছিয়ে যাবার সময় ব্যাটটিকে হাতপাখার মত সামনে একবার নেড়ে দিলেন। ব্যাট থেকে তীরবেগে বলটি শ্লিপে দাঁড়ানো তন্ময়ের পাশ দিয়ে থার্ডম্যান বাউন্ডারিতে চলে গেল। হৈ হৈ করে উঠল দর্শকরা। শ্রীমানী চেঁচিয়ে নির্দেশ পাঠালেন, "তাড়াহুড়ো নয়, তাড়াহুড়ো নয়।"

পরের দুটি বল চমৎকার আউট সুইংগার। মাখন দত্তর অফ স্টাম্প ঘেঁষে বেরিয়ে গেল। ননীদা বোলারের কাছে গিয়ে কী যেন বললেন। ছেলেটি অবাক হয়ে ওর-দিকে তাকিয়ে থেকে কী বলতে যাচ্ছিল, ননীদা ততক্ষণে শর্ট লেগে নিজের জায়গার দিকে রওনা হয়ে গেছেন। সি কে-র সিদ্ধান্তের উপর আর কথা চলে না। পরের তিনটি বল লোপ্পাই ফুলটস এবং লেগ স্টাম্পের বাইরে। মাখন দত্ত তিনবার ঝাড়ু দিলেন, ব্যাটে-বলে হল না। পরের ওভারে স্বয়ং ননীদা বোলার। ভালো লেগব্রেক করাতেন এক সময়। পল্টু চৌধুরীকে দুটি বলই অফ স্টাম্পের বাইরে লেগব্রেক করলেন। ক্যাপ্টেনের নির্দেশ

ভুলে পল্টু চৌধুরী ব্যাটটাকে ছিপের মত বাড়িয়ে রইলেন। বল তিনবার ব্যাটে লেগে পয়েন্টের দিকে গেল।

"ইয়েস্‌স্‌স্‌" বলেই চৌধুরী দৌড়ল। তন্ময় ছুটে গিয়ে বলটা কুড়িয়ে উইকেটকীপারকে দিতেই সে যখন উইকেট ভাঙল মাখন দত্তের তখন ক্রীজে পৌঁছতে চার হাত বাকি। আম্পায়ার হাবলোদা দ্বিধাহীন কণ্ঠে বললেন, "নট আউট।"

দেখলাম তন্ময় বিরক্ত হয়ে কাঁধ ঝাঁকালো। শিলপের অন্যরা যখন ক্যাচের প্রত্যাশায় হাঁটুভেঙে ঝুঁকে পড়ছে, তন্ময় তখন কোমরে হাত দিয়ে সিধে দাঁড়িয়ে। ননীদা তাই দেখে গম্ভীর হলেন। কিন্তু ওর অবস্থাটা আমি জানি। ক্লাব চালাতে হলে কতভাবে লোককে খুশী করতে হয় সেটা ইতিমধ্যে আমারও জানা হয়ে গেছে। এই ম্যাচে শ্রীমানীকে হাফ-সেঞ্চুরি করাতে আর ওর টিমকে জেতাতে না পারলে সামনের বছর ওকে প্রেসিডেন্ট রাখা দায় হয়ে পড়বে। এসব কথা (ননীদা বলেন, স্ট্র্যাটেজি!) নতুন ছেলেদের কাছে তো আর ফাঁস করা যায় না।

এক ঘণ্টা খেলার পর শ্রীমানী ইলেভেনের স্কোর পাঁচ উইকেটে ৮১। মাখন দত্ত ৩১ নট আউট। যে পাঁচজন আউট হয়েছে তারমধ্যে একমাত্র বিকাশ চাটুজ্জেই বছরে এক ডজন বল ও একটি ব্যাটের দাম দেন। তিনি ঠিক ২৫ রানের মাথায় আউট হয়েছেন। হাবলোদা আর পটাবাবু এ পর্যন্ত নির্ভুল আম্পায়ারিং করে গেছেন। তারা দুজনে, আঠারোটা এল-বি-ডবল্যু, সাতটা রান আউট ও নটা স্টাম্পিং আবেদন নাকচ করেছেন।

সাড়ে বারোটায় লাঞ্চ। তারপর ননীদার ইলেভেন ব্যাট করবে। চাঁদমোহন শ্রীমানীকে যদি হাফ-সেঞ্চুরি করতে হয় তাহলে অন্তত সাড়ে এগারোটায় তাকে ব্যাটিং-এ নামানো দরকার। একটা কাগজে এই গুরুত্বপূর্ণ তথ্যটি লিখে মাঠে ননীদার কাছে পাঠিয়ে দিলাম। ননীদা পাঠ করেই হাত তুলে আমাকে বোঝালেন, ব্যস্ত হবার কিছু নেই। পরের ওভারেই তিনি তন্ময়কে ডাকলেন বল করার জন্য।

ব্যাটিং অর্ডারে সাতজনের পর শ্রীমানীর নাম। (নিজেকে শেষের দিকে রেখেছে এই জন্য, 'যদি ঝরঝর করে উইকেট পড়ে তাহলে আটকাবে কে!'—শ্রীমানীর বিজ্ঞতায় স্তম্ভিত আমার মুখ দেখে ননীদা পর্যন্ত খুশী হয়েছিলেন!) বোলিং চেঞ্জ দেখে বুঝলাম ননীদা এই ওভারেই একজনকে আউট করিয়ে শ্রীমানীকে নামাচ্ছেন। স্ট্র্যাটেজিতে ননীদার কোন খুঁত নেই। শ্রীমানীকে দেখলাম প্যাড পরে ব্যস্ত হয়ে এলেন তাঁর স্ত্রীর কাছে।

"ওগো সন্দেশ আর দইগুলো এবার গাড়ি থেকে আনিয়ে রাখো।"

"আনাচ্ছি। তোমার ব্যাট করাটা একটু দেখোনি।"

"ও আর দেখার কী আছে।"

"আহা, আমিই শুধু দেখব নাকি, মিসেস দত্তও দেখবেন বলে অপেক্ষা করছেন।"

"মিস্টার দত্ত যা ব্রিলিয়াণ্টলি খেলছেন, এরপর আমার ব্যাট কি আপনার ভালো লাগবে মিসেস দত্ত?"

"উনিতো শুধুই খুট খুট করছেন। আপনি সেই সাহেব বোলারটাকে যেমন ছক্কা মেরেছিলেন, সেই রকম আজ নিশ্চয়ই দেখব।"

"ওহ্, সে গল্প বুঝি এর মধ্যেই শোনা হয়ে গেছে।"

দত্তগিন্নী কী একটা বলতে যাচ্ছিলেন, তখনই মাঠ থেকে ননীদার বিকট চীৎকার উঠল "আউজাট?" পটাবাবু পরিচ্ছন্ন কট অ্যান্ড বোল্ড হওয়া মাখন দত্তকে বিদায় সঙ্কেত জানাতে এবার আর দ্বিধা করলেন না। ৩১ রানেই, হাসতে হাসতে তিনি ফিরলেন।

"ওয়েল প্লেড।" চাঁদমোহন শ্রীমানী মাঠে নামতে নামতে মাখন দত্তকে তারিফ জানালেন। তন্ময় কোমরে হাত দিয়ে একদৃষ্টে শ্রীমানীর দিকে তাকিয়ে। ননীদা তার স্ট্র্যাটেজি অনুযায়ী লেগ সাইড থেকে ফিল্ডার সরিয়ে ফাঁকা করে দিলেন যাতে রান ওঠার গতি ব্যাহত না হয় বা শ্রীমানীর ক্যাচ কেউ না ধরে ফেলে। তারপর তন্ময়কে ডেকে কানের কাছে মুখ নিয়ে কী যেন বললেন, তন্ময় বাধ্যের মত মাথা নাড়ল।

চাঁদমোহন শ্রীমানী উইকেটে পৌঁছলেন অতি মন্থর গতিতে। পৌঁছেই পীচ পরীক্ষায় ব্যস্ত হলেন। কয়েকটা কাঁকর খুঁটে ফেললেন। স্থানে স্থানে ব্যাট দিয়ে ঠুকলেন। তারপর গ্লাভস পরতে শুরু করলেন। পরা হয়ে গেলে হাবলোদার কাছে গার্ড চাইলেন, ওয়ান লেগ। তারপর বুটের ডগা দিয়ে ক্রিজে দাগ কাটলেন। এরপর শুরু করলেন ফিল্ড প্লেসিং নিরীক্ষণ। তাও হয়ে যাবার পর, স্টান্স নিলেন। তন্ময় একদৃষ্টে ওকে এতক্ষণ দেখে যাচ্ছিল। এবার বল করার জন্য ছুটতে শুরু করা মাত্র শ্রীমানী উইকেট থেকে সরে গেলেন।

কী ব্যাপার?

সাইট স্ক্রীনের সামনে দুর্যোধনের কুকুরটা ঘাড় চুলকোতে ব্যস্ত।

হৈ হৈ করে হাবলোদা ছুটে গেলেন। কুকুরটা চটপট দৌড় দিল। শ্রীমানী আবার চারদিকের—ঠিকমত বললে তিনদিকের—ফিল্ড প্লেসিং দেখে নিয়ে তৈরী হয়ে দাঁড়ালেন। মুখে মৃদু হাসি।

অদ্ভুতভাবে বলটা ঢুকল অফ স্টাম্পের বাইরে থেকে। মাটিতে পড়ে অতখানি ব্রেক করে এলে যে কোন টেস্ট ব্যাটসম্যানও মুশকিলে পড়ে যাবে। বলটা শ্রীমানীর ব্যাট আর প্যাডের মাঝ দিয়ে এসে লেগ স্টাম্পটাকে শুইয়ে দিল।

সারা মাঠ বোবা হয়ে গেল। মাঠের বাইরে দর্শকদের গুঞ্জন থেমে গেল। শ্রীমানী ফ্যালফ্যাল করে উপড়ানো

বিশ্ব বিশ্বাসের
কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ···· ২.০০
কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ···· ২.৫০
সাহিত্য সম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র · ২.০০
নেতাজী সুভাষচন্দ্র ···· ২.০০
মহাত্মা অশ্বিনীকুমার দত্ত · ২.০০
বিজ্ঞান সাধক জগদীশচন্দ্র · ১.৫০
কর্ম যোগী বিধানচন্দ্র ·· ২.০০
ভক্তি কবি রামপ্রসাদ ·· ২.০০
বিদ্রোহী কবি নজরুল · ২.০০
জহরলাল নেহেরু ·· ২.০০
আচার্য পি. সি. রায় ২.০০
ম্যাকসিম গোর্কি · ২.০০
বাঙালীর পরিচয় · ১.৫০
শেক্সপীয়রের কয়েকখানি নাটকের
গৌরীশঙ্কর মুখোপাধ্যায়ের
কথাসরিৎ সাগরের গল্প ·· ১.৫০
ভারতের রূপকথা ···· ২.০০
ফণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
রূপকুমারের রূপকথা ·২.৫০
গল্পের কস্তুরী ··· ২.০০
সুজিত কুমার নাগ
সদা মামার অভিযান ···· ২.০০
রূপকথার আসর
অশোক গুহের
আরবের রূপকথা
যত অপরূপ রূপকথা ·· ৩.০০
এনক আর্ডেন ···· ১.৫০
বেনহুর ···· ২.০০
চিত্তরঞ্জন গুহের
সাজ সজ্জা অভিনয় · ২.৫০
বিজন দ্বীপে রবিনসন · ২.৫০
চির নতুন যুগে যুগে · ১.৫০
ভারত পুত্র লালবাহাদুর · ২.০০
মহামায়া দেবীর
শ্রীশ্রী রামকৃষ্ণ · ২.৫০
ভগিনী নিবেদিতা · ২.০০
স্বামী বিবেকানন্দ · ২.৫০
জগন্মাতা সারদামণি · ২.০০
করুণাময়ী রাণী রাসমণি · ২.৫০
গৌর প্রিয়া বিষ্ণুপ্রিয়া ·· ৪.০০
অমৃতলাল বন্দ্যোপাধ্যায়ের
দয়ারসাগর ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর · ২.০০
সত্যাগ্রহী মহাত্মা গান্ধী
আশুতোষ মুখোপাধ্যায়
বিপ্লবী রাসবিহারী বসু
দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন
মাইকেল মধুসূদন
ঋষি অরবিন্দ · ২.৫০
বিশ্বাস পাবলিশিং হাউস
৫/১এ, কলেজ রো · কলিকাতা-৯

স্টাম্পটার দিকে তাকিয়ে। ননীদা কটমট করে তাকিয়ে তন্ময়ের দিকে। তন্ময় আকাশে তাকিয়ে শিস দিচ্ছে। চাঁদমোহন শ্রীমানী অবশেষে ফিরতে শুরু করলেন।

"নো বল!"

চমকে সবাই ফিরে দেখল, হাবলোদা গম্ভীর মুখে ডান হাতটি ট্র্যাফিক পুলিশের মত বাড়িয়ে। ননীদা ছুটে গেলেন শ্রীমানীকে ফিরিয়ে আনতে। ফিল্ডাররা ফ্যালফ্যাল করে হাবলোদার দিকে তাকিয়ে। তন্ময় ঘুরে দাঁড়িয়ে জ্বলন্ত চোখে শ্রীমানীর প্রত্যাবর্তন দেখছে।

এরপরের বলটি সোজা কপাল টিপ করা। শ্রীমানী কোনক্রমে হাতটা তোলার সময় পান তাই বলটা কনুইয়ে লেগে খটাং শব্দ করল। শব্দের ধরনে সবাই বুঝে গেল হাড় ভেঙেছে। ওকে যখন মাঠের বাইরে আনা হল, তন্ময় তখন হাসছে। তাড়াতাড়ি শ্রীমানীকে তার গাড়িতেই হাসপাতালে পাঠানো হল। সঙ্গে গেলেন ওর বাড়ির সবাই এবং ননীদা। যাবার আগে ননীদা আমাকে শুধু বললেন "আমার দোষেই এটা হল। তন্ময় এমন করবে জানলে বল করতে দিতুম না।"

আর লাঞ্চের সময় তন্ময় বেশ জোরেই তার পাশে বসা ছেলেটিকে বলল, "য়্যাঁ, প্রেসিডেন্টের সঙ্গে দই-সন্দেশও গাড়িতে করে চলে গেল! অ্যাই অ্যাম সরি, রিয়েলি সরি। ইস্‌স, আগে জানলে লাঞ্চটা নষ্ট করতুম না।"

তন্ময়ের এই কথায় আমি বিরক্ত বোধ করলাম। লাঞ্চের পর সবাই গল্প-গুজবে ব্যস্ত, তখন ওকে একধারে ডেকে নিয়ে গিয়ে বললাম আজকের ম্যাচের উদ্দেশ্য। মন দিয়ে শুনল কিন্তু কোন ভাবান্তর হতে দেখলাম না। বলল, "ক্লাবের যখন এতই দুরবস্থা তাহলে ক্লাব রাখা কেন! আর রাখতেই যদি হয়, তাহলে ফার্স্ট ডিভিশনে ওঠার জন্য চ্যাম্পিয়ানশীপ ফাইট করা উচিত।"

"প্লেয়ার কোথায়?" আমি বললাম, হতাশা এবং অনুযোগ মিশ্রিত স্বরে।

"এই টিম নিয়েই আমি ফাইট করব, দেবেন আমায় সব দায়িত্ব?"

আমি অবাক হয়ে শুধু তাকিয়ে রইলাম। উত্তেজনায় ও উৎসাহে তন্ময়ের চোখমুখ ঝকমক করছে। "সব ভার আমায় দিন, দেখবেন সামনের বছরই সি সি এইচ, মোহন-বাগান, কালীঘাট, স্পোর্টিং ইউনিয়নের সঙ্গে লীগ খেলবে। তবে ননীদার মাতব্বরি একদমই কিন্তু চলবে না। লাঞ্চ-টাঞ্চ, মালী, মাঠ, খাতাপত্তর এই সব নিয়েই তিনি থাকুন, টিম আর খেলায় নাক না গলালেই হল।"

"তুমি এখনো যথেষ্ট ছেলেমানুষ তন্ময়। নতুন এসেছ, এখনো এ ক্লাবের কিছুই জান না!" আমি আস্তে আস্তে বললাম, "ননীদাকে বাদ দিলে সি সি এইচ উঠে যাবে। আর ওকে বাদ দেওয়ার ক্ষমতা কারুরই নেই। তিরিশ বছর এই ক্লাব নিয়ে পড়ে আছেন। বউ পাগল, ছেলেপুলে নেই, মাইনের সব টাকাই ক্লাবে ঢালেন। মাঠে নেমে ম্যাচ জিতলেই ক্লাব চলে না। অজস্র খুঁটিনাটি কাজ আছে, যেগুলো করার লোক পাওয়া যায় না। আমি নিজেও ফাঁকি দিয়ে এড়িয়ে যাই।" লক্ষ করলাম কথা-গুলো ওর মনে দাগ কাটছে না, তাই সুর বদল করে বললাম, "আমিও কি ননীদার সব ব্যাপার পছন্দ করি ভেবেছ? বিশেষ করে ওর কথাবার্তা? কিন্তু মানিয়ে চলি। হাজার হোক বয়স্ক লোক তো। তুমিও মানিয়ে নাও। আমার এই অনুরোধটা রাখো। তাছাড়া এ বছর আমি ক্যাপ্টেন, তোমার কোন অসুবিধা হবে না।"

কী যেন ভেবে নিয়ে তন্ময় বলল, "আচ্ছা, দেখি।"

।। চার ।।

আমার যা কিছু অধিনায়কত্বের শিক্ষা ননীদার কাছেই। ননীদার প্রধান থিওরি—টিম যখন দুর্বল তখন জেতার বা বাঁচার একমাত্র উপায় স্ট্র্যাটেজি। সেটা নির্ভর করবে স্থান, কাল, পাত্রের উপর। এজন্য তিনটি জিনিসে তিনি জোর দেন : (১) আইনের ফাঁক খুঁজে বার করে তার সুযোগ নেওয়া। (২) আম্পায়ারদের স্টাডি করে তাদের দুর্বলতার সুযোগ নেওয়া। (৩) বিপক্ষ প্লেয়ারদের নানাপ্রকার ধাঁধায় ফেলা। যেমন ডবল্যু জি গ্রেস করতেন।

ননীদার থিওরি আমাদের অনেক হারা ম্যাচ জিতিয়েছে। তরুণ মিলনের সঙ্গে খেলায় ওদের ৪৮ রানে নামিয়ে আমরা করলুম ৭ উইকেটে ৩২। হার অবধারিত। ননীদা তখন খেলতে নামলেন। আর একদিকে ব্যাট করছে চশমা-পরা অঞ্জন। ননীদা প্রথমেই অঞ্জনকে বলে দিলেন, "শুধু ডিফেন্স করে যাও। বলের লাইনে পা, মাথা নিচু, স্ট্রেট ব্যাট। বাকি যা করার আমি করছি।

এরপর ননীদা নন্‌-স্ট্রাইকার এন্ডে গিয়ে ওদের সাত রানে পাঁচ উইকেট পাওয়া ফাস্ট বোলারটির সঙ্গে কথা বলতে শুরু করে দিলেন। আমাদের দুজন ব্যাটসম্যানের কপালে আলু তৈরী এবং একজনের দুটি দাঁত কমিয়ে দেওয়ার জন্য এই বোলারটিই দায়ী। ফাস্ট বোলারটি বল করার জন্য বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে, ননীদাও কথা বলতে বলতে তার সঙ্গে চললেন।

"অফ স্পিন বোলারকে এতটা দৌড়ে এসে বল করতে আগে কখনো দেখিনি।" ননীদা খুবই বিস্মিত স্বরে বললেন।

"তার মানে? আমি কি স্লো বোলার?" থেমে গিয়ে ফাস্ট বোলারটি বলল।

"তাইতো মনে হচ্ছে।" নিরীহ মুখে ননীদা একগাল হাসলেন।

রাগে ফাস্ট বোলারের চোখ দুটি যেন ঠিকরে বেরিয়ে আসছে। চেঁচিয়ে সে আম্পায়ারকে বলল, "আম্পায়ার, আপনি কি এ-লোকটার কান্ড দেখতে
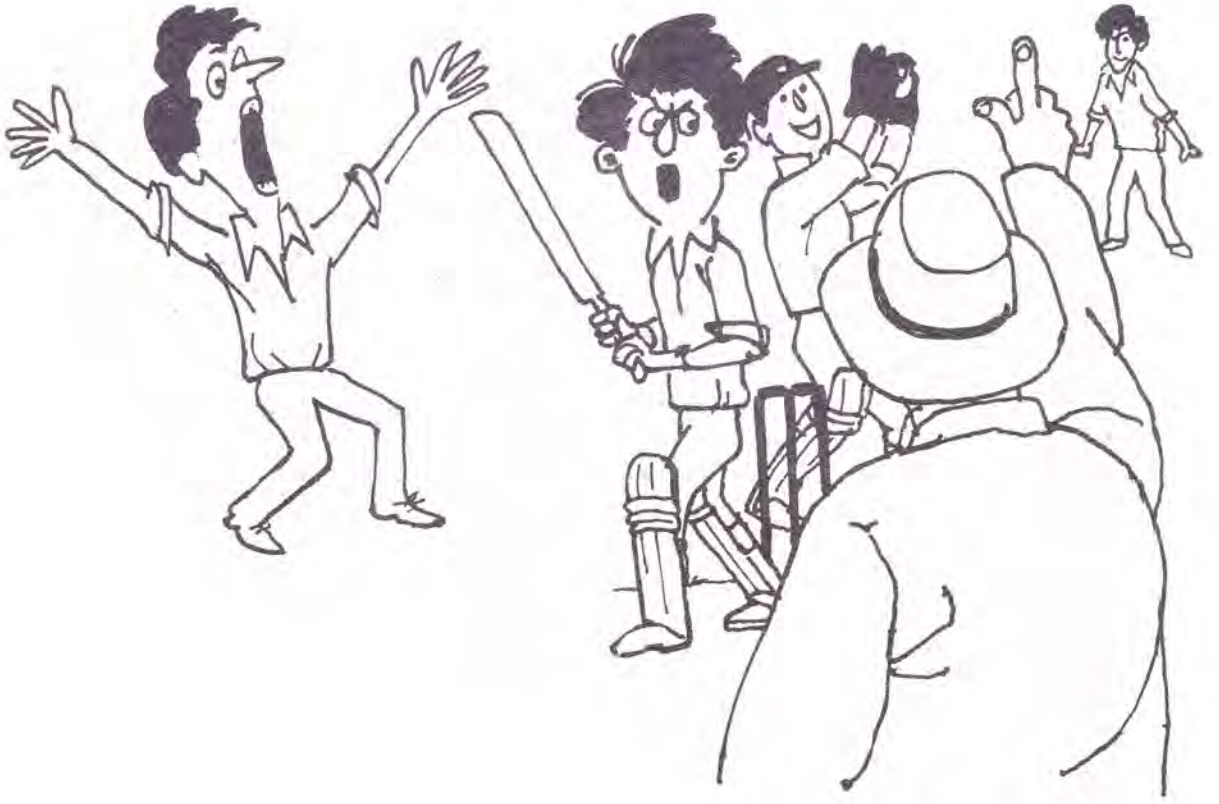
পাচ্ছেন না? একে থামাচ্ছেন না কেন?"

আম্পায়ার মাথা নেড়ে বললেন, "বোলারের সঙ্গে হাঁটতে পারবে না, এমন কথা আইনে নেই।"

"অ।" ফাস্ট বোলার তার আঠারো কদম দূরের বোলিং মার্কে ফিরে গেল, সঙ্গে ননীদাও। বোলার ছুটতে শুরু করল, তার পাশপাশি ননীদাও ছুটছেন। মাঝপথে বোলার থেমে গেল।

"আম্পায়ার! দেখতে পাচ্ছেন না লোকটা কী করছে?"

"দেখেছি।" আম্পায়ার নিরেট মুখ করে বলল, "সঙ্গে সঙ্গে ছুটছে। কী করব, আইনে বারণ করা নেই।"

ননীদা এরপর ছায়ার মত ফাস্ট বোলারটিকে অনুসরণ করতে শুরু করলেন। তাতে মাথা খারাপ হবার উপক্রম হল বোলারটির। পর পর এমন তিনটি বল করল যাতে থার্ড স্লিপের পরলোকগমন সম্ভাবনা ছিল। তৃতীয় বলটি করেই সে ঘুরে দাঁড়িয়ে ননীদাকে এমন ভাষায় কয়েকটি কথা বলল, যেগুলো ছাপা যায় না। ননীদা চুপ করে রইলেন, তারপর আম্পায়ারকে বললেন,

"শুনলেন, কী বলল?"

"শুনেছি!" আম্পায়ার বলল।

"আপনি কি মনে করেন ক্রিকেট খেলার মধ্যে এরকম ভাষা ব্যবহার করা উচিত?"

"না।" আম্পায়ার বলল।

তাহলে আমি এর প্রতিবাদে টিম নিয়ে চলে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয় স্বকর্ণে যা শুনেছেন রিপোর্টে লিখবেন?"

"নিশ্চয় লিখব।"

ননীদা ড্রেসিংরুমে ফিরে শুধু বললেন, "ট্যাক্-টিক্স।" লীগ সাব কমিটি আমাদের পুরো পয়েণ্টই দিয়েছিল।

আর একবার ইস্ট সুবার্বানের সঙ্গে খেলায় ননীদা টিম নিয়ে ফিল্ড করতে নেমেই আম্পায়ার দুজনের মধ্যে যে বয়স্ক তার সঙ্গে আলাপ শুরু করে দিলেন।

"অনেকদিন পর দেখা, আছেন কেমন?"

"আর থাকা! চলে যাচ্ছে একরকম করে! আম্পায়ার একটু খুশী হয়েই বলল।

"বাতের ব্যথাটা কেমন?"

"কদিন বড্ড বেড়েছে!" আম্পায়ার বেশ বিস্মিত হয়েই বলল। বিস্ময়ের কারণ, লোকটা জানল কী করে?

"আমাদের পাড়ায় এক কোবরেজের অদ্ভুত একটা তেল আছে। আমার কাকার পনেরো বছরের বাত মাত্র সাত দিন ব্যবহার করেই সেরে গেছে।"

"সত্যি!" আম্পায়ার গদগদ হয়ে পড়ল, "ঠিকানাটা দেবেন?"

"নিশ্চয়। বরং আমিই দিয়ে আসব আপনার কাছে। আপনার ঠিকানাটা খেলার পর দেবেন।"

এইখান থেকেই ইস্ট স্বার্বানের ভাগ্য নির্ধারিত হয়ে গেল। ননীদা যখন বল করতে এলেন, তখন ৪০ রান, একটিও উইকেট পড়েনি। ওর প্রথম বলটা অনেকখানি ব্রেক করল, অফ স্টাম্প থেকে প্রায় স্কোয়্যার লেগে। খেলতে গিয়ে ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগল। ননীদা আম্পায়ারের দিকে ঘুরে হাত তুলেই মৃদু হাসলেন "হয়নি, হয়নি। অ্যাপীল করার মত হয়নি।"

দুটি বল পরে আবার ব্যাটসম্যানের প্যাডে লাগল। ননীদা "হা-আ-আ" বলেই অ্যাপীলটা আর সমাপ্ত করলেন না। স্বরটাকে মৃদু করে বললেন, "সরি, আম্পায়ার! অ্যাপীল করার মত হয়নি। ইগনোর করে ঠিকই করেছেন।"

আম্পায়ার তখনো বাত থেকে মুক্তির সম্ভাবনায় ও আপন বিচারদক্ষতা প্রমাণের সাফল্যের আনন্দ কাটিয়ে ওঠেনি, ননীদা ফার্স্ট শ্লিপ থেকে অ্যাপীল করলেন কট বিহাইণ্ডের। সে চীৎকারে চৌরঙ্গীর পথচারীরাও চমকে উঠতে পারে। আম্পায়ার কোন দ্বিধা না করেই হাত তুলল। বিস্মিত ব্যাটসম্যান আম্পায়ারের দিকে কিছুক্ষণ তাকিয়ে বিড়বিড় করতে করতে রওনা হল। আমি সেকেণ্ড শ্লিপে। পরিষ্কার দেখেছি বল ব্যাটে লাগেনি। চাপা গলায় বললাম, "ননীদা, ব্যাপার কী?"

"সাইকোলজি!" ননীদা জবাব দিলেন।

"বাত আছে জানলেন কী করে?"

"পঞ্চাশ বয়সের ওপর শতকরা ষাটটা বাঙালীরই অম্বল নয়তো বাত আছে। তেল নয়তো বড়ি, দুটোর একটা লেগে যাবেই।"

ননীদার অ্যাপীলে সেদিন চারটে এল-বি-ডবল্যু আর তিনটে রান আউট পেয়ে আমরা ৬২ রানে ইস্ট স্বার্বানকে খতম করে দিয়েছিলাম। কয়েকদিন পর ননীদাকে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, তিসির তেলে রসুন, কাঁচালঙ্কা, গন্ধক মিশিয়ে এক শিশি পাঠিয়ে দিয়েছেন।

ননীদার ট্যাকটিকসের আর একটি অস্ত্র ব্যাটসম্যান যখন বল খেলার জন্য তৈরী হচ্ছে এবং বোলার বল দিতে ছুটতে শুরু করেছে তখন ফার্স্ট শ্লিপ থেকে উইকেট কীপারের সঙ্গে কথা বলে যাওয়া। ব্যাটসম্যান বল খেলুক বা ছেড়ে দিক বা ফস্কাক অমনি ননীদা 'উহ্‌হুহু', 'আহ্‌হুহু', 'ইস্‌স্‌স্', 'আর একটু যদি ঘুরতো বলটা! 'এবার নির্ঘাৎ!' ইত্যাদি বলে যাবেনই। অফ স্টাম্পের এক গজ বাইরে দিয়ে গেলেও এমন করবেন যেন উইকেট ভেদ করে বল গেল। নতুন ব্যাটসম্যান উইকেটে এসেই দেখত ননীদা খুব চিন্তিতভাবে গুডলেংথের কাছাকাছি একটা জায়গার দিকে তাকিয়ে। তারপর ব্যাটসম্যানকে শুনিয়ে আমাকেই বলতেন, "একই রকম আছে হে, মতি। দুর্যোধনকে কাল পই পই বললুম ভালো করে রোলার টানবি নয়তো কোনদিন যে মানুষ খুন হবে কে জানে! আগের ম্যাচে তপনবাবুর যা অবস্থা হয়েছে...ভালো কথা কাল হাসপাতালে গেছলে?"

"চোয়ালটা ঠিকমত সেট হয়নি, মুখটা বোধ হয় একটু বেঁকেই থাকবে আর সামনের দাঁত দুটোর তো কিছুই করার নেই!" বলতে বলতে লক্ষ করলাম ব্যাটসম্যান উৎকর্ণ হয়ে শুনছে।

"তাহলে গোবিন্দকে বলি বরং একটু আস্তে বল করুক!" ননীদা রীতিমত উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন।

"আগে দেখুন না বল লাফায় কিনা!"

এরপর ব্যাটসম্যানের টিকে থাকা—না থাকা নির্ভর করে ফার্স্ট শ্লিপ থেকে ননীদার অবিরত রানিং কমেণ্টারি উপেক্ষার ও মনঃসংযোগ ক্ষমতার উপর। ননীদা তার এই ট্যাকটিকসকে বলেন—প্রোপাগান্ডা! এতে একবারই ওকে ব্যর্থ হতে দেখেছিলাম। একটি ম্যাচে আমি আর ননীদা যথারীতি প্রোপাগান্ডা চালিয়ে যাচ্ছি, আর ব্যাটসম্যান মাঝে মাঝে আমাদের দিকে তাকিয়ে লাজুক ভাবে হাসছে। তাতে আমরা খানিকটা ঘাবড়ে যাই। ননীদা অবশেষে আর থাকতে না পেরে ওভার শেষে ব্যাটসম্যানটিকে বললেন, "পীচটা খুবই খারাপ, তাই না?"

ব্যাটসম্যান হাসল।

"আগের ম্যাচে আমাদের বেস্ট ডিফেন্সিভ ব্যাট তপনবাবুর চোয়াল আর দাঁত ভেঙেছে। মালীটাকে এবার তাড়াতেই হবে। কিসসু কাজ করে না।"

ব্যাটসম্যান আবার হাসল।

"গোবিন্দকে অবশ্য বলে দিয়েছি ওভার পীচ হয় হোক, তবু ওই স্পটে যেন বল না ফেলে। ম্যাচ জেতার জন্য তো আর মানুষ খুন করতে পারব না।"

ব্যাটসম্যান এবারও হাসল। ননীদা চুপ করে গেলেন। পরের ওভার শেষ হতেই অপর ব্যাটসম্যানকে তিনি বললেন, "আপনার পার্টনারটি কেমন লোক মশাই, একটা কথারও জবাব দেয় না?" সখেদ উত্তর পেলাম "আমাদেরও এই একই মুস্কিল হয়। হাবু শুনতেও পায় না, কথাও বলতে পারে না।"

রূপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে সি সি এইচের হাড্ডাহাড্ডির শুরু পঁচিশ বছর আগে শনিবারের একটা ফ্রেন্ডলি হাফ-ডে খেলা থেকে। ননীদা এমন এক স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করে ম্যাচটিকে ড্র করান যার ফলে এগারো বছর রূপোলি সঙ্ঘ আমাদের সঙ্গে আর খেলেনি। গল্পটা শুনেছি মোনা চৌধুরীর (অধুনা মৃত) কাছে। মোনাদা এ খেলায় ক্যাপ্টেন ছিলেন। উনি না বললে, এটাকে শিব্রাম চকরবরতির লেখা গল্প বলেই ধরে নিতাম।

সি সি এইচ প্রথম ব্যাট করে ১৪ রানে সবাই আউট হয়ে যায়। মোনাদা মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লেন ড্রেসিং-রুমে। সবারই মুখ থমথমে। এক ওভার কি দু

ওভারেই রূপোলি সঙ্ঘ রানটা তুলে নেবে। ওদের ড্রেসিং-রুম থেকে নানান ঠাট্টা এদিকে পাঠান হচ্ছে। কটা বলের মধ্যে খেলা শেষ হবে তাই নিয়ে বাজি ধরছে। রূপোলির ক্যাপ্টেন এসে বলল, "মোনা, আমরা সেকেন্ড ইনিংস খেলে জিততে চাই, রাজী?" মোনাদা জবাব দেবার আগেই ননীদা বলে উঠলেন, "নিশ্চয় আমরা খেলব। তবে ফার্স্ট ইনিংসটা আগে শেষ হোক তো!"

সবাই অবাক হয়ে তাকাল ননীদার দিকে। রূপোলির ক্যাপ্টেন মুচকি হেসে, "তাই নাকি?" বলে চলে গেল। ননীদা বললেন, "এ ম্যাচ রূপোলি জিততে পারবে না। তবে আমি যা বলব তাই করতে হবে।"

মোনাদা খুবই অপমানিত বোধ করছিলেন রূপোলির ক্যাপ্টেনের কথায়, তাই রাজী হয়ে গেলেন। তখন বিল্টুকে একধারে ডেকে নিয়ে ননীদা তাকে কী সব বোঝাতে শুরু করলেন আর বিল্টু শুধু ঘাড় নেড়ে যেতে থাকল। তিরিশ মাইল রোড রেসে বিল্টু পরপর তিন বছর চ্যামপিয়ন। শুধু ফিল্ডিংয়ের জন্যই ওকে মাঝে মাঝে দলে নেওয়া হয়। ব্যাট চালায় গাঁইতির মত, তাতে অনেক সময় একটা-দুটো ছক্কা উঠে আসে।

রূপোলি ব্যাট করতে নামল। ননীদা প্রথম ওভার নিজে বল করতে এলেন। প্রথম বলটা লেগস্টাম্পের এত বাইরে যে ওয়াইড সঙ্কেত দেখাল আম্পায়ার। দ্বিতীয় বলে ননীদার মাথার দশ হাত উপর দিয়ে ছয়। তৃতীয় বলে পয়েণ্ট দিয়ে চার। পরের দুটি বলে, আশ্চর্য রকমের ফিল্ডিংয়ে কোন রান হল না। শেষ বলে লেগবাই। বিল্টু লং অন থেকে ডীপ ফাইন লেগে যেভাবে দৌড়ে এসে বল ধরে, তাতে নাকি রোম ওলিম্পিকের ১০০ মিটারে সোনার মেডেল পাওয়া যেত। তা না পেলেও বিল্টু নির্ঘাৎ পরাজয় অর্থাৎ বাউন্ডারি বাঁচিয়ে যখন উইকেটকীপারকে বল ছুঁড়ে দিল, রূপোলির দুই ব্যাটসম্যান তখন তিনটি রান শেষ করে হাফাচ্ছে।

ওভার শেষ। স্কোর এখন সমান-সমান। দু দলেরই ১৪। বিষণ্নতায় সি সি এইচ-এর সকলের মুখ ম্লান। শুধু ননীদার মুখে কোন বিকার নেই। সাধারণত অতুল মুখুজ্জেই এরপর বল করে। সে এগিয়ে আসছে কিন্তু তাকে হাত তুলে নিষেধ করে ননীদা বলটা দিলেন বিল্টুর হাতে। সবাই অবাক। বিল্টুতো জীবনে বল করেনি! কিন্তু কথা দেওয়া হয়েছে, ননীদা যা বলবেন তাই করতে দিতে হবে। বিল্টু গুনে গুনে ছাব্বিশ কদম গিয়ে মাটিতে বুটের ডগা দিয়ে বোলিং মার্ক কাটল। ব্যাটস-ম্যান খেলার জন্য তৈরী। বিল্টু তারপর উইকেটের দিকে ছুটতে শুরু করল।

বোলিং ক্রীজে পেঁছবার আগে অদ্ভুত এক কাণ্ড ঘটল। বিল্টু আবার পিছু হটতে শুরু করেছে। তারপর গোল হয়ে ঘুরতে শুরু করল। সারা মাঠ অবাক শুধু ননীদা ছাড়া।

বিল্টু কি পাগল হয়ে গেল? ঘুরছে, পাক খাচ্ছে, ঘুরছে আবার পাক খাচ্ছে, লাফাচ্ছে, বোলিং মার্কে ফিরে যাচ্ছে, ডাইনে যাচ্ছে, বাঁয়ে যাচ্ছে কিন্তু বল হাতেই রয়েছে।

"এ কী ব্যাপার!" রূপোলির ব্যাটসম্যান কোমরে হাত দিয়ে দাঁড়াল, "বোলার এভাবে ছুটোছুটি করছে কেন?"

ননীদা গম্ভীর হয়ে বললেন, "বল করতে আসছে।"

"এসে পেঁছবে কখন?"

"পাঁচটার পর। যখন খেলা শেষ হয়ে যাবে।"

এরপরই আম্পায়ারকে ঘিরে তর্কাতর্কি শুরু হল।

ননীদা যেন তৈরীই ছিলেন, ফস করে পকেট থেকে ক্রিকেট আইনের বই বার করে দেখিয়ে দিলেন, বোলার কতখানি দূরত্ব ছুটে এসে বল করবে, সে সম্পর্কে কিছু লেখা নেই। সারাদিন সে ছুটতে পারে বল ডেলিভারির আগে পর্যন্ত।

বিল্টু যা করে যাচ্ছিল তাই করে যেতে লাগল। ব্যাটসম্যান ক্রীজ ছাড়তে ভরসা পাচ্ছে না, যদি তখন বোল্ড করে দেয়। ফিল্ডাররা কেউ শুয়ে, কেউ বসে। ননীদা মাঝে মাঝে ঘড়ি দেখছেন আর হিসেব করে বিল্টুকে চেঁচিয়ে বলছেন, "আর দেড় ঘণ্টা!" "আরো এক ঘণ্টা!" "মাত্র পঁয়তাল্লিশ মিনিট!"

কথা আছে পাঁচটায় খেলা শেষ হবে। পাঁচটা বাজতে পাঁচে নতুন এক সমস্যার উদ্ভব হল। বল ডেলিভারি

দিতে বোলার ছুটছে তার মাঝেই খেলা শেষ করা যায় কিনা? দুই আম্পায়ার কিছুক্ষণ আলোচনা করে ঠিক করলেন, তাহলে সেটা বে-আইনী হবে।

সুতরাং বিষ্টুর পাক দিয়ে দিয়ে দৌড়নো বন্ধ হল না। মাঠের ধারে লোক জমেছে। তাদের অনেকে বাড়ি চলে গেল। অনেক লোক খবর পেয়ে দেখতে এল। ব্যাটসম্যান সান্ত্রীর মত উইকেট পাহারা দিয়ে দাঁড়িয়ে। সন্ধ্যা নামল। বিষ্টু ছুটেই চলেছে। চাঁদ উঠল আকাশে। ফিল্ডাররা শুয়েছিল মাটিতে। ননীদা তাদের তুলে ছজনকে উইকেটকীপারের পিছনে দাঁড় করালেন, বাই রান বাঁচাবার জন্য। এরপর বিষ্টু বল ডেলিভারি দিল।

রুপোলির ব্যাটসম্যান অন্ধকারে ব্যাট চালালো এবং ফসকালো। সেকেন্ড স্লিপের পেটে লেগে বলটা জমে গেল। ননীদা চেঁচিয়ে উঠলেন, "ম্যাচ ড্র।"

রুপোলির ব্যাটসম্যান প্রতিবাদ জানিয়ে বলল, বল ডেলিভারির মাঝে যদি খেলা শেষ করা না যায়, তাহলে ওভারের মাঝেও খেলা শেষ করা যাবে না। শুরু হল তর্কাতর্কি। বিষ্টুকে আরো পাঁচটা বল করে ওভার শেষ করতে হলে, জেতার জন্য রুপোলি একটা রান করে ফেলবেই—বাই, লেগবাই, ওয়াইড যেভাবেই হোক। কিন্তু ননীদাকে দমানো সহজ কথা নয়। ফস্ করে তিনি আলোর অভাবের অ্যাপীল করে বসলেন। চটপট মঞ্জুর হয়ে গেল।

আমার ধারণা মোনাদা কিছুটা রঙ্ ফলিয়ে আমাকে গল্পটা বলেছেন। আম্পায়ারদের সিদ্ধান্তগুলো, ফ্রেন্ডলি ম্যাচে হলেও, সঠিক হয়েছে কিনা তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু ননীদাকে যারা ঘনিষ্ঠভাবে জানে, তারা কেউ এই ঘটনার সত্যতা নিয়ে খুব বেশী প্রশ্ন তুলবে না।

।। পাঁচ ।।

ননীদাকে ভালো করে জানি বলেই অবাক হচ্ছিলাম তন্ময়কে উনি এখনো ক্লাবে ঢুকতে দিচ্ছেন কোন কারণে? চাঁদমোহন শ্রীমানী জানিয়েছেন, ব্যবসা খুব মন্দা যাচ্ছে। হাজার টাকার বেশী দিতে পারবেন না। আমরা বুঝলাম তন্ময়ের জন্যই পাঁচশো টাকা ক্লাবের জরিমানা হল। এতবড় ধাক্কা সামলানো খুবই শক্ত, বিশেষত ননীদার পক্ষে।

প্রথম লীগম্যাচে তন্ময় ১০৮ নট আউট রইল। এগারো বছর পর এই প্রথম ক্লাবের কেউ সেনচুরি করল। প্রতি বছরই লীগ শুরুর আগে ননীদা সবাইকে জানিয়ে দেন, সেনচুরি করলেই একটা নতুন ব্যাট পাবে। তন্ময় খেলা শেষেই তার দাবি জানাল। ননীদা খুব খুশিতে ছিলেন। "নিশ্চয় পাবে। কথার খেলাপ আমার হয় না!" এই বলে ননীদা ওর পিঠ চাপড়ালেন।

"দেখবেন, কাঁটাল কাঠের ব্যাট গছাবেন না।" তন্ময় বলল।

"আরে, না না। ভালো ব্যাটই দোব।"

"কবে দেবেন, কালকেই?"

"কাল কি আর সম্ভব? কটা দিন সময় দাও, ঠিক পেয়ে যাবে।"

ননীদাকে একসময় বললাম, "শ খানেক টাকার কমে তো ব্যাট হবে না। পাবেন কোত্থেকে? ক্লাবের যা অবস্থা!"

"আরে, টাকা ঠিক জোগাড় হয়ে যাবে। দেখলে, ফাস্ট বোলারটাকে যে ছয়টা মারল সেকেন্ড ওভারে! এগিয়ে যেই দেখল পাবে না, সঙ্গে সঙ্গে পিছিয়ে ব্যাক-ফুটে স্ট্রেট বোলারের ওপর দিয়ে। ছেলেটার হবে, বুঝলে মতি! এত বছর গড়ের মাঠের ঘাসে চরছি, বুঝতে ঠিকই পারি। তবে বড্ড ডেয়ারিং, অধৈর্য, রিস্কি শট নেয়। ওকে তুমি একটু কনট্রোল করো। আমার কথা তো শুনবে না।"

বললাম, "আমার কথাও শুনবে না। আজকাল ছেলেরা একটু অন্য রকম, বোঝেনই তো।"

পরের ম্যাচ খেলতে নামার আগে তন্ময় তাঁবুর মধ্যে চিৎকার করে সবাইকে শুনিয়েই বলল, "ব্যাটটা যে এখনো পেলুম না। দেবেন তো, নাকি ক্যালকাটা করপোরেশন হয়ে থাকবেন?"

"না, না অবশ্যই দোব।" ননীদা খানিকটা কাঁচুমাচু হয়ে বললেন।

এ খেলায় তন্ময় ১০১ করল। ননীদা আহ্লাদে যে কী করবেন, ভেবে পেলেন না। আমি শুধু বললাম, "আর একখানা ব্যাট দিতে হবে, মনে থাকে যেন!"

"রেখে দাও তোমার ব্যাট!" ননীদা ধমকে উঠলেন। "কলকাতার কটা ব্যাটসম্যান পারে লেগ স্টাম্পের বাইরে সরে এসে লেগের বল অমন করে স্কয়্যার কাট্ করতে? মতি তুমি ব্যাটের কথাই শুধু ভাবছ, ছেলেটা যে আর্টিস্ট সেটা বলছ না!"

চুপ করে রইলাম। লাঞ্চের সময়ই, যা আন্দাজ করে-ছিলাম তাই ঘটল। তন্ময় টেবিলে বসেই হেঁকে বলল, "আগের ব্যাটটা তো এখনো পেলুম না। আর কতদিন সময় দিতে হবে, ননীদা?"

"পাবে, পাবে! এক সঙ্গেই দুটো পাবে!"

"ঠিক আছে। তবে সামনের ম্যাচের আগে না পেলে আমি আর আসছি না।"

কথামতই তন্ময় এল না পরের ম্যাচে। দুটো কেন, একটা ব্যাট দেওয়ার সামর্থ্যও সি সি এইচের নেই। তন্ময় ব্যাট না পাওয়ায় অন্য প্লেয়াররাও গুঞ্জন তুলল। আমরা চার উইকেটে ত্রিবেণী ইউনাইটেডের কাছে হারলাম। পরের খেলা রুপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে। এখন রুপোলির ক্যাপ্টেন চিতু। দুটো ম্যাচে খেলে, তন্ময় একাই ম্যাচ দুটো জিতে দিয়েছে। মনের মধ্যে একটা ক্ষীণ আশা জেগেছে, সি সি এইচ চ্যামপিয়ন হবার চেষ্টা করলে এবার বোধ হয় হতে পারবে। তন্ময়ের অনুপস্থিতি আমাকে ব্যস্ত করে তুলল।

ঠিকানা জোগাড় করে তন্ময়ের বাড়ি হাজির হলাম। সরু গলি। আধা-বস্তি অঞ্চল। নম্বর অনুযায়ী কড়া নাড়তে এক প্রৌঢ়া দরজা খুললেন। তাঁর চেহারা ও বেশে দারিদ্র্যের তকমা আঁটা কিন্তু কথায় ও আচরণে প্রাক্তন আভিজাত্যের ছাপ। উনি তন্ময়ের মা।

"তমু তো দু দিন হল বাড়ি নেই। বর্ধমানের কোথায় যেন ফুটবল খেলতে গেছে।"

গ্রামাঞ্চলে শীতকালেই ফুটবল টুর্নামেন্টগুলো হয়। কলকাতার ফার্স্ট ডিভিশান ফুটবলারদের তখন ভাড়া পাওয়া যায়। তাছাড়া, ধান ওঠার পর অবসর ও অর্থ দুইই তখন হাতে আসে। এক একটা গ্রামের ফুটবল টিমে কলকাতারই এগারোজনকে দেখা যায়। এই রকমই কোন টিমের হয়ে তন্ময় ভাড়া খেলতে গেছে। আমার ঠিকানা দিয়ে বললাম, তন্ময় ফিরলেই যেন আমার সঙ্গে দেখা করে।"

দুদিন পরই তন্ময় আমার বাড়িতে এল।

"হল না, মতিদা! পর পর দুটো জায়গায় সেমি-ফাইনাল আর ফাইনাল খেললুম। দুটোতেই ডিফিট। মোট একশো কুড়ি টাকা পাওয়ার কথা—পেলুম পঞ্চান্ন।"

"ফুটবল খেললে ক্রিকেটের বারোটা বাজবে!" ক্ষুব্ধ-স্বরে বললাম, "কখন চোট লাগবে কে বলতে পারে!"

তন্ময় হাসল। বলল "বাঁ-কাঁধটা নাড়তে কষ্ট হচ্ছে, ব্যাকটা এমন ঝাঁপিয়ে পড়ল।" তারপরই হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলল, "আমি জানি কেন দেখা করতে বলেছেন। দুটো সেনচুরির জন্য দুটো ব্যাট আমার পাওনা হয়েছে। না পেলে আমি যাব না আর।"

"কিন্তু আমাদের ক্লাব গরীব, কুড়িয়ে বাড়িয়ে কোনক্রমে টিকে আছে। তুমি এই দিকটা নিশ্চয় বিবেচনা করবে।"

"আমিও গরীব। কুড়িয়ে বাড়িয়েই চলে আমাদের সাতজনের সংসার। বাবার যা রোজগার তাতে টেনেটুনে পনেরো দিনের বেশী চলে না। আমি বড় ছেলে, প্রি-ইউ পাশ, মাঝে মাঝে ফুটবল খেলার কয়েকটা টাকা বাড়িতে দেওয়া ছাড়া আর কিছুই সাহায্য করতে পারি না। ব্যাট দুটো পেলে বিক্রি করে কিছু টাকা মাকে দিতে পারব। ক্লাব যদি ব্যাটের বদলে তার দামটা দেয় তাহলে আমি যাব। আমার এখন একটা চাকরি দরকার।"

"চাকরি বা টাকা, কোনটা দেওয়াই আমাদের পক্ষে সম্ভব নয়।"

"তাহলে আমার পক্ষেও খেলা সম্ভব নয়।"

কথাটা ননীদাকে জানালাম। শুনে মুখখানা কেমন যেন হয়ে গেল। বিমর্ষকণ্ঠে বললেন, "দেখি, টাকাটা জোগাড় করতে পারি কিনা। ও থাকলে এবার আমরা ঠিকই চ্যামপিয়ান হব।"

রূপোলি সঙ্ঘের সঙ্গে খেলার দিন তন্ময়কে কিট-ব্যাগ হাতে হাজির হতে দেখে অবাক হলাম। ননীদা কোন স্ট্র্যাটেজি প্রয়োগ করে ওকে হাজির করালেন, সেটা জানার জন্য ননীদাকে জিজ্ঞাসা করলাম, "টাকা পেলেন কোথায়?"

"কীসের টাকা?"

"ব্যাটের দাম না পেয়েই তন্ময়ই এল?"

"ওহ্!" ননীদা হঠাৎ ভ্রূ কুঁচকে কী যেন মনে করতে চেষ্টা করলেন, তারপরই যেন মনে পড়ল।

"পীচটা দেখেছ কি? দুর্যোধনকে বলেছিলুম আজ যেন একদম জল না দেয়। ওদের একটা ভাল স্পিনার আছে..." বলতে বলতে ননীদা মাঠের দিকে প্রায় দৌড়লেন।

তন্ময়কে জিজ্ঞাসা করে জানলাম, আজ সকালে ননীদা একশো টাকা ওকে দিয়ে এসেছেন। আরো তিরিশ টাকা দেবেন ওমাসে। ননীদা এবং ক্লাব দুয়েরই অবস্থা জানি, তাই বিস্মিত হয়ে যখন ভাবছি টাকাটা এল কোত্থেকে তখন একগাল হেসে চিতু প্যাভেলিয়ানে ঢুকল। দু-চারটে কথা হবার পরই চিতু বলল, "হ্যাঁরে, তোদের ক্লাবে একটা ছেলে নাকি দারুণ ব্যাট করছে? আজ খেলবে নাকি?"

আমি ঘাড় নাড়লাম। ও বলল, "দেখতে হবে তো কেমন খেলে!"

তন্ময় ৭৫ করে রান আউট হল। আমিই ছিলাম নন-স্ট্রাইকার এবং কাজটা ইচ্ছে করেই করলাম। যেভাবে ও খেলছিল তাতে আর একখানা ব্যাট বা তার দাম ওকে দিতেই হোত। সুতরাং ননীদা এবং ক্লাবকে বিপদ থেকে বাঁচাবার জন্যই কাজটা করলাম। বলাবাহুল্য খেলাটি ড্র হচ্ছে বুঝেই এ কাজ করেছি। ননীদা কিন্তু ভীষণ ক্ষেপে গেলেন। অবশ্য আমার উদ্দেশ্যটা বুঝিয়ে বলতেই ঠাণ্ডা হলেন। চাপা স্বরে বললেন, "গুড স্ট্র্যাটেজি!"

কিন্তু তন্ময়কে কে যেন ফাঁস করে দিল ব্যাপারটা। প্রথমে আমাকে তারপর ননীদাকে অকথ্য ভাষায় চিৎকার করে তন্ময় কয়েকটা কথা বলল, রূপোলির খেলোয়াড়রা তখন চা খাচ্ছে। আমরা অপমানে মুখ কালো করে বসে রইলাম। চিতু আমাকে বলল, "কীরে, তোদের ননীদাকে যে ঘোল করে ছেড়ে দিল। ছেলেটাকে তাহলে, সামনের বছর আমাদের ক্লাবে নিয়ে নোব।"

আমি তখন অপমানে জ্বলছি। কোন জবাব দিলাম না।

।। ছয় ।।

পর পর কয়েকটা ম্যাচ ড্র করে আমরা হঠাৎ লীগ-টেবলের মাঝামাঝি কয়েকটা ক্লাবের সঙ্গে সমান হয়ে গেলাম। উপরের তিনটি ক্লাবও সমান পয়েন্ট করে এক সঙ্গে প্রথম স্থানে রয়েছে। তার মধ্যে রূপোলি সঙ্ঘও আছে। তাদের সঙ্গে আমাদের মাত্র দুটি পয়েন্টের তফাৎ।

ননীদার ইচ্ছা নয় চ্যাম্পিয়ানশিপ লড়াইয়ে। ফার্স্ট ডিভিশনে উঠলে তো ক্লাবের খরচ বেড়ে যাবে। এখনই আমরা পাঁউরুটি আর আলুর দম দিয়ে লাঞ্চ শুরু করেছি। প্লেয়াররা রীতিমত অসন্তুষ্ট। আমি কিন্তু চ্যাম্পিয়ানশিপ ফাইট করারই পক্ষে। ফার্স্ট ডিভিশনে যে করেই হোক একবার উঠতেই হবে। পরের বছরই নয় নেমে যাব, তবুতো বলতে পারব আমার অধিনায়কত্বে সি সি এইচ একবার ফার্স্ট ডিভিশনে উঠেছিল। প্লেয়ারদের কদিন ধরেই তাতাচ্ছি ফার্স্ট ডিভিশনে খেলার ইজ্জতের লোভ দেখিয়ে।

কদিন ধরে ননীদা মাঠে আসছেন না। একটা ম্যাচ খেলা হয়ে গেল ননীদার উপস্থিতি ছাড়াই। আমরা জিতলাম শুধু ফিল্ডিংএর জোরে। বেলেঘাটা স্পোর্টিংএর কাছে আচমকা রূপোলি সঙ্ঘ এক উইকেটে হেরে আমাদের সমান হয়ে গেল। হঠাৎ আমার তন্ময়কে মনে পড়ল। এই সময় ও যদি থাকত, তাহলে বাকী ম্যাচ কটা বোধহয় জিততে পারব, এই রকম একটা ধারণা আমার মনে উঁকি দিতে লাগল। ভাবলাম ননীদাকে বলি, যদি দরকার হয় হাতে-পায়ে ধরেও তন্ময়কে বাকী কটা ম্যাচ খেলবার জন্য ডেকে আনি।

বলামাত্র ননীদা তেলে বেগুন হয়ে উঠলেন।

"তোমার লজ্জা করে না, মতি? যেভাবে, যে ভাষায় বাইরের টিমের সামনে আমাদের অপমান করেছে, তারপরও তুমি ওকে আনতে চাও? কী আছে ওর খেলায়, য়্যাঁ? কী আছে? নেমেই দুমদাম ব্যাট চালায়, বরাতজোরে ব্যাটে-বলে হয়ে গেছে তাই রান পেয়েছে। একটু বুদ্ধিমান বোলারের পাল্লায় পড়লে তিন বলে ওকে তুলে নিয়ে যাবে। ক্রিকেট অত সোজা ব্যাপার নয়, এটা ফুটবল নয় যে গোল খেলেও গোল শোধ দেওয়ার সুযোগ পাবে। প্রত্যেকটা বলের ওপর ব্যাটসম্যানের বাঁচামরা নির্ভর করে, একটা ভুল করেছ কি তোমার মৃত্যু ঘটে যাবে। কী ভীষণ ডিসিপ্লিনড হতে হয়, কী দারুণ কনসেনট্রেশন দরকার হয় বড় ব্যাটসম্যান হতে

গেলে। তোমার ওই তন্ময়ের মধ্যে তা কী আছে?"

আমি চুপ করে ননীদার উত্তেজিত মুখের দিকে তাকিয়ে রইলাম। এই লোকটিই মাসখানেক আগে যার ব্যাটিং দেখে উচ্ছ্বসিত হতেন আর আজ তাকে ব্যাটসম্যান বলতে রাজী নন! ননীদা একদৃষ্টে মাটির দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তারপর বললেন, "তোমার বউদির একটা বালা বিক্রি করে টাকাটা দিয়েছিলাম। ওর তো মাথা খারাপ. বালা দিয়ে আর কী করবে? ভেবেছিলাম টাকা পেয়ে তন্ময় ক্লাবে থাকবে। খেলাটাই বড় কথা, টাকাটা সব কিছু নয়।"

বাড়িতে ফিরে দেখি তন্ময় আমার জন্য অপেক্ষা করছে। প্রথমেই বলল, "মতিদা, আমি খেলব।"

অবাক হয়ে গেলাম। বললাম, "হঠাৎ যে!"

ও ইতস্তত করল কিছু বলার জন্য। মাথা নামিয়ে রইল। আমি আবার বললাম, "খেলবে, সেতো ভালো কথা, কিন্তু আর আসবে না বলে আবার নিজে থেকেই এসে খেলতে চাইছ, ব্যাপার কী?"

তন্ময় বলল, "আমার একটা চাকরি পাবার সম্ভাবনা আছে ইনডিয়ান ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ব্যাঙ্কে। ওরা ক্রিকেট টিম করে লীগে সামনের বছর খেলবে। প্রায় তিনশো টাকা মাইনে। ক্রিকেট সেক্রেটারি আর ডেপুটি ম্যানেজার আমার খেলা দেখতে চায়।"

"তাহলে সামনের রোববার খেলো। একটা কুশিয়াল ম্যাচ রয়েছে কসবা ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে। যদি জিততে পারি তাহলে ফ্রেণ্ডস স্পোর্টিং আর আমরা সমান পয়েণ্ট হয়ে লীগ-টেবলের টপে চলে যাব। রূপোলি তাহলে দু পয়েণ্ট পিছিয়ে যাবে আমাদের থেকে।" বলতে বলতে আমার হাসি পেল। রূপোলি সঙ্ঘ আমাদের পিছনে থাকবে এটাই বড় কথা লীগ চ্যাম্পিয়ান হই বা না হই— এই মনোভাব দেখছি আমার মধ্যেও বদ্ধমূল হয়ে গেছে।

তন্ময় বলল, "ননীদা কোন আপত্তি করবেন না তো?

"করে যদি তো কী হবে?" আমি উত্তেজিত হয়ে উঠলাম, "আমি ক্যাপটেন. আমি যাকে খেলাব সেই খেলবে। কেউ আপত্তি করলেও শুনব না।"

ননীদা কিন্তু আপত্তি করলেন না তন্ময়কে দেখে। রবিবার আমাদের মাঠেই ভ্রাতৃসঙ্ঘের সঙ্গে খেলা। সাত-জন মাত্র আমাদের প্লেয়ার হাজির হয়েছে। শুকনো মুখে আমি আর ননীদা তাঁবুর বাইরে যাচ্ছি আর ফিরে আসছি। খেলার কুড়ি মিনিট মাত্র তখন বাকি। এমন সময় তন্ময় পৌঁছল। ননীদা কপাল এবং ভ্রূ কুঁচকে আমার দিকে তাকালেন।

বললাম, "তন্ময় আজ খেলবে।"

"আমি তো জানতাম না। টিমে তো ওর নাম দেখছি না।"

"আপনাকে বলতে ভুলে গেছি আজ তন্ময় খেলছে।

টিমের কাউকে বসিয়ে দিয়ে ওকে খেলালেই হবে।" আসলে আমি ইচ্ছে করেই আগে বলিনি। ননীদা যদি ব্যাগড়া দেন এই ভয়ে।

"টিমে যে আছে তাকে বিনাদোষে বসান উচিত নয়।" এই বলে ননীদা আবার তাঁবু থেকে বেরিয়ে গেলেন। কিন্তু তন্ময়কে না খেলিয়ে উপায় ছিল না। চারজন খেলোয়াড় আর এলোই না। লীগের শেষদিকে এই রকমই অবস্থা হয় আমাদের ক্লাবে।

তন্ময়কে নিয়ে আটজন। অবশেষে ননীদাকেও নামতে হল। একটা বাড়তি ট্রাউজার্স আমার ব্যাগে থাকেই। সেটা পরলেন। ঝুলে বড়, কোমরে ছোট, ঘের অর্ধেক। কেডস জোগাড় হল। শাদা পাঞ্জাবিটা ট্রাউজার্সে গুঁজে নিলেন। আমরা টসে জিতে নজনে ফিল্ড করতে নামলাম।

ননীদা স্লিপে প্রথম দু ওভারে তিনটি ক্যাচ ফেললেন। তা সত্ত্বেও ভ্রাতৃসংঘ সুবিধা করতে পারল না, আমাদের নতুন মিডিয়াম পেসার ছেলেটির বলে। তিন উইকেটে ৭৪ থেকে সবাই আউট হল ৯৬-এ।

ননীদা বললেন, "আমাকে উপরদিকে ব্যাট করতে পাঠিও না, মাঝামাঝি রেখো।"

তন্ময় একটি লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। সে আমার দিকে হাত তুলে ছুটে এল। "মতিদা, ওরা এসেছে।"

"তাহলে ওয়ান ডাউন যাও।"

"না না, আর একটু তলায় দিন।"

তন্ময়কে বেশ নার্ভাস দেখাচ্ছে। নিজের উপর যেন আস্থা রাখতে পারছে না। বললাম, "খেলা যদি দেখাতে চাও তাহলে তলারদিকে ব্যাট করে লাভ কী হবে। যদি সবাই আউট হয়ে যায়, তুমি শুধু নট আউটই থাকবে। কিন্তু ওরা এসেছে তোমার স্কোর দেখতে।"

আমাদের দুই উইকেটে ২২, তখন তন্ময় নামল। নেমেই প্রথম বলে একস্ট্রা কভারে চার। হাঁফ ছাড়লাম আমি অপর উইকেটে দাঁড়িয়ে। এরকম কতকগুলো মার মারতে পারলে কনফিডেন্স পাবে। ৩২ রানের মাথায় আমি স্টাম্পড হলাম ভ্রাতৃসংঘের অফস্পিনারের বল হাঁকড়াতে গিয়ে। এরপরই তন্ময়ের খেলা কেমন যেন গুটিয়ে গেল। ১১ রান করে ও আর ব্যাট তুলতেই চায় না। আধ ঘণ্টা কোন রান করল না।

ননীদা হঠাৎ আমায় বললেন, "ব্যাটিং অরডারটা একটু বদলাও, এরপর আমি ব্যাট করতে যাব।" শুনে ভাবলাম, ব্যাপার কী! তন্ময়কে আউট করিয়ে দেবার মতলব নেই তো! বললাম, "ননীদা আমাদের তো দুজন কম। আপনি যদি ফাইভ কি সিক্স ডাউন যান তাহলে ভাল হয়। শেষদিকে আটকাবার কেউ নেই।"

কী ভেবে ননীদা বললেন, "আচ্ছা।"

পরপর আমাদের দুটো উইকেট পড়ল ৪৬ ও ৪৯

বাংলা-দেশের রক্তাক্ত মুক্তিসংগ্রামের অমর চিত্ররূপ-
জয় বাংলা
ল্যাবরেটরী পরিবেশিত -
প্রযোজনা • ধীরেন দাশগুপ্ত
পরিচালনা • উমাপ্রসাদ মৈত্র
সুরকার • সুধীন দাশগুপ্ত
কাহিনী-চিত্রনাট্য • মিহির সেন
গীতিকার • এপার বাংলার কবি
সুভাষ মুখোপাধ্যায়
ওপার বাংলার কবি
সিকান্দার আবু জাফর
চরিত্র-চিত্রণে • এপার বাংলা ওপার বাংলার
শিল্পী ও হাজার মুক্তিযোদ্ধা এবং
ঐতিহাসিক ই, পি, আর লঞ্চ লায়লা

রানে। ননীদা খুব মন দিয়ে খেলা দেখছেন। একবার আমাকে বললেন, "অফ স্পিনারটা ভাল ফ্লাইট করাচ্ছে। তন্ময়টা বোকার মত খেলছে, এখুনি শর্ট লেগে ক্যাচ দেবে।"

হঠাৎ চিতুকে দেখি আমাদের স্কোরারের পিছনে দাঁড়িয়ে স্কোর বুকে উঁকি দিচ্ছে। আমাকে দেখে বলল, "পাঁচ উইকেটে উনপঞ্চাশ, পারবি না তোরা। হাতে আছে তিন উইকেট সাতচল্লিশ তুললে তবেই জিত। পারবি না, হেরে যাবি।" বলে চিতু হাসতে লাগল।

"তোর খেলা নেই আজ?"

"হচ্ছে, গ্রীয়ার মাঠে। আমরা ব্যাট করছি। আমি আউট। ভাবলাম, দেখে আসি এ মাঠে কী হচ্ছে! আমরা প্রায় জিতে গেছি। তোদের তো শোচনীয় ব্যাপার।"

মাঠে একটা হায় হায় শব্দ উঠল। তন্ময়ের সহজ ক্যাচ শর্ট লেগ ফেলে দিয়েছে। তন্ময়ের মুখ পাংশু। পঞ্চাশ মিনিট খেলে করেছে ১৮ রান, যা কখনো হয় না।

"ব্যাপার কী? তন্ময় যে আজ এমন করে খেলছে?" ননীদা প্যাড পরতে পরতে আমায় বললেন।

"একটা ব্যাঙ্কে চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা ওর আছে। ব্যাঙ্কের এক কর্তা ওর খেলা দেখতে এসেছে। তাই খুব নার্ভাস হয়ে পড়েছে মনে হচ্ছে।"

"সেলফিশ! নিজের জন্য খেলছে, টিমের জন্য খেলছে না!" গম্ভীর হয়ে ননীদা বললেন আর তখনি ৫৭ রানের মাথায় আউট হল ষষ্ঠ ব্যাটসম্যান। অফ-স্পিনারের পঞ্চম শিকার।

"তোদের হয়ে গেল!" চিতু চেঁচিয়ে বলল, ননীদা মাথা নিচু করে গ্লাভস পরছিলেন। একবার চিতুর দিকে তাকালেন।

উইকেটে পেঁছে তন্ময়কে ননীদা কী যেন বললেন। অফস্পিনারটি বল করছে। ননীদা প্রত্যেকটা বলে পা বাড়িয়ে ব্যাটটা শেষ মুহূর্তে তুলে নিয়ে প্যাডে লাগাতে লাগলেন। ওদিকে হঠাৎ তন্ময় পর পর দুটো স্ট্রেট ড্রাইভ থেকে আট রান নিল।

ননীদার দিকে রয়েছে অফস্পিনার বোলারটি। ওকে একটার পর একটা মেডেন দিয়ে যেতে লাগলেন ননীদা। কিন্তু তন্ময়কে এদিকের উইকেটে খেলতে দিচ্ছেন না। দু একবার রান নেবার জন্য তন্ময় ছুটে এসেছে, ননীদা চীৎকার করে বারণ করেছেন।

নিজের ৪৮ রানে পৌঁছে তন্ময় গ্লান্স করেই দৌড়ল দুটি রান নিয়ে হাফ-সেনচুরি পূর্ণ করবে বলে। দৌড়বার আগে লক্ষই করেনি শর্ট স্কোয়্যার লেগ বল থেকে কতটা দূরে। তন্ময় যখন পীচের মাঝামাঝি ননীদা ওকে ফেরৎ যাবার জন্য চীৎকার করছেন। তন্ময় ফিরে তাকিয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইল। আর কিছু করার নেই তার। স্কোয়্যার লেগের ছোড়া বল উইকেট-কীপার ধরছে। তন্ময় চোখ বন্ধ করে ফেলল।

"হাউজ্যাট?" চীৎকারে অন্য মাঠের লোকও ফিরে তাকাল। তন্ময় আস্তে আস্তে চোখ খুলে দেখল ননীদা হাসছেন। তারপর মাথাটা কাত করে রওনা হলেন। তন্ময় চোখ বুঁজিয়ে থাকায় দেখতে পায়নি, ননীদা কখন যেন ছুটে তাকে অতিক্রম করে নিজে রান আউট হলেন।

ননীদা প্যাড খুলছেন। বললাম, "কী ব্যাপার?"

বললেন, "ক্রিকেটে অসাবধান হলেই যেমন মৃত্যু আছে তেমনি আত্মহত্যাও আছে। সেনচুরি, ডাবল সেনচুরি করে এখন আর আমার হবেটা কী? তার থেকে যার ভবিষ্যৎ আছে, সে খেলুক।"

পরের ওভারে তন্ময় দুটি ওভার বাউন্ডারি মারল। আমরা জিতে গেলাম। ওকে কাঁধে তুলে আনার জন্য আমরা মাঠে ছুটে গেলাম।

বহুক্ষণ পর, তাঁবু তখন প্রায় ফাঁকা। দুর্যোধন এসে আমায় বলল, "বাবু দেখিবারে আসো।"

ওর সঙ্গে তাঁবুর পিছনে গিয়ে দেখি ফেন্সের ধারে তন্ময় ব্যাট নিয়ে একটা কাল্পনিক বলে ফরোয়ার্ড ডিফেন্সিভ খেলে স্ট্যাচুর মত হয়ে আছে। আর ননীদা পিছনে দাঁড়িয়ে।

"দ্যাখো, পা-টা কোথায়? বলের লাইনের কত বাইরে? কাল থেকে দুশোবার রোজ স্যাডো প্র্যাকটিস করবে। দুশোবার!"

ছবি এঁকেছেন সুধীর মৈত্র

মহামায়া প্রোডাকসন্সের
নিবেদন
*
বিভূতি ভূষণ মুখোপাধ্যায়ের
কাহিনী অবলম্বনে
*
ইন্দ্রি পরিবেশিত
*
রানুর
প্রথম
ভাগ
Vimal.
*
চিত্রনাট্য ও পরিচালনা
নব্যেন্দু চট্টোপাধ্যায়
সংগীত / নিখিল চট্টোপাধ্যায়

কালো বেরাল

পার্থ চট্টোপাধ্যায়

মধ্যপ্রদেশের ছতরপুরের কাছে কাতরা বলে একটি দেহাতী গ্রাম আছে। এই গ্রামে ঢুকতেই কাঁকর বিছানো ফাঁকা রুক্ষ মাঠে সারি সারি কতগুলো তাঁবু পড়েছে।

তাঁবুর সামনে একটা সাইন বোর্ড। তাতে ইংরাজি আর হিন্দিতে লেখাঃ জুওলজিক্যাল সারভে অব ইনডিয়া। ফিল্‌ড্‌ রিসার্চ স্টেশন। গ্রামের লোকেরা ইতিমধ্যে জেনে ফেলেছে ব্যাপারটা কী। এই কাতরা গ্রামে মাটির নিচে হীরের খনি আছে। সেই সব পরীক্ষা করতেই সাহেবরা এখানে এসেছে।

এই ফিলড রিসার্চ স্টেশনের ইনচার্জ জুওলজিস্ট সুরেন্দ্র দীক্ষিত। বাড়ি জম্মুতে। স্ত্রী ও একমাত্র ছেলে সেখানেই থাকে। ছেলে অজিতের বয়স বছর দশ, সে স্কুলে পড়ে। সুরেন্দ্রর বয়স বছর চল্লিশের ওপর। পড়াশোনা, প্রথমে বোম্বাইতে, পরে, কিছুদিন আমেরিকায়। ভারতবর্ষে ফিরে সে এই চাকরিতে যোগ দেয়।

সুরেন্দ্র দীক্ষিতের সহকারীদের একজন ডাক্তার। নাম ক্যাপটেন স্বামীনাথন। আর্মিতে ছিল। রিটায়ার করে কেন্দ্রীয় সরকারের স্বাস্থ্যবিভাগে যোগ দিয়েছে।

আর একজন তরুণ জুওলজিস্টের নাম জয়পাল। বয়স ছাব্বিশ। বাড়ি পঞ্জাবে। মাতৃভাষা হিন্দি। একহারা লম্বা ফরশা জয়পালকে বেশ সুন্দর দেখায়। কিন্তু তাহলে হবে কী, এই ক্যামপ্‌ চালু হয়েছে মাত্র মাস খানেক। কিন্তু জয়পালের সঙ্গে সুরেন্দ্রর মোটে বনিবনা হচ্ছে না। জয়পালের বক্তব্যঃ মাটি টেসট করে মনে হচ্ছে এই গ্রামে মাটির নিচে কিছু নেই। একেবারে নিরেট পাথুরে মাটি। সুরেন্দ্রর বিশ্বাস, এখানে মাটির নিচে হীরে আছে। হীরে না, ছাই। শুধু শুধু সরকারী অর্থ ব্যয় করার মানে হয় না। জয়পাল একবার সাতদিনের জন্য বাড়ি যাবার নাম করে ছুটি চেয়েছিল। উদ্দেশ্য ছিল অন্যরকম, দিল্লি গিয়ে ডিরেকটরকে খোলাখুলি বলে দিয়ে আসবে। কিন্তু ছুটি মেলেনি।

অনুসন্ধানের কাজ দ্রুততালে চলছে। সুরেন্দ্র দীক্ষিত কাজ-পাগল লোক। তার কাছে ফাঁকি দেবার উপায় নেই। নিজেও সারাদিন খাটছে। রিপোর্ট লিখছে। টাইপ হচ্ছে। এছাড়া ডাইরিও লিখে যাচ্ছে।

সম্প্রতি সুরেন্দ্র দীক্ষিত একটা ভীষণ সমস্যায় পড়েছে। সে কথা পরে বলছি।

যেদিনের কথা বলছি সেদিন ১৯৬৭ সালের ১৫ জুলাই। ঘোর অমাবস্যার রাত। রাত প্রায় শেষ হতে চলেছে। দূরে দু-একটা বুনো জন্তুর ডাক শোনা যাচ্ছে। তাঁবুগুলি নিস্তব্ধ। সব কর্মীরা গভীর ঘুমে অচেতন।

শুধু সুরেন্দ্র জেগে আছে। তার স্ত্রী একটি জরুরী চিঠি লিখেছে। স্ত্রীর বোন অর্থাৎ সুরেন্দ্রর ছোট শালীর বিয়ে ঠিক হয়েছে। সুরেন্দ্রর শ্বশুর বেঁচে নেই। বড় বোনেদেরই খরচ করে এ বিয়ে দিতে হবে। অন্য দু বোন কিছু কিছু দিচ্ছে। সুরেন্দ্র যেন অবিলম্বে পাঁচ হাজার টাকার ব্যবস্থা করে।

কী করে টাকাটা জোগাড় করবে সুরেন্দ্র ভেবে পাচ্ছে না। সে ডায়রিতে লিখছেঃ পাঁচ হাজার টাকা

হেড অফিসে গেলে হয়তো লোন পাওয়া যায় কিন্তু এখন কাজ ফেলে যাই কী করে? এদিকে দারুণ মুশকিল বেঁধেছে, কাতরা গ্রামের ভেতরে অনুসন্ধান চালানোর জন্য এখনই গ্রাম থেকে লোকজন সরিয়ে খোঁড়াখুঁড়ি শুরু করা দরকার। কিন্তু গ্রামের লোকেরা কিছুতেই গ্রাম ছাড়বে না। এই গ্রাম তৈরির আগে নাকি একশো নরবলি দিয়ে এখানকার জমি উর্বরা করা হয়েছে। এছাড়া গ্রামের ওপর যাতে কোন প্রেতাত্মা ভর করতে না পারে সেজন্য নানান ভাবে গ্রামটিকে মন্ত্রঃপূত করা হয়েছে। এ গ্রাম ছাড়া তাদের পক্ষে অসম্ভব!

এই পর্যন্ত লিখেছে, হঠাৎ পাশের তাঁবুতে শোনা গেল জয়পালের গলাঃ চোর! চোর!

দু মিনিটের মধ্যেই তাঁবুর সব লোক জয়পালের তাঁবুর সামনে জড়ো হয়ে দেখে, জয়পালের সামনে এক শীর্ণ পাকানো চেহারার বৃদ্ধ দাঁড়িয়ে। বৃদ্ধটির চোখে জ্বলন্ত দৃষ্টি। সে কোন কথা বলছে না।

জয়পাল যা বলল তার মর্মার্থ এইঃ হঠাৎ খুট করে শব্দে তার ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙতেই চোখের সামনে দেখে একটা বীভৎস কাটা মুণ্ড। তারপর সাহস করে টর্চ জ্বালতেই মুণ্ডটা অদৃশ্য হয়ে যায়। দেখে, একটি লোক দ্রুত পালিয়ে যাচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে সে তাকে জাপটে ধরে। জয়পাল জানাল, ইতিমধ্যেই লোকটিকে সে কয়েক ঘা বসিয়ে দিয়েছে কিন্তু তবু কোন কথা বার করতে পারছে না।

এমন সময় ছুটতে ছুটতে এল টিকারাম। টিকারাম কাতরা গ্রামের লোক। চাকরের কাজ ও ফাইফরমাশ খাটার জন্য তাকে রাখা হয়েছে। রাতে এখানেই থাকে। সে লোকটিকে দেখে সুরেন্দ্রকে এক পাশে ডেকে নিয়ে গিয়ে বলল, সাহেব কাকে ধরেছেন জানেন? ছেড়ে দিন, নয়তো এখুনি সর্বনাশ হবে!

কেন লোকটা কে?

ওর নাম সাধুরাম। মস্ত বড় গুণিন। মন্ত্র তন্ত্র ডাকিনী বিদ্যা জানে। এই গ্রামের পত্তনের সময় ওর ঠাকুর্দা নিজে হাতে একশো নরবলি দিয়েছিল। পুলিশ তাকে ফাঁসি দেয়। সাধুরামকেও সবাই খুব ভয় করে।

সুরেন্দ্রর মনে বেশ কৌতূহল হল। সে বৈজ্ঞানিক। মন্ত্র তন্ত্র মানে না। তবু ব্যাপারটা—

সুরেন্দ্র গিয়ে জয়পালকে বলল, ওকে আমার কাছে ছেড়ে দাও। আর তোমরা শুতে যাও।

জয়পাল বলল, ওকে পুলিশে দিচ্ছেন তো?

সুরেন্দ্র একটু রেগে গিয়ে বলল, সে আমি বুঝব।

সুরেন্দ্র সাধুরামকে তার তাঁবুতে নিয়ে গিয়ে জিজ্ঞাসা করল, আসল ব্যাপারটা খুলে বল—কেন এখানে এসেছিলে? মিথ্যে বলে কোন লাভ হবে না। এই আমার বন্দুক দেখছ?

এইবার লোকটি একটু হেসে বলল, আমাকে ভয় দেখিয়ে কোন লাভ হবে না, বাবুজী। তবে আপনি যখন অবশ্য মারধোরের হাত থেকে আমাকে বাঁচিয়েছেন, তখন আপনাকে সত্য কথা বলতে আমার আপত্তি নেই। গ্রামের লোকেরা আমাকে পাঠিয়েছিল, ডাকিনী মন্ত্র দিয়ে আপনাদের ভয় দেখাতে।

কেন?

যাতে আপনারা ভয় পেয়ে যান। নয়তো আপনারা গাঁওয়ের লোকদের তাড়িয়ে দেবেন, বাবুজী। কমসে কম একশো নরবলি দিয়ে এই গাঁয়ের জমিন উর্বরা করা হয়েছে। আজ এক কথায় তা ছেড়ে চলে যেতে হবে!

তোমার ঐ ডাকিনী মন্ত্রে আমি বিশ্বাস করি না।

এবার সাধুরাম হেসে উঠল, আপনি বিশ্বাস না করলে কী হবে, দুনিয়ার গোড়া থেকেই তন্ত্রমন্ত্র চলে আসছে। জয়পালজী আজ ওই তন্ত্রের একটু সামান্য পরিচয় পেয়েছেন। চান তো, আপনাকেও দেখাতে পারি।

সুরেন্দ্র ফস করে বলে বসল, হ্যাঁ চাই।

তাহলে কাউকে কিছু বলবেন না। কাল সন্ধ্যার পর আমার ডেরায় আসবেন। আমি এই গাঁওয়ের পশ্চিম-দিকে শাল গাছের জঙ্গলের ভেতর থাকি। একলা আসবেন। কোন ভয় পাবেন না। ডাকিনী মন্ত্রে সব দুশমন বাঁধা, কেউ আপনার ক্ষতি করতে পারবে না।

এই কথা বলতে না বলতে দপ দপ করে উঠে বাতিটা নিবে গেল। সুরেন্দ্র চমকে উঠে দেখল তার সামনে এতক্ষণ ধরে বসা লোকটি নেই। নিমেষে অদৃশ্য হয়েছে।

বাকী রাতটুকু এক অদ্ভুত উদ্বেগ আর অস্বস্তির মধ্যে দিয়ে কাটল সুরেন্দ্রর। পরদিন সন্ধ্যা হতেই সে কাউকে না বলে সাধুরামের ডেরার দিকে রওনা হল।

শালবনের মধ্যে কতকগুলো পাথরের চাপড়া ফেলে গুহার মতন একটা ঘর। ঢুকে সুরেন্দ্রর গা ছমছম করে উঠল। চারিদিকে ছড়ানো মড়ার খুলি। কোণে একটা হ্যারিকেন জ্বলছে। সাধুরাম একটা ভালুকের ছালের আসনে বসে রয়েছে।

সাধুরাম বলল, ভয় পাবেন না, বাবুজী। এই পাথরটায় বসুন। এই যে সব মড়ার খুলি দেখছেন এগুলোকে আমার ঠাকুর্দা বলি দিয়েছিল এই গাঁও পত্তনের সময়।

সুরেন্দ্র বলল, আমায় কিছু দেখাবে বলেছিলে। তাড়াতাড়ি কর। আমায় ফিরতে হবে।

সাধুরাম বলল, আপনাকে একটা দামী জিনিস দিতে চাই বাবুজী, নেবেন?

কী?

কালো বেরালের চোখের মণি। লাখ রুপেয়া দাম। এই মণি আপনার কাছে থাকলে—আচ্ছা, তার আগে জিনিসটি একবার হাতে করে দেখুন।

সাধুরাম একটা কৌটো খুলে একটা কালো গোলা-

কার পদার্থ সুরেন্দ্রর হাতে দিল। একটি ছোট মার্বেলের গুলির মতন জিনিস। বেশ চটচটে। সুরেন্দ্রর হাতটা শির শির করে উঠল।

সাধুরাম বলল, এই হল কালো বেরালের চোখের মণি। অমাবস্যার রাতে একটা নিখুঁত কালো বেরাল ধরে তাকে মন্ত্রঃপূত করে একটা ঘরে আটকে রেখে দিতে হয়। তারপর মাস খানেক পরে বেরালটি যখন না খেতে পেয়ে মারা যায় তখন তার চোখের মণিটা তুলে সাতদিন রোদ্দুরে শুকোতে হয়। এই সেই মণি। এই মণি যার কাছে থাকে সে যদি একবার মনে মনে স্মরণ করে তাহলে কালো বেরাল গিয়ে তার গুপ্ত শত্রুকে খুন করে আসে।

খারাপই করতে পারে! ভালো করার ক্ষমতা নেই?

আছে বাবুজী। কোন পূর্ণিমার রাতে খোলা আকাশের নিচে দাঁড়িয়ে এই মণি হাতে নিয়ে যদি কিছু চান তাহলে পেয়ে যাবেন।

সুরেন্দ্র সারা দেহে এক অদ্ভুত রোমাঞ্চ অনুভব করল। মনে হল তার হাতের তালুতে যেন বিদ্যুতের স্পর্শ। হ্যারিকেনের আলোয় দাড়ি গোঁফের জঙ্গলে ঢাকা সাধুরামের মুখটা সে দেখতে পেল, যেন সত্যি একটা কালো বেরালের চ্যাপটা বীভৎস মুখ।

সাধুরাম বলল, পরীক্ষা হাতে হাতেই হয়ে যাক। মুঠোটা ভাল করে ধরুন, বাবুজী। হ্যাঁ, এইবার চোখ বুঁজে মনে মনে আপনার দুশমনকে স্মরণ করুন।

সুরেন্দ্র যন্ত্রচালিতের মতন তাই করল। কিন্তু অস্ফুট গলায় বলে উঠল, কোন নাম মনে আসছে না।

দূর থেকে সাধুরামের গলার আওয়াজ ভেসে এল, তাহলে বলুন, যে আমার সঙ্গে দুশমনি করার চেষ্টা করবে তার যেন আজ মৃত্যু ঘনিয়ে আসে। কালো বেরাল যেন তার প্রতিশোধ নেয়।

মন্ত্রমুগ্ধের মত সুরেন্দ্র কথাগুলো বলে গেল। আর বলার সঙ্গে সঙ্গে তার হাতের তালুর ভেতর ধরা মণিটা যেন জীবন্ত হয়ে নড়ে চড়ে উঠল। সাধুরাম চিৎকার করে উঠল, জয় মা ছিন্নমস্তা! জ্ঞান হারাবার আগে সুরেন্দ্রর মনে হল যেন একটা কালো বেরাল বিরাট লাফ দিয়ে ঘরের ভেতর থেকে বাইরে গিয়ে পড়ল। শুনতে পেল সাধুরাম হাসছে—হাঃ হাঃ হাঃ!

ঘণ্টাখানেক পরে জ্ঞান হলে সুরেন্দ্র আচ্ছন্নের মতন তাঁবুর দিকে চলল। তার হাতের মুঠিতে তখনও ধরা ছিল বেরালের চোখের মণি। সেটিকে সে পকেটে পুরে ফেলল। ফেলে দিতে সাহস হল না।

তাঁবুর কাছে আসতেই সে দেখতে পেল প্রচণ্ড ভিড়। ক্যাপটেন স্বামীনাথন ছুটতে ছুটতে এসে বলল, স্যর সর্বনাশ হয়েছে। আপনাকে আমরা খুঁজছিলাম।

কী হয়েছে?

জয়পাল মারা গেছে!

সুরেন্দ্র অস্ফুট স্বরে বলল, মারা গেছে?

হ্যাঁ, স্যর। সন্ধ্যার পর তাঁবুর বাইরে একটু বেড়াচ্ছিল। এমন সময় চিৎকার শুনে আমি ছুটে গিয়ে দেখি একটা কালো মতন জন্তু ওকে আক্রমণ করেছে।

কী জন্তু বলতো? কালো বেরাল?

হতে পারে, স্যর। অন্ধকারে বুঝতে পারলাম না।

সুরেন্দ্র শুধু শুকনো গলায় বলল, একটু জল!

জয়পালের রহস্যজনক মৃত্যুর পর দু সপ্তাহ কেটে গেছে। প্রথম দিকটায় সবাই মুষড়ে পড়লেও শিবিরের কর্মীদের আবার মনোবল ফিরে এসেছে। রাতে একজন করে পাহারা রাখার ব্যবস্থা হয়েছে। কিন্তু খালি সুরেন্দ্র জানে, পাহারা রেখেও কিছু হবে না। কালো বেরালের

সংগ্রামের ছবি স্বাধীনতার ছবি

শৈলেশ দে রচিত

রূপ ও বাণী'র

শপথ নিলাম

পরিচালনা শচীন অধিকারী ॥ সংগীত সুকুমার মিত্র ॥ পরিবেশনা ইস্টার্ণ ফিল্ম এক্সচেঞ্জ

হাত থেকে তার কোন শত্রুরই আর রক্ষা নেই।

সুরেন্দ্র আবার চিঠি পেয়েছে। স্ত্রী লিখেছে, টাকার ব্যবস্থা না করলেই নয়। তুমি পত্রপাঠ চলে এস।

সেদিন পূর্ণিমা। সুরেন্দ্রর হঠাৎ মনে পড়ল, আজ রাতে কালো বেরালের মণি হাতে কিছু চাইলে নাকি পাওয়া যায়। সে কম্পিত হাতে স্যুটকেশ খুলে কাগজে মোড়া মণিটা বার করল। তারপর দু হাতের তালুতে রেখে চোখ বুজিয়ে শুধু একটা প্রার্থনাই জানাতে লাগল—জয় মা ছিন্নমস্তা! পাঁচ হাজার টাকা আমাকে পাইয়ে দাও, মা!

আবার হাতের মধ্যে সজীব স্পর্শ। কালো বেরালের মণিতে প্রাণ এসেছে। শোঁ শোঁ করে দমকা হাওয়ার শব্দ। দপ দপ করে হ্যারিকেনটা নিবে গেল। বাইরের জ্যোৎস্না এসে পড়ল তাঁবুর ভেতর। সুরেন্দ্র দীক্ষিতের মনে হল, একটা কালো বেরাল বাইরে যেন হেঁটে বেড়াচ্ছে।

পরদিন সকালে উঠে সুরেন্দ্র বিছানার চারিদিক খুঁজল। নাঃ, কোথাও টাকা নেই। সব বুজরুকি!

বিকেলবেলা হঠাৎ এল ডাক পিওন টেলিগ্রাম নিয়ে. টেলিগ্রামটা পড়ে তার মাথা ঘুরতে লাগল বনবন করে। তার ছেলে অজিত আজ সকালে মোটর চাপা পড়ে মারা গিয়েছে। টেলিগ্রাম করেছে তার স্ত্রী।

টেবিলে মাথা রেখে সে বসে পড়ল। আর সঙ্গে সঙ্গে তার মনে হল, বছর দুয়েক আগে ছেলের নামে একটা জীবন বীমা করেছিল সে। বীমার অঙ্কটা ছিল পাঁচ হাজার—হ্যাঁ পাঁচ হাজারই।

সুরেন্দ্র দীক্ষিত নামে একজন জুওলজিস্টকে দিল্লির কিংসটন মেনটাল হসপিট্যালে ভর্তি করা হয়েছিল। ভদ্রলোক তখন বদ্ধ উন্মাদ। ওই ঘটনার পর কাতরায় হীরার অনুসন্ধান কিন্তু বন্ধ হয়নি। জুওলজিক্যাল সার্ভে অব ইনডিয়ার কর্মীরা চলে যান। তাদের রিপোর্টের ওপর ভিত্তি করে ন্যাশনাল মিনারেল ডেভেলপমেন্ট করপোরেশন এখন কাতরার আশে পাশে পনেরখানা গ্রাম জুড়ে অনুসন্ধান চালাচ্ছেন। গ্রামের লোকদের কোন ওজর আপত্তি শোনা হয়নি। তবে এখনও নাকি ক্যামপের আশে পাশে গভীর রাতে একটা কালো বেরালকে ঘুরে বেড়াতে দেখা যায়।

ছবি এঁকেছেন বিমল মজুমদার

প্রতিরোধ

ধীরেন্দ্রলাল ধর

পাক ফৌজ নগর দখল করেছে।

বহুলোক নগর ছেড়ে পালিয়েছে, অনেকে গুলি খেয়ে মরেছে, কিছু ঘর বাড়ি নষ্ট হয়েছে। কোথাও আর মানুষ দেখা যায় না। নগরে শ্মশানের স্তব্ধতা।

সেনানায়ক নাদির খান খুশী হয়েছে। সাত দিনের মধ্যে এই অঞ্চলের সবটাই সে আয়ত্তে এনেছে; বিশেষ ক্ষয়ক্ষতি কিছুই হয়নি। পঞ্চাশ মাইল এগিয়ে আসার জন্য পঞ্চাশজনও মরেনি, মরেছে মাত্র বারোজন। তা-ও নিজেদের দোষে গেছে দুজন। রাতে একা-একা বাইরে বেরুবার দরকার কী ছিল! ...তবে ছেলেছোকরারা যে প্রতিরোধ করছিল সে শক্তি তারা চূর্ণ করে দিয়েছে। পনেরো থেকে পঁচিশ বছরের কোন ছেলে মেয়ে তাদের সামনে রেহাই পায়নি।

একজন জমাদার এসে সেলাম দিল।

কী খবর?

সব ছোট ছেলেদের এক জায়গায় জড়ো করেছি, হুজুর!

ঠিক আছে সব শেষ করে দেব। এমন করবো যে আর কখনো কেউ বিদ্রোহের নাম করবে না, কেঁদে কেঁদেই জীবন যাবে। আগামী বিশ-পঁচিশ বছর এদেশে আর কোন জোয়ান মানুষ পাওয়া যাবে না।

জমাদার অনেক দিন সেনানায়কের সঙ্গে আছে, বললো, ওই বাচ্চাগুলোকে মারতে হবে হুজুর?

নাদির খান একবার কঠোর দৃষ্টিতে জমাদারের মুখের পানে তাকালো, তারপর রূক্ষ স্বরে বললো—যা আদেশ পাবে তাই করবে, এখন গেট আউট!

জমাদার গোড়ালি ঠুকে প্রণাম জানিয়ে বেরিয়ে এল।

কয়েকজন মাতব্বরকে ধরে আনা হয়েছে, নাদির খানের কাছে।

নাদির আদেশের সুরে তাদের উপদেশ দিয়েছে— বাজার-হাট চালু রাখতে হবে, দোকান-পাট খুলতে হবে, আর আমাদের জন্য মুরগী, খাসি নিয়মিত সররবাহ করতে হবে। এর অন্যথা হলে চলবে না।

একজন মাতব্বর সাহস করে বললো—কিন্তু অনেক দোকানের মালিক তো পালিয়ে গেছে।

ওসব কোন কথা আমি শুনবো না। অন্য লোক দিয়ে তাদের দোকানও খুলতে হবে। আজ বিকাল থেকেই শহরের অবস্থা স্বাভাবিক করে তুলতে হবে।

বৃদ্ধ মাতব্বর সাহস করে বললো—আজই হবে না। দু-একদিন সময় চাই।

বেশী সময় দেব না, আজ না হয় কাল সকাল থেকে আমার এই হুকুম তামিল চাই।

মাতব্বররা সেলাম জানিয়ে উঠে পড়ছিল, নাদির বললো, আর একটা কথা। ছেলেছোকরার দল কোনখানে লুকিয়ে আছে, খবর পেলেই আমাকে জানাবে। ওরা ভারতের হিন্দুদের সঙ্গে সড় করে পাকিস্তান ধ্বংস করতে চায়, ইসলামের সর্বনাশ করতে চায়, এ আমরা কিছুতেই সইব না।

মাতব্বররা চিন্তিত মুখে পথে এসে নামলো।

সামনেই এক মুসাফির এসে দাঁড়িয়েছে। বললো, সিপাহসলার-এর সঙ্গে একবার দেখা করবো।

নাদির পিছনেই ছিল, সামনে এগিয়ে এল, কী চাই?

খোদার নামে আপনার কাছে আমার এক আরজি আছে।

কী? তাড়াতাড়ি বল, আমার সময় নেই।

আপনার সিপাইরা অনেক শিশুকে ধরে এনেছে, তাদেরকে ছেড়ে দেবার হুকুম দিন, খোদা আপনার মঙ্গল করবেন।

নাদিরের মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, তোমার আর কিছু বলার আছে?

খোদার নামে আমি আরজি করছি ওদের ছেড়ে দিন।

নাদির হাঁক দিল, এই কে আছ, মুসাফিরকে এখান থেকে হটাও!

নাদির গট্‌গট্ করে চলে গেল ভিতরে।

কয়েকজন সিপাই এগিয়ে এসে মুসাফিরকে ধাক্কা দিল। বললো, হটো হটো, সাহেব গোঁসা করছে, চলো—

মুসাফির ধীরে ধীরে রওনা হলো। সিপাইরা তার পিছু পিছু খানিকটা এগিয়ে গেল।

সিপাইরা ফিরছে এমন সময় মুসাফিরও ফিরলো, আলখাল্লার ভিতর থেকে একখানা খাম বের করে এক-জন সিপাইকে ডেকে বললো, এই লেফাফাখানা সিপাহ-সলারকে দিও।

সিপাই লেফাফা এনে নাদিরকে দিল। নাদির চিঠি খুলে পড়লো : শিশুরা নিষ্পাপ। তাদের হত্যা করলে খোদা তোমাকে ক্ষমা করবেন না, একথা মনে রেখো!

নাদিরের চোখ মুখ লাল হয়ে উঠলো। বললো, অলরাইট লেট মি সী! দ্যাখো তো ঐ মুসাফির কোথায় গেল, ধরে নিয়ে এসো—

সিপাইরা ছুটলো।

কিন্তু মুসাফিরকে কোথাও পাওয়া গেল না।

দুপুরবেলা জমাদার এল। স্যালুট দিতেই নাদির বললো, কী চাই?

হুজুর, ওই ছেলেগুলো বড় কান্নাকাটি করছে।

মরার আগে কাঁদুক, কেঁদে নিক। মরার পরে তো আর কাঁদতে পারবে না।

ওরা পাঁচ-সাত বছরের বাচ্চা, নেহাত ছেলেমানুষ।

বড় হয়ে ওরা এক একটা শয়তান হবে।

ওদের মায়েরা এসেছে হুজুর। তারা কাঁদছে।

পাহারা নেই? তাদের এদিকে আসতে দিলে কেন?

জেনানা, হুজুর! কথা শোনে না, পায়ে পড়ে।

বন্দুক নেই?

পাঠান জোয়ানরা জেনানার উপর গুলি চালাবে না।

যে চালাবে না, তার কোরট মারশাল হবে।

হুজুর!

চলো, আমি দেখছি—

পথে বেরিয়েই নজরে পড়লো, পথের ওদিকে একটি বাড়ির সামনে অনেকগুলি কালো বোরখা। তাদের সামনে একদল খাকী পোশাকের পলটন।

নাদির হুংকার দিল, জেনানাদের আটক করো—

সিপাইরা মেয়েদের ঘিরে ধরলো। তাদের ধাক্কা দিয়ে পাশের বাড়িটার মধ্যে ঢোকাতে লাগলো।

নাদির খানিকক্ষণ দেখলো। তারপর বাড়ির মধ্যে ঢুকতে যাচ্ছে, পাশের গলির মুখে সেই মুসাফির।

নাদির থমকে দাঁড়ালো। মুসাফির এগিয়ে এল। তার পিছনে বোরখা-পরা রমণীর দল। মুসাফির বললো, এরা এসেছে আপনার কাছে দয়া ভিক্ষা করতে—

নাদির কোন জবাব দিল না।

মুসাফির বলল, এদের ছেলেমেয়েরা—

সব গুলি করে মারা হবে।

ওরা তো কোন অপরাধ করেনি, হুজুর!

নাদির হুংকার দিল, জমাদার!

জমাদার বাঁশিতে ফুঁ দিল। ওদিক থেকে কয়েকজন সিপাই ছুটে এল। জমাদার বললো, এদেরও আটক করো!

সহসা মুসাফির হুংকার দিয়ে উঠল, হুঁশিয়ার! জেনানাদের আটক করা চলবে না।

সেই হাঁক শুনে সিপাইরা চমকে উঠলো। জমাদার

থতমত খেয়ে গেল। নাদির ফিরে দাঁড়ালো, কোমরের বেল্ট থেকে রিভলভার টেনে নিয়ে মুসাফিরকে গুলি করলো।

কিন্তু রিভলভারের ট্রিগার টেপার পূর্ব মুহূর্তে, বোরখা-পরা মেয়েদের প্রথম সারির একটি মেয়ে চকিতে একটা হাতবোমা বের করে ছুঁড়ে মারলো একেবারে নাদিরের কপালে। বোমা ফাটলো। নাদির পড়ে গেল।

নাদিরের গুলি মুসাফিরের লাগেনি। মুসাফির মাথার উপর হাত তুলে চিৎকার করে উঠলো, খতম কর!

মেয়েরা বোরখা ফেলে দিল। সবাইকার হাতেই বোমা। যে ক জন সৈনিক এসেছিল, সকলের গায়ের উপর বোমা ফাটলো। দু মিনিটের মধ্যে সবাই ধরাশায়ী।

কয়েকটি মেয়ে তাদের বন্দুক ও ক্যার্তুজের বেলট খুলে নিল। তারপর সোজা এগিয়ে গেল, যে বাড়িতে ছেলেদের আটকে রাখা হয়েছিল সেই বাড়ির দিকে।

সিপাইরা হকচকিয়ে গেল। প্রথম ঝোঁকেই বোমা, তারপরই গুলি। সাড়া পড়ে গেল—জেনানা সিপাই!

মুসাফির ও মেয়েরা সেই বাড়ির মধ্যে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল। ভিতরে যে ক জন সিপাই ছিল সবাইকার বন্দুকই তারা কেড়ে নিল।

জমাদার খুন, সিপাহসলার খুন। কে হুকুম দেবে? ফৌজ হৈহৈ করে উঠলো।

সেই সময় বাড়ির আড়াল থেকে এল কয়েকটা তীর। ক জন সিপাই আহত হল।

তারপরেই তারা গুলি চালালো সেই দিকে।

ইতিমধ্যে যে বাড়িটা মেয়েরা দখল করে নিয়েছিল, সেই বাড়ির জানালা থেকে গুলি বর্ষণ শুরু হল।

সিপাইরা আহত হল, বিভ্রান্ত হল।

আবার এল এক ঝাঁক তীর। তারপরেই চিৎকার শোনা গেল—জয় বাংলা!

সিপাইরা ছুটতে শুরু করলো।

এবার মেয়েরা বাড়ির দরজা খুলে বন্দুক নিয়ে বেরুলো। চিৎকার করে উঠলো—জয় বাংলা!

অনেক সিপাই আহত হয়ে পড়ে গেল। বাকী সবাই ছুটলো।

সহসা পথের ওমুখে বোমাবর্ষণ শুরু হল। আর সামনে যাবার পথ নেই।

আধ ঘণ্টা পরে সাইকেলে চড়ে একটি ছেলে এসে দু মাইল দূরে প্রতিরক্ষা কেন্দ্রে খবর দিলে—শহরের উপকণ্ঠে শতাধিক সিপাই আত্মসমর্পণ করেছে। নায়ক নাদির খান নিহত হয়েছে। প্রায় দুশো রাইফেল ও কার্তুজ এসে গেছে আমাদের হাতে। জয় বাংলা!

ছবি এ'কেছেন মদন সরকার

ওরিয়েন্টের শিশু সাহিত্য সম্ভার
শিশু ও কিশোর
মনের খোরাক
শিশুসাহিত্য বিশারদদের
লেখনী প্রসূত
মহাবিজ্ঞানী
নিউটন
ক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য
আড়াই টাকা
বিশ্বমানবের
কাহিনী
কথামালার
গল্প
অশোককুমার
চার
টাকা
অল্পকথায়
রামায়ণ
অল্পকথায়
মহাভারত
সুনির্মল বসু
আড়াই টাকা
পরিবেশক
ওরিএন্ট বুক ডিস্ট্রিবিউটর্স
কলিকাতা-১২
সচিত্র তালিকার জন্য লিখুন

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়

হাঁসুলিডাঙার বিপদ

শশাঙ্কর দুই মেয়ে। মল্লিকা আর ললিতা। মলির বয়স দশ—ললির ছয়। মলি আট মাস ইংরেজি স্কুলের হসটেলে ছিল। সেখানে মোটা রামায়ণের মলাট ছিঁড়ে নিয়ে পুতুলের খাট বানায়। সুপারিনটেনডেণ্ট মিস মণ্ডলের হাতে বেদম মার খায়। খেতে বসে প্রায়ই দু' বাটি ডাল চুমুক দিয়ে ফেলে। চার ফুট দশ ইঞ্চি লম্বা। এক মণ ওজন। ক্লাসে তিপ্পান্নজন মেয়ের মধ্যে প্রত্যেক-বার পরীক্ষায় লাস্ট হয়। তবু কাউকে পরোয়া নেই। সাঁতার জানে।

শশাঙ্কর কেরোসিনের দোকান—সাইড বিজিনেস কয়লা। উঠোনে গোবরছড়া দেবার মত রোজ সন্ধ্যায় শশাঙ্কর লোক কয়লার আড়তে জল ছিটায়। ভোরে খদ্দেররা বেশি দাম দিয়ে জলমাখা ভারি কয়লা কেনে। শশাঙ্ক কিছু বদরাগী। কেউ তার সঙ্গে মেশে না। সে আপন মনে পঞ্জিকা পড়ে, কেরোসিন তেলের ড্রামে কি সব মেশায়—রাতে দোকান বন্ধ করে সাইকেলে করে পঞ্চাননতলায় যায়। সেখানে গিয়ে প্রণাম ঠুকে বলে, বাবা পঞ্চানন্দ এবার যেন কেরোসিন বাজার থেকে সাত দিনের জন্যে হাওয়া হয়ে যায়। তাহলে তোমায় পাঁচসিকের ডালি সব সময় দেব। তার মতলব কিসে দু'টো পয়সা আসে। চুনুরিপোতা স্টেশনে, বাজারে তাকে সবাই চেনে।

এ হেন লোকের ছোট মেয়ে ললির হাইট চার ফুট—ওজন সাতাশ কিলো। ইংরেজি স্কুলে পড়ে বলে মাসে মাসে ওজন হয়—মাপা হয়—টিকের সময় টিকে—শীত-কালে চিড়িয়াখানা, বোটানিকস্ তো আছেই।

ললি মানুষটি খুব আইন মেনে চলে। হ্যাঁ ভাই তুমি আমার জায়গায় বসেছ কেন? ও কি? আমার ড্রইং খাতায় কে দাগ দিল? না, আমি তোর সঙ্গে কথা বলব না শর্মিষ্ঠা। মিস্ আমাকে ভালবাসবে না। ললি এরকমের। ফলে তার বন্ধু বেশি নেই। ডেলিপ্যাসেঞ্জারি করে। একা একা টিফিনে টিফিন করে। বাড়ি ফেরার সময় ট্রেনের জানলায় হাওয়া দেখে বসে। তখন জানলার বাইরে ধানক্ষেতে বাবুই পাখি জায়গা বদলে বসে। ফড়িং খায়। ধান খায়। এ সব দেখে ললির নাচতে ইচ্ছে করে। উপায় নেই ট্রেন ভর্তি ব্যাপারীরা। তারা গেঁজে থেকে পয়সা বের করে, নোট বের করে—থুতু মাখিয়ে গোনে।

তাই বাড়ি ফিরে ললি রেডিও খুলে দিয়ে যেকোন

গানের সঙ্গে মায়ের শাড়ি পরে নাচে। খবর হলে তার সঙ্গেও নাচতে পারে। শুধু থেমে থেমে পা ফেলতে হয়। খবরে কোন বাজনা নেই।

মলি ললির মা সারাদিন ওদের নিয়ে ট্রেনে যাতায়াত করে সন্ধেবেলা বাড়ি ফিরে চা খায়। তখন পুকুর পাড়ে একজোড়া কদম গাছে আপনাআপনি অনেক ফুল ফুটে ওঠে। আড়তে বসে শশাঙ্ক সেই সময় স্লেটে হিসেব লেখে।

কদমের গন্ধে একবার হাঁচি এসেছিল। তাই পুবের জানলাটা বন্ধ করেই রাখে। খুব কোন দরকার হলে বাড়ির ভেতরে যাওয়ার দরজাটা আধখানা খুলে ডাকে, ও কেষ্টনগরের মেয়ে—সিগারেটের বাকসোটা ফেলে এয়েছি।

মলি ললির মা সিগারেট পাঠিয়ে দেয়। সঙ্গে এক কাপ দই—না হয়ত ছোট বাটির এক বাটি ক্ষীর, যখন যা থাকে। ভেতরে বসে সে একা একা মাসিক পত্রিকার গপ্প পড়ে। মাঝে মাঝে উঠে মলিকে দু' চার ঘা লাগায়।

তাতে মেয়েটার কোন পরোয়া নেই। কলকাতার বাইরে থাকে বলে মলিকে হসটেলে দিয়েছিল। সেখানে পয়লা হপ্তাতেই জাম্পার, মোজা, বেডকাভার নিজে হাতে কাঁচতে গিয়ে হারিয়ে এল। স্বাবলম্বী হওয়ার জন্যে মিস মণ্ডল ওদের ছাদে কাপড় মেলতে পাঠিয়েছিল। সবাই তারে টাঙিয়ে কাঠের চিমটি দিয়ে আটকে রেখে এল। মলি কাঠের চিমটিগুলো খুঁজে না পেয়ে এমনিই সব মেলে রেখে এল। হসটেলের ধোপার বউ সব নিজের ঘরে রেখে এসে বলল, 'খোকি তোমহার সব বাতাসে উড়ে গেল!'

পরের হপ্তায় বাহাদুরি নিতে গিয়ে মলি দাঁত মাজার পেস্ট মাখিয়ে দু'খানা টোস্ট খেল। নাইনের অলকা কুণ্ডুর শ্যাম্পু মাথায় মাখতে গিয়ে ঘণ্টা পড়ে গেল। সেই অবস্থায় কোনরকমে কয়েক ঘটি জল ঢেলে ভিজে চুলে ক্লাসে গেল। দিন দশেক পরে ছুটিতে মলি বাড়ি গেছে। সে-বছরই ললি স্কুলে ভর্তি হবে বলে তৈরি হচ্ছে। চুল আচড়ে দিতে গিয়ে মলির মা দেখল, মাথার মাঝখানটা পেকে যাচ্ছে।

সঙ্গে সঙ্গে হসটেল নট।

তারপর দু' বোন আজ তিন বছর ডেলিপ্যাসেঞ্জার। চুনুরিপোতা স্টেশন থেকে ওরা সকাল সাতটা চুয়ান্ন-র ট্রেনে ওঠে। কলকাতায় পড়াশুনো করে বিকেল চারটে পঁয়ত্রিশের ট্রেনে দু' বোন মায়ের সঙ্গে ফেরে।

বেশ চলে যাচ্ছিল চুনুরিপোতার জীবন। স্টেশন-মাস্টারের পা ভেঙে গেল। রান্নাঘরের চালে লাউ পাড়তে গিয়ে পা হড়কে এই বিপত্তি। পোস্টমাস্টার সিনেমা হলের কাছে তার বাড়িতে ডাকঘর তুলে নিয়ে গেল।

সেখানে সিনেমা ঘরে 'পাণ্ডবের বনবাস' ছবি দেখে বাড়ি ফেরার পথে মলি ললি একটা কুকুরছানা কুড়িয়ে পেল।

নরম লোম, লম্বা কান, নাকের কাছে শাদা কালো স্পট—তিন বছরের ভেতর বাঘা তাগড়াই হয়ে উঠল। ললি থ্রি, মলি সিকস্, বাঘাও তিন ফুট লম্বা হয়ে উঠল। শশাঙ্ক দোকান থেকে ফিরলে লেজ ঘুরিয়ে, নাক ঝেড়ে আনন্দ জানায় বাঘা। শশাঙ্ক বলে, সর এখন। সারা দিন পরে কাজ থেকে ফিরেছি—সরো এখন বাবা।

চুনুরিপোতায় রথ হয় না। তবে মেলা বসে। সেখান থেকে রথ কিনে এনে দু' বোনে বারান্দায় টানে। সঙ্গে থাকে বাঘা। সুভদ্রা, বলরাম, জগন্নাথকে দু' বোনে জানলার তাকে তুলে রেখে শুতে যায়। নিচে বসে বাঘা পাহারা দেয়। রবিবার সকালে ললি পুতুলের লেপ কাঁথা শুকোতে দেওয়ার সময় বাঘা গোল হয়ে তার কাছে বসে থাকে। সন্ধ্যে সাড়ে সাতটায় রেডিওতে বাংলা খবরের সঙ্গে বাঘা ঘেউ ঘেউ করবেই। ললি মলির কথা খুব শোনে। আর ভয় করে শশাঙ্ককে।

একবার কোত্থেকে ঘাসে মাখানো বিষ খেয়ে এসে বাঘার মর মর অবস্থা। উপেন ডাক্তারের খবর হল। সবাই বলে রুপেন। সে ইনজেকসন দিতে এসে কামড় খেল। তখন শশাঙ্ক তাকে নিয়ে বেলগাছিয়ার হাসপাতালে যায়। তবে বাঘা বাঁচে।

সেরে উঠেই শশাঙ্কর গরু দোহানোর নেপালী দোহাল বাহাদুরকে প্রথম কামড়াল। তারপর কামড়াল ন্যাড়া মাথা নেপালকে। ন্যাড়া হয়েছে বলে চিনতে পারেনি। সবাই বলল, হাসপাতালের গরম গরম ওষুধ খেয়ে ওর মাথাটা গরম হয়ে গেছে। ভাল করে স্নান করানো দরকার। পুকুরে নামিয়ে ফকিরচাঁদ মিস্ত্রি স্নান করাতে গেল। তাকে একেবারে সারা গায়ে উস্তমকুস্তম করে কামড়াল বাঘা। শেষে ষোল টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়ে শশাঙ্ক নিস্তার পেল।

ঠিক হল বাঘাকে বাইরে পাচার করে দেওয়া হবে। কথাটা শুনে ললি কাঁদতে লাগল। মলি পঞ্চাননতলায় পাঁচ পয়সা মানত করল। ঠাকুর বাঘাকে যেন কেউ নিয়ে না যেতে পারে। কিন্তু কলকাতার ইস্কুলে যাওয়ার সময় কেউ যদি তাকে সরিয়ে ফেলে। সেই ভয়ে মলির পড়াশুনো আরও খারাপ হয়ে গেল। বাঘা কিন্তু রোজ সকালে চুনুরিপোতা স্টেশনে পৌঁছে দিয়ে যায়। সারা দুপুর কয়লার গাদায় ঘুমিয়ে থাকে। চারটে প'য়ত্রিশের ট্রেন এসে দাঁড়ালেই তীরের মত স্টেশনে ছুটে যায়। দু' বোন মায়ের সঙ্গে রিকসায় ফেরে। পাশে পাশে বাঘা পাহারা দিয়ে আনে। ফেরার পথে রোজ চিন্তা হয় মলির, আজ বুঝি আর স্টেশনে আসবে না বাঘা। নিশ্চয় বাবা পাচার করে দিয়েছে ওকে। ললি তো একদিন স্বপ্নই

দেখে ফেলল। সারা রাত বৃষ্টি হচ্ছিল বাইরে। শিউলি গাছটা দিয়ে অনবরত জলের ফোঁটা পড়ছে টপ টপ। আর বাঘা জলের ছাটে, শীতে কাঁপছে। ভেতরে আসতে চাইছে। কিন্তু কেউ জানে না সবাই ঘুমুচ্ছে। সে শুধু একা জেগে শুয়ে আছে। কিন্তু সাহসে কুলোলো না যে উঠে গিয়ে দরজাটা খুলে দেবে। মশারির নীচেই কয়লার চেয়েও কালো অন্ধকার। কবে যে বড় হবে।

ভোর বেলা ঘুম ভেঙে উঠেই খাট থেকে নিচে নেমে গিয়ে দরজা খুলবে—এমন সময় দেখল, খাটের তলা থেকে বেরিয়ে এসে ঠিক তারই পিছনে বাঘা আড়মোড়া ভেঙে বুকডন দিচ্ছে। ললি ওর মাথায় হাত রাখতেই হাই তুলে সোজা হয়ে দাঁড়াল। 'বাঘু' বলে ললি ওর মাথায় একটা চুমু খেল। সঙ্গে সঙ্গে বাঘা তার লেজ পাকিয়ে পাকিয়ে ঘোরাতে লাগল।

সবাই বলে যেমন মালিক তেমন কুকুর—দুটোই সমান বদরাগী। বাঘা তো সারাদিন কারো সঙ্গে কথাই বলে না। ক'দিন হলো বাঁদিকে মাথা হেলিয়ে ঘুরে বেড়ায়। বাঁ কানে এ'টুলি ঢুকে ঘা করে ফেলেছে। কিন্তু বাঘা সেখানে কোন ওষুধ লাগাতে দেবে না। কাছে গেলেই কামড়াবে।

ললি মলি সাতটা চুয়ান্ন-র ট্রেনে স্কুলে গেছে। বাড়িতে কেউ নেই। শশাঙ্ক অসময়ে গোলায় চাবি লাগিয়ে বাড়ির ভেতরে এল। আজই বাঘাকে পাচার করতে হবে। সোনারপুর জংসন থেকে বড় একটা বস্তায় ভরে বাঘাকে নিয়ে দু'জন লোক লক্ষ্মীকান্তপুর ট্রেনে উঠবে। তারপর চরণ স্টেশন ছেড়ে গাড়ি দৌড়তে শুরু করলেই বস্তাটা নিচের জলাজমিতে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে।

বাজার থেকে জিলিপি আনা হয়েছে। এক ডজন পান্তুয়া। বাঘা আজ শশাঙ্কর হাতে শেষবারের মত খাবে। দরজা ভেজিয়ে ফাঁকা বাড়িতে খাবারের ঠোঙা সাজিয়ে বসেছে সবে। বাঘার ঘর খুলে দেওয়া হবে।

এমন সময় বাইরের কড়া নাড়ল কারা।

'শশাঙ্কবাবু আছেন?'

'ভেতরে আসুন—'

'বাঘা বাঁধা আছে?'

'ভয় নেই। আমি আছি।'

আট দশজন লোক ভেতরে এল। সবাই হাসি হাসি। সবাইকেই শশাঙ্ক চেনে। পঞ্চাননতলায় বাবা পঞ্চানন্দর থানে আজ বছরখানেক ইন্দু ডেকরেটর, জগেন পান-ওয়ালা, সাইকেলের মেকানিক তরু, রিকসাওয়ালা বিল্টু রাত হলেই রিহার্সেল দেয়। পঞ্চানন অপেরা গতবারে তিন রাত পালা দিয়েছিল। লোকে লোকারণ্য। হ্যাজাক ফেটে অ্যাকসিডেন্ট।

'অনেক সাহস করে এলাম। যদি অভয় দেন—'

'ভান কোরো না। ক' টাকা চাই?'

'আজ্ঞে আজই পালা নামবে। নতুন বই—'রক্তে রাঙা

হাঁস্‌লিডাঙা।'

'বাস্‌লিডাঙা একটা স্টেশন আছে না?'

'আজ্ঞে ডায়মন্ডহারবার লাইনে—আমাদের জগেনের মামাবাড়ি। ওখেনেই মানুষ হয়েছিল জগেন। ওরই লেখা পালা—'

'আমাদের এই বাঘাকে বস্তা ভরে সেখানে ফেলে আসতে পার? রানিং ট্রেন থেকে ফেলে দিয়ে চলে আসবে। তোমাদের যা টাকা লাগে আমি দেব। আজই ফেলে আসতে হবে। এখুনি। নইলে মেয়ে দুটো ফিরলে আর বাঘাকে সরানো যাবে না।'

জগেন বলল, 'আজ্ঞেই আমাদের পালা কাকাবাবু। বারুইপুর থেকে মিউজিকহ্যান্ড আসবে। তিনখানা ফ্লুট—একটা ক্ল্যারিওনেট, হারমোনি, ঝাঁকর—'

'মোট কত লাগবে বল না ছাই—'

'তা ছ' সাতজনে চল্লিশটা টাকা তো নেবেই—'

'বহুৎ আচ্ছা। আমি দেব। এখুনি ওই আড়াইমনি ধানের বস্তার ভরে নিয়ে যাও—'

সবাই ফিরে তাকাল। কখন ওর ছোট ঘর থেকে বেরিয়ে এসে মেঝেতে টান টান করে শুয়েছে বাঘা। লেজ থেকে নাকের ডগা অবধি ফিতে ফেলে মাপলে ছ' ফুট তো হবেই। চোখ লাল—স্থির হয়ে সবাইকে দেখছে।

'আর দশটা টাকা বাড়িয়ে দিন—'

বাঘা জগেনের দিকে তাকিয়ে পেছনের ডান পা তুলে নিয়ে তাই দিয়েই খস খস করে গলা চুলকোতে লাগল।

'রাজি। ওই যে জিলিপি রয়েছে—ওইতো বস্তা তাকে—পেড়ে নিয়ে কাজে লেগে যাও।'

'আজ্ঞে, আমরা কি পারব? শেষে একটা রক্তারক্তি কাণ্ড—'

শশাঙ্ক সাহস দিল, 'ভয় কি? দিনে দিনে ফেলে এসে নেট পঞ্চাশ টাকা নিয়ে যাবে। তারপর তো সন্ধে হলেই স্টেজে একেবারে রক্তে রাঙা হাঁস্‌লিডাঙ্গা—'

কয়লা আর কেরোসিনের সঙ্গে অল্প দিন হল সারের ব্যবসাও করছে শশাঙ্ক। বিকেলের দিকে পটাশ সারে ধুলো আর কয়লার গুড়ো মেশাচ্ছিল দোকানের পেছনে গুদামঘরে বসে বসে। এমন সময় ললি এসে ঢুকলো, পরনে স্কুল ইউনিফর্ম, চোখে জল, কাঁধে স্কুলের ব্যাগ, 'বাঘা কোথায় বাবা?'

সত্যি কথা শশাঙ্ক বলতে পারল না। খানিক আগে বিষ্টু আর জগেন গুণে গুণে পাঁচখানা দশ টাকার নোট নিয়ে গেছে। বিষ্টুর জামা ছেঁড়া, জগেনের হাটুর কাছে ধুতি খুলে পড়েছে। টাকা দেওয়ার সময় শশাঙ্কই হাসতে হাসতে বলেছে, 'অভিনয় শিল্পে ও একটু আধটু কষ্ট তো থাকবেই। তাই বলে পিছিয়ে যেতে হবে নাকি?'

মলি ছুটে এল, 'তুমি নিশ্চয় জানো বাবা বাঘা

কোথায়? সত্যি কথা বল—'

ললিও চেপে ধরল, 'আজ গাড়ি থেকে নেমে দেখি স্টেশনে আসেনি। সত্যি কথা বল বাবা—'

সন্ধেটা আর কাটতেই চায় না। শশাঙ্ক অনেক বুঝিয়েও দু' বোনকে ঠান্ডা করতে পারল না। রাত আটটা নাগাদ তিনটে ফ্লুট, একটা ক্ল্যারিওনেট, ঝাঁঝর, হারমোনি এক সঙ্গে ঝা ঝা ঝা ঝম ঝম ঝম করে বেজে উঠল।

শশাঙ্ক বলল, 'ও কেষ্টনগরের মেয়ে যাওনা ওদের নিয়ে একবার ঘুরে এস। ফ্যামিলি পাস দিয়ে গেছে।'

ওদের মা খুব কম কথা বলে। তার ইচ্ছে হচ্ছিল, পাসখানা হাতে নিয়ে কুটিকুটি করে ছিঁড়ে ফেলে। ললি একা একা বারান্দায় বসে। মলি উপুড় হয়ে শুয়ে। এখন শশাঙ্কর সঙ্গে কথা কাটাকাটির মানে—অবস্থা আরও খারাপ করে তোলা। তাই আস্তে বলল, 'তুমিও চল।'

সুতরাং ওদের চারজনকে খানিক পরেই দেখা গেল, কনসার্ট পার্টির ঠিক পিছনে একেবারে স্টেজের সামনে বসে আছে। কাছেই গ্রীনরুম। সেখান থেকে জগেন দৌড়ে এল স্টেজে। গ্রামের মোড়লের বউ সেজেছে। নাম নারায়ণী। সাহেব জমিদারের আগুনে হাঁসুলিডাঙা গ্রাম পুড়ে গেছে। তাই পাগলিনী হয়ে চুল ছিঁড়তে ছিঁড়তে গাঁয়ের রাস্তা দিয়ে চলেছে। ভয় পেয়ে ললি শশাঙ্কর কোলে চড়ে বসল।

বৃদ্ধ আলিবর্দির দরবারসভা। সিরাজের জন্যে দুঃখ করে তিনি মীরমদনকে শপথ করিয়ে নিচ্ছেন, কখনো সিরাজকে ছেড়ে যাবি না বল—

রিকসা সাইকেলওয়ালা বিষ্টু হয়েছে আলিবর্দি। মেকানিক তরু সেজেছে মীরমদন। কোমরে তরোয়াল। শপথ নেওয়ার জন্যে খাপ থেকে তরোয়াল টেনেই সে বলল, 'জাঁহাপনা—'

আরও যেন কী বলার ছিল। স্টেজের সামনেই আওয়াজ হল. 'ঘেঁয়াও—'

মীরমদন কুঁকড়ে গেল। আলিবর্দি চমকে উঠল। শশাঙ্ক ঘুরে তাকাল।

ললি উঠে দাঁড়িয়ে সবার পা মাড়িয়ে ছুটে গিয়ে গলা জড়িয়ে ধরল, 'বাঘু।'

বাঘা তখন হ্যা হ্যা করে জিব ঝুলিয়ে হাঁপাচ্ছিল। সারা গায়ে কাদা মাখামাখি। গ্রীনরুম থেকে ছুটে গিয়ে স্টেজে ওঠার রাস্তার ওপর লেজ লম্বা করে মেলে দিয়ে বাঘা একেবারে চিড়িয়াখানার কুমিরটি হয়ে ওৎ পেতে পড়ে আছে।

শশাঙ্ক তখনই বিড় বিড় করে বলে উঠল, 'পইপই করে বলেছিলাম—জগেন, ওকে কিন্তু বাসুলিডাঙা পার করে ফেলে দিয়ে আসবে। নিশ্চয় সোনারপুর জংসনে বাথরুমে আটকে রেখে চলে এসেছে।'

মলি হাসছে না কাঁদছে বোঝা যায় না। আনন্দে বলে

শ্রীকমলা
ফিল্মসের
শ্রদ্ধার্ঘ্য!
মহাবিপ্লবী
অরবিন্দ
"অন্যলোকে স্বদেশকে
একটি জড়পদার্থ,
কতকগুলো মাঠ, ক্ষেত্র,
বন, পর্ব্বত, নদী বলিয়া
জানে, আমি
স্বদেশকে মা বলিয়া
জানি, ভক্তি করি,
পূজা করি।"
— শ্রী অরবিন্দ।
GORA
চিত্রনাট্য
পরিচালনা
দীপক গুপ্ত
সংগীত
হেমন্ত
মুখোপাধ্যায়
প্রযোজনা
উমেশ চন্দ্র মজুমদার
ও
পরেশ চন্দ্র মজুমদার
পরবর্তী আকর্ষণ
উত্তরাঃ পূরবীঃ উজ্জলা
বিশ্ব পরিবেশনাঃ শ্রী শঙ্কর ফিল্ম এক্সচেঞ্জ ৭৭/২/১, ধর্মতলা স্ট্রীট, কলিঃ-১৩

ফেলল, 'বেশ করেছে। নয়ত এই ট্রেনটায় উঠে ফিরে আসতে পারত না।'

পাবলিক চটে গেল। কুকুরটাকে এখানে আনল কে?

আলিবর্দির বেশে বিষ্টু প্রায় তটস্থ। জবরদস্ত সেনাপতি মীরমদন তরোয়াল তুলতে পারছে না। যেই তুলতে যায়—অমনি আবার 'ঘেঁয়াও—'

প্রম্পটারের কোলে গিয়ে বাঘার লেজটা বাড়ি খাচ্ছে।

প্রধান সেনাপতি জাফরআলি খাঁ তড়বড় তড়বড় স্বরে স্টেজে উঠে গেল। তারপর কুর্ণিশ করে বলল, 'বন্দেগী জাঁহাপনা—'

বলে কিন্তু আর এগোতে পারে না ইন্দু ডেকরেটর। তার লম্বা আলখাল্লার পেছন দিকটা বাঘা কামড়ে ধরেছে। ঠিক চিনতে পেরেছে। গায়ের গন্ধ লুকোবে কোথায়।

পেছনে দশ আনা টিকিটের পাবলিক এই সুযোগে দড়ির ঘের টপকে হুড়মুড় করে দেড় টাকার ফরাসে এসে লেপটে বসল। সে তোড় আটকায় কার সাধ্য। তার ভেতরে ভলান্টিয়াররা হারিয়ে গেল।

পঞ্চানন অপেরা যায় যায়। এ'টুলি বোঝাই বাঁ কানটা ঝাঁকুনি দিয়ে জাফরআলি খানকে ছেড়ে দিল। সঙ্গে সঙ্গে সে স্টেজের মাঝখানে গিয়ে দাঁড়িয়েই খাড়া তরোয়াল নাকে ছুঁয়ে খোদার নামে শপথ নিল।

কিন্তু ততক্ষণে 'ঘেঁয়াও' বলে বাঘা ঝাঁঝরওয়ালার কান ঘেসে দাঁড়াল। দুজন মিউজিকহ্যান্ডও ভয়ে উঠে দাঁড়াল। আলিবর্দির পার্ট গুলিয়ে গেছে। বাঘা বিষ্টুকে ঠিক চোখে চোখে রেখেছে। এই লোকটাই আজ বিকেলে তাকে ট্রেনে নিয়ে যাচ্ছিল। বস্তা ছিঁড়ে বেরিয়ে এসেই বাঘা চিনতে পেরেছিল। তারপর তার কি ভুল হল। সোনারপুর জংসনে ট্রেন থেকে নেমেই জিলিপির ঠোঙা হাতে এই লোকটাই তাকে একটা ঘরে দিয়ে যায়। যেই ভেতরে গেছে—অমনি বাইরে থেকে শেকল পড়ে যায়। মেয়েলি গলার আরও একটা গুঁফো লোক সঙ্গে ছিল ঠিক। সে গেল কোথায়?

সেখানে একটানা কতক্ষণ চেঁচিয়েছে মনে নেই। হঠাৎ শেকল খুলে দিল কে মনে নেই। বাইরে বেরিয়ে দেখে স্টেশনে আলো জ্বলছে। একটা অন্ধকার কামরায় চুনুরিপোতার হরি ময়রা দেশলাই জেলে বিড়ি ধরাচ্ছিল। লোকটা খুব দয়ালু। তাকে অনেকদিন পান্তুয়া দিয়েছে, জিলিপি দিয়েছে—ট্রেনটা ছাড়তেই বাঘা গিয়ে সেই কামরায় লাফিয়ে ওঠে।

তারপর—এইতো—

গ্রীনরুমে তখন জগেন চেঁচাচ্ছে, 'যুদ্ধ চাই যুদ্ধ। এখুনি টমসন সাহেব তরোয়াল হাতে ঢুকে পড়। পম পম পম—ঝম ঝম ঝম—খুব স্টাইলে তরোয়াল ঘোরাবে মীরমদনের সঙ্গে। পাবলিক বসে পড়বে তাহলে—নইলে

ভরাডুবি মনে রেখ।'

দাউদ খাঁ পালায় মোহন সাজে মুনির খাঁ। একবার হয়েছিল ঘসেটি বেগম। পাউডার মেখে সবে আধখানা সাহেব সেজেছে। উরু অবধি মোজা পড়েছে সাদা রঙের। মাথায় পালক লাগানো টুপি। কোমরে রুপোলি বাটের তরোয়াল ঝুলছিল। চুলটা লাল হয়েছে খানিক আগে। মোহন আপত্তি করল, 'আমরা তো দ্বিতীয় অংক তৃতীয় দৃশ্যে—'

জগেন ক'কিয়ে উঠল, 'পিঠের চামড়া তুলে নেবে। ক্যাস সেল লুট হয়ে যাবে—'

টমসন ধপাস করে গিয়ে স্টেজে পড়ল। তারপরেই মীরমদনের কানের কাছে গিয়ে চেঁচিয়ে উঠল, 'যুদ্ধ চাই যুদ্ধ।'

হকচকিয়ে গিয়েও পাবলিক থেমে গেল। মীরমদন মিউজিকহ্যান্ডদের চোখ টিপল। ও'রা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই বাজাতে লাগল—প' প' প'। পম্ পম্ পম্। ঝাং। প' প' প'—'

পাবলিক তো থ। সবাই ভাবল—না জানি জগেনের কি পালা! পরে পরে অর্থ বোঝা যাবে।

বিল্টু বৃদ্ধ আলিবর্দি। ডেকরেটরের চেয়ার সুবে বাংলা, বিহার, উড়িষ্যার মসনদ হলেও তাতে আর বসে থাকতে পারছিল না। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই পাটের দাড়িতে আঙুল চালাতে লাগল।

'প' প' প'। পম্ পম্ পম্। ঝাং। প' প' প'—'

বেজেই চলেছে। বাঘা তাদের পাশ দিয়ে পায়চারি করছে। আর মাঝে মাঝেই—'ঘে'য়াও—'

আর অমনি মীরমদনের তরোয়াল হাতে লাফানো থেমে যাচ্ছিল।

জাফরআলি খাঁ এক কোণে স্ট্যাচু হয়ে দাঁড়িয়ে। গ্রীনরুমে কারও ফেরার উপায় নেই। পথে পাহারা দিচ্ছে বাঘা। দূর থেকে সব দেখতে পাচ্ছিল জগেন। কিন্তু এগোবার উপায় নেই। মাথার পরচুলাটা খুলে ফেলে হাওয়া খাচ্ছিল—আর বার বার বলছিল—'এবারটি বাঁচাও বাবা পঞ্চানন্দ। আর কোনদিন বেশি রাতে রিহার্সেল দিয়ে তোমার ঘুম চটাবো না। কিরে কাটছি বাবা—'

চারদিক নিস্তব্ধ। টমসন আর মীরমদন না থেমে যুদ্ধ করে যাচ্ছে। মিউজিকহ্যান্ডরা নাগাড়ে বাজাচ্ছে। একই তাল সাতবার বাজানো হয়ে গেল। তবু কোন ক্লান্তি নেই। প' প' প'। প' প' প'—

স্টেজের নিচেই প্রম্পটার ছোট একটা খুরি বোঝাই পান্তুয়া রেখেছিল। নড়াচড়ায় সেটা গড়িয়ে গেল। ঘন চিনির রস গড়াতে গড়াতে ত্রিপলে পড়ল। টানা পাঁচ ছ' ঘণ্টা সোনারপুর স্টেশনের বাথরুমে চেঁচাতে হয়েছে। বাঘা আর সামলাতে পারল না। বাঁ কান কাৎ করে রস চেটে খেতে লাগল।

সেই ফাঁকে মীরমদন তরোয়ালের খোঁচায় স্টেজের

মাঝখানে মরে পড়ে গেল। শুয়ে শুয়েই চোখ টিপল। ললি সব দেখতে পাচ্ছিল। বলল, 'এমা বানানো।' কেউ শুনতে পায়নি। তখন টমসন তার বুকে বাঁ পাখানা চেপে ধরে হেসে উঠল 'হা হা হা হা—' বাঘা বলল, 'ঘউ ঘউ'—তারপর 'ঘেঁয়াও—'

মলি তার গলা জড়িয়ে চেপে ধরল, 'বাড়ি চল—'

দূরের লোক কিছুই বুঝতে পারছে না। অট্টহাসি গিলে ফেলে টমসন বিষম খেয়েছে। স্টেজেই কাসছে। আলিবর্দি ঠাণ্ডা গলায় বলল, 'আস্তে—আস্তে—'

জাফরআলি খাঁর কিছুই মনে ছিল না। সে আবার কুর্ণিশ করে বলল, 'বন্দেগী জাঁহাপনা—'

ছবি এঁকেছেন গৌতম রায়

আলিবর্দি চেঁচিয়ে বলল, 'চোপরাও বিশ্বাসঘাতক!'

'বান্দার গোস্তাকি কি জানতে পারি?'

শশাঙ্ক গোত্তা খেয়ে কনসার্টের পেছনেই বসে থাকল। বাঘা সামনে—ললি, মলি মাকে নিয়ে ভিড় কেটে এগোচ্ছে—এখুনি বাড়ি ফিরে কিছু খেতে দিতে হবে।

এমন সময় হাঁসুলিডাঙার মোড়লের পাগলিনী বউ জগেন পরচুলার চুল দুদিকে উড়িয়ে স্টেজে উঠল, 'হাঁসুলিডাঙার বিপদ কেটে গেছে জাঁহাপনা—কেটে গেছে—এ-এ-এ'

শশাঙ্ক তবু উঠল না। আজ রাতে সে যাত্রার শেষ দেখে তবে উঠবে।

দ্বিতীয় গেলাসের জল পঞ্চম গেলাসে ঢেলে আবার দ্বিতীয় গেলাসটাকে নিজের জায়গায় রাখলেই উত্তর পাবে।

ছবি দেখলে উত্তর পাবে।

শারতের
আকাশে বাতাসে
যে আনন্দ-হিল্লোল
আগমনী সুরে সুর মিলিয়ে
শারদীয়া পূজার দিনগুলো
অপরূপ ও আনন্দের ...
সেই সুন্দর দিনে
শিশু-চিত্তকে তেমনি
প্রাণবন্ত করে রাখতে
নতুন সাজে সজ্জিত
শারদীয়া
সবুজপাতা
মস্ত আকর্ষণ!
মূল্য—তিন টাকা
সুপ্রকাশনী ● ৮বি, কলেজ রো :: কলিকাতা ৯

সবুজপাতা
কার্য্যালয়

বেরালের গলায় ঘণ্টা

চণ্ডী লাহিড়ি

নয়

দশ

এগার

বার

তের

চৌদ্দ

পনের

দক্ষিণ মেরুতে প্রথম শীত

গৌরকিশোর ঘোষ

'থেরন' ও'দের তীরে নামিয়ে দিয়ে চলে গেল। যতক্ষণ দেখা যায়, ও'রা জাহাজটাকে দেখতে থাকলেন। ও'রা আটজন অভিযাত্রী। থেরন বরফের ভিতর দিয়ে পথ কেটে কেটে গভীর সমুদ্রে এগিয়ে চলেছে। আর কিছু-ক্ষণের মধেই তার পিছনে বরফ জমাট বাধতে শুরু করেছে। ও'দের সামনে এখন, এরই মধ্যে, শাদা বরফ ধু ধু। কে বলবে, ও'রা এখানে একটু আগেই জাহাজ থেকে নেমেছেন, ওই যে ওই জাহাজটা থেকে, যাকে এখনও, এই পড়ন্ত বিকেলের দ্রুত কমে আসা আলোয়, দেখা যাচ্ছে প্রায় মাইলখানেক দূরে।

এবার ও'রা তাকালেন নিজেদের চারপাশে। দেখলেন একটু দূরে জাহাজ থেকে নামানো ৩০০ টন মাল ডাঁইকরা পড়ে আছে। এই জনমানবশূন্য ধু ধু বরফের রাজ্যে, এই কুমেরু মহাদেশে এই ৩০০ টন মালই হচ্ছে ও'দের বে'চে থাকার একমাত্র সম্বল। এর মধ্যে রয়েছে ২৫ টন অ্যানথ্রাসাইট কয়লা, এই কয়লা যেমন শক্ত তেমনি খুব ধীরে ধীরে জ্বলে আর মোটেই ধোঁয়া হয় না, ৩৫০ পিপে জ্বালানী তেল, আর আছে তুষার রাজ্যে বাড়িঘর বানাবার নানা সরঞ্জাম, খাদ্য, পোশাক, শ্লেজ গাড়ি টানার জন্য ও'রা যে কুকুর বাহিনী সঙ্গে এনেছেন তাদের খাবার, আবহাওয়া মাপা, রেডিওযোগে বার্তা পাঠানো প্রভৃতির সরঞ্জাম, ট্রাকটার, ওষুধ ইত্যাদি ইত্যাদি।

এবার একটু বলে নিই, এই আটজন কারা, কেনই বা এই জনমানবহীন বরফের রাজ্যে এ'দের আগমন। কে ভি ব্লেইকলক এই দলের নেতা, ইনি জরিপ-বিশেষজ্ঞ; আর এ লেনটন, সহনেতা। ইনি দলের ছুতোর এবং রেডিও চালক; আর এইচ এ স্টুয়ারট্, আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ, পি এইচ জেফরিস, আবহাওয়াতত্ত্ববিদ, জে জে লা গ্র্যানজ, আবহাওয়াতত্ত্ববিদ, সারজেনট-মেজর ডি ই এল (রয়) হোমারড, ইনজিনিয়ার; সারজেনট ই (ট্যাফি) উইলিয়ামস, রেডিও চালক; এবং ডঃ আর গোলডস্মিথ, চিকিৎসক।

এ'রা আটজন হলেন কমনওয়েলথ ট্রানস-অ্যান-টারটিক বা কুমেরু মহাদেশ অভিযানের অগ্রবর্তী অভিযাত্রী দলের সদস্য। কুমেরু মহাদেশে এতবড় অভিযান এর আগে আর হয়নি। পুরো অভিযানের নেতা ছিলেন দুইজন। ব্রিটেনের স্যর ভিভিয়ান ফুকস এবং নিউজিল্যানডের বিখ্যাত এভারেস্ট বিজয়ী স্যর এডমনড হিলারি। ১৯৫৫ সালে এই বিরাট এবং দুর্ধর্ষ অভিযানের শুরু এবং শেষ ১৯৫৮ সালে। মোট ৪৭ জন অভিযাত্রীর তিনটি দল প্রায় তিন বছর ধরে অগম্য কুমেরু মহাদেশের এক প্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত পর্যন্ত, উত্তর থেকে দক্ষিণ, অভিযান চালিয়েছিলেন। এই আশ্চর্য অভিযানের কথা তোমরা পরে নিশ্চয়ই পড়ে নিও। শুধু এইটুকু বলে রাখি বিখ্যাত মেরু অভিযাত্রী স্যাকলটন (১৯০৮-৯) সব প্রথম দক্ষিণ মেরুতে পে'ছান, তারপর আমুনড্সেন (১৯১০-১২) এবং তারপর ক্যাপটেন স্কট (১৯১০-১৩)। দক্ষিণ মেরুকেই পৃথিবীর দক্ষিণে শেষ সীমা বলা হয়। কুমেরু মহা-দেশেরই কেন্দ্রস্থলে দক্ষিণ মেরু। এই মহাদেশের দক্ষিণে রস্ সাগর এবং এই রস্ সাগরের উপকূলেই স্কট বেস। উত্তরে ওয়েডেল সাগর এবং তার উপকূলে স্যাকলটন বেস। মাঝখানে হাজার হাজার মাইল বরফ আর বরফ আর পাহাড়। শীতের চার মাস সূর্য ওঠে না একদিনও। দিন রাত অন্ধকার। গ্রীষ্মে ছয় মাস সূর্য কখনোই অস্ত যায় না। দিনে রাতে শুধু আলো। সে এক ভারি অদ্ভুত জায়গা। আবার আমাদের এখানে যখন গ্রীষ্ম, গরমে প্রাণ আইঢাই, ওখানে তখন প্রচণ্ড শীত। আর প্রচণ্ড তুষার ঝড়। প্রাণ বাঁচানো বড়ই শক্ত।

ঠিক সেই শীতের মুখে প্রথম দলের আটজন অভিযাত্রীকে স্যাকলটন ঘাঁটিতে নামিয়ে দিয়ে থেরন জাহাজ তাঁদের বিদায় জানিয়ে চলে গেল। ও'রা সঙ্গে সঙ্গে কাজে লেগে গেলেন। কাজ কম নয়। এখান থেকে মাইল দুয়েক ও'রা একটা শক্ত নিরাপদ জায়গা দেখে রেখেছেন, যেখানে তাঁবু খাটিয়ে আপাতত কদিন ও'রা থাকতে পারবেন, তুষার ঝড়ে উড়ে যাবার ভয় নেই, কারণ চারদিকে বেশ উঁচু উঁচু বরফের শক্ত দেয়াল আছে। ওখানেই ও'দের চটপট শক্ত একটা বাড়ি বানিয়ে নিতে হবে, না হলে শীতের সময় অবধারিত মৃত্যু। যত অন্ধকার হয়ে আসছে, তাপমাত্রা ততই দ্রুত নেমে যাচ্ছে।

তরতর করে শূন্য ডিগ্রি ফারেনহাইটের নিচে নেমে গেল। কনকনে ঠান্ডায় হাত পা অসাড় হয়ে আসছে। প্রথমেই ওঁদের মনে পড়ল গরম চা খাবার কথা। ওঁদের সঙ্গে ছিল স্নো-ক্যাট ট্রাক্টর। তার কেবিনটা ছিল বেশ বড়সড়। ওঁরা ওরই ভিতর ঢুকে কোনও রকমে চা বানিয়ে নিলেন।

পরের দশটা দিন, প্রচণ্ড পরিশ্রম করে যতটা পারলেন সমুদ্রের তীর থেকে মাল সরিয়ে নিয়ে গেলেন নিরাপদ আশ্রয়ে। একটা শক্ত আশ্রয়ও গড়ে তোলবার চেষ্টা হল। কিন্তু ওঁরা ক্রমশই বুঝতে পারলেন ওই প্রচণ্ড শীতের বিরুদ্ধে লড়াই করার শক্তি তাঁদের কত অল্প। শীতের চোটে একটার পর একটা যন্ত্র বিকল হয়ে পড়তে লাগল। রয় হোমারড আর রাইনো গোলডস্মিথ প্রাণপণে সেগুলো মেরামত করতে চেষ্টা করলেন। কিন্তু এটা যদি ঠিক করেন তো ওটা তক্ষুনি বিগড়ে যায়। ট্যাফি রেডিও চালাবার যন্ত্রপাতি বসাতে শুরু করলেন। রান্নার ভারও তাঁর উপর। র‍্যালফ আর হানেস ঘর বানাতে ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। আর বাকি তিনজন মাল এনে জমা করতে লাগলেন। তবু তাঁরা দিনে দশ থেকে পনের টন মালের বেশি নিয়ে আসতে পারলেন না। দশ দিনের মধ্যে তাঁরা সমস্ত রসদ, বাড়ি বানাবার কাঠ, ৫০ পিপে পেট্রল আর প্যারাফিন তেল আর বৈজ্ঞানিক গবেষণার উপযোগী কিছু যন্ত্রপাতি এনে ফেলতে পেরেছিলেন, তাই রক্ষে। কেন না, হঠাৎ একদিন বরফ ফাটার বিকট শব্দ পেয়ে ওঁরা ঘাঁটি থেকে বেরিয়ে দেখেন যেখানে ওঁদের মাল ডাঁইকরা ছিল, বরফের চাঙড় ফেটে যাওয়ায় তাঁদের বাকি সব মাল সমুদ্রের গর্ভে চলে গেল। গেল তো গেল, আর কি করা যাবে। ওঁরা হা হুতাশ না করে কাজে মন দিলেন। বিশেষ করে আবহাওয়া সম্পর্কে তথ্য সংগ্রহে মন দিলেন। ফেবরুয়ারি গেল। মারচ মাসে শুরু হল প্রচণ্ড তুষার ঝড়। ওঁদের আস্তানার উপর বরফ জমে জমে মাঝে মাঝে এমন অবস্থা দেখা দিতে লাগল যে ওঁরা বুঝি দম বন্ধ হয়েই বা মারা যান। ঝড়ের গতি ঘণ্টায় কখনও কখনও ৭০ মাইল পর্যন্ত উঠেছে। তবু সেই প্রচণ্ডগতি ঝড়ের ভিতরেই জীবন বিপন্ন করে বেরিয়ে ওঁরা ওঁদের আস্তানার উপর থেকে বরফ চেঁছে ফেলতে লাগলেন। কুকুরের থাকবার ব্যবস্থাতেও গোলমাল দেখা দিতে লাগল। বরফ দিয়ে ওদের জন্য যে-ঘর বানিয়ে দেওয়া হয়েছিল, ওদের শরীরের উত্তাপে তা গলে যেতে লাগল। ফলে কুকুরগুলো ওই প্রচণ্ড শীতে ভিজে যেতে লাগল। তাঁরা তখন ঘর-গুলোর মাথা ফুটো করে ঠাণ্ডা বাতাস ঢুকবার একটা ব্যবস্থা করে এই সমস্যার সুরাহা করলেন।

২০ এপরিল শেষবারের মত দেখা দিয়ে সূর্যদেব ওঁদের কাছ থেকে চার মাসের মত ছুটি নিয়ে চলে গেলেন। ওঁরা এবার দিনরাত অন্ধকারের মধ্যে ডুবে রইলেন। মে মাস এসে গেল। এবার এল সব থেকে কনকনে ঠাণ্ডার দিন। গড় তাপমাত্রা কোথায় এসে ঠেকল জানো? হিমাঙ্কের ৩৫ ডিগ্রি নিচে। তার মানে কোনও কোনও দিন হিমাঙ্কের ৫০ ডিগ্রি কি ৬০ ডিগরিতেও নেমে গিয়েছিল তাপমাত্রা। ভাবাই দুঃসাধ্য!

থাকবার বাড়িটা কি যন্ত্রপাতি মেরামতের সময় হাত না খুলে পারা যাচ্ছিল না। ফলে ওঁদের অনেকের আঙুলেই তুষার ক্ষত সৃষ্টি হল। ২ আগসটেই তাপ-মাত্রা সব থেকে বেশি নিচে নেমেছিল। হিমাঙ্কের ৬৩ ডিগরি নিচে। সেদিন ওঁরা কিছু রান্না করতে পারেননি। কারণ ওঁদের স্টোভের তেল জমে গিয়েছিল।

২৩ আগসট ঠিক সময়ে সূর্যদেব এসে আবার কাজে যোগ দিলেন। ওঁরা আনন্দে হই হই করে তাঁকে স্বাগত জানালেন। কিন্তু তখনও খুব ঠাণ্ডা। হিমাঙ্কের নিচে ৪০ ডিগরি ফারেনহাইট। তবু এই প্রথম ওঁরা কাঠের আগুন জ্বালতে পারলেন। ২৯ সেপটেমবর ব্লেইকলক আর গোলডস্মিথ শ্লেজে চড়ে শিল মাছ মেরে নিয়ে এলেন। অকটোবরের প্রথম দিকেই রেডিওযোগে ওঁরা সকলের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করে ফেললেন। ২৯ অকটোবর সরাসরি বি বি সির সঙ্গে ওঁরা কথা বলতে পারলেন।

নভেমবর মাসে ওঁরা দু দুবার অভিযানে বেরিয়ে স্যাকলটন থেকে ৫০ মাইল দক্ষিণে একটা ঘাঁটি স্থাপন করে এলেন। তারপর ৭ ডিসেমবর ব্লেইকলক আর গোলডস্মিথ বেরিয়ে পড়লেন সম্পূর্ণ অজানা পথে থেরন পাহাড় অভিযানে। ওঁরা দুজনে কুড়ি দিন পরে ৩৬০ মাইল পরিভ্রমণ করে স্যাকলটনের ঘাঁটিতে ফিরে এসে দেখেন যে, ওয়েডেল সাগরে ওঁদের জন্য প্রয়োজনীয় জিনিষপত্র নিয়ে কয়েকটা জাহাজ এসে পৌঁছে গিয়েছে।

অনেকদিন পরে কিছু নতুন মানুষের মুখ দেখতে পেয়ে ওঁদের মনে হল, ওঁরা বোধ হয় পুনর্জন্ম লাভ করলেন।

এত অসুবিধা সত্ত্বেও এই দুর্ধর্ষ অভিযাত্রীরা অম্লান-বদনে নিজেদের কাজ করে গিয়েছেন, এর জন্য সকলেই তাঁদের বাহবা দিতে লাগলেন।

ছবি পরমেশ্বরী রায়চৌধুরী ॥ পাঁচ বছর

রমাপদ চৌধুরী

ছড়াটড়া

এ'কে ছবি পায় কে টাকা?
'আঁকাটাকা' বলছি তবু,
হকিটকি যায় কি খেলা?
'টকি' মানে সবাক ছবু।
টিয়ে পাখি সবাই চেনে
বিয়ে কেন 'টিয়ে'র টোপর?
দামী কাপড় আসে আসুক
সঙ্গে কেন আসবে 'চোপড়'!
'দাওয়া' মানে উচ্চ উঠোন
খাওয়াদাওয়া কী বস্তু?
বাংলা ভাষার নেইকো মানে
তথাস্তু হে তথস্তু।

শঙ্খ ঘোষ

জুলফি

বড়ো বড়ো দাদাদের বড়ো বড়ো জুলফি!
আগে ছিল দাড়ি বেশ—
পুরোনো নবাবি, না কি নয়া জমিদারি-বেশ!
এখন গিয়েছে কাটা
কী করে তা গেল জানো? জানো না তো সে-কথাটা।
খুবই হলো মুশকিল চুষে খেতে কুলফি—
দাড়ি তাই খসে গেল এল বড়ো জুলফি।
দাদাদের ভালোবাসি কেন? তাও বলছি।
ফুটো হয়ে গেছে সব বিদ্যের কলসি!
'ওতে আর কী আছে রে চলে আয় পড়া ছেড়ে—
ব'লে দুটো বোমা ছুঁড়ে সারাটা বছর জুড়ে
দাদারা যে আমাদের করে দেয় স্কুল-ফ্রী—
ভালো তাই দাদাদের ইয়া বড়ো জুলফি!

ছবি ঝুমকা ভাদুড়ী ॥ পাঁচ বছর

ছবি
সুরঞ্জিতা সিংহ ॥ পাঁচ বছর

শক্তি চট্টোপাধ্যায়
বাংলাদেশের আহ্লাদিনী

ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না
হিংসুটি তোর রকম-সকম কালনাগিনী
ঐ যা কিছু লাগছে ভালো পাগ্‌লাহাতির
থপ্‌ থপাথপ্‌ মত্ত-হাঁটন ও সাংঘাতিক
শুঁড় দিয়ে কুড়মুড় ক'রে ডাল গিলছে খালি
ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না
হিংসুটি তোর রকম-সকম কালনাগিনী।
ঐ যেখানে হাড়গিলে খায় মৎস্যছানা
আর যেখানে রক্তঝুঁটি মেলছে ডানা
সেইখানে ঠায় দাঁড়িয়ে দেখি পাই কি না পাই
ইচ্ছেমতন স্বেচ্ছাচারী গরঠিকানা
ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না ভাল্লাগে না
ও কলকাতা, বাংলাদেশের আহ্লাদিনী ॥

কামাল মাহবুব
মৎস্য সন্ধান

গন্ধমাদন বাবু বলেন,
যা নন্দ বাজারে
মৎস্য নে আয়, নন্দ যে যায়
আনন্দ বাজারে।

করতে মাছের চর্চা,
প্রচুর মেধা খরচা।

ব্যর্থ হয়ে নন্দ শেষে
কিনেই ফেলে বড়শী
তাই না শুনে মাছের আশে
আসেন পাড়া-পড়শী।

ছবি
কুশল চক্রবর্তী ॥ চার বছর
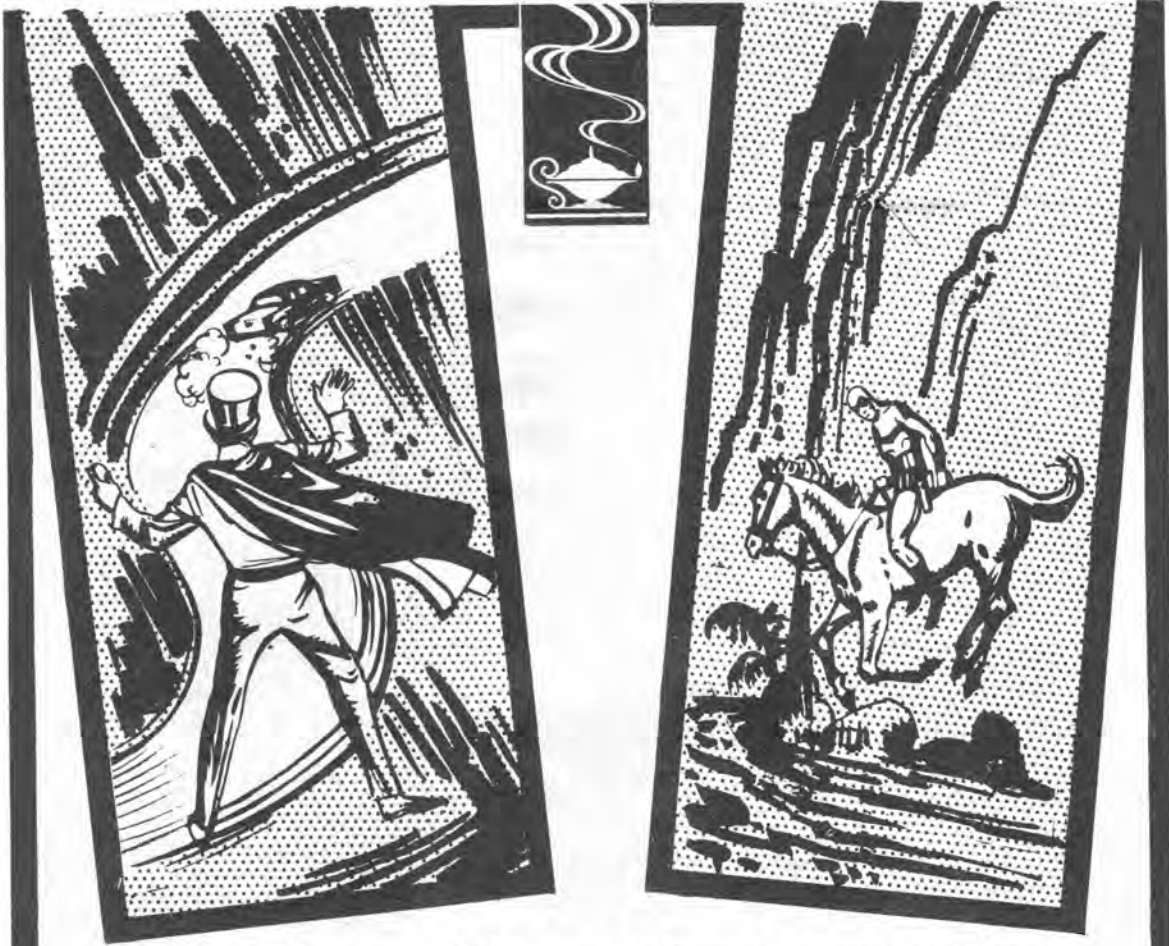
রাম, শ্যাম ও যদু—তিনজন এবার পুজোয় বেড়াতে যাবে। আলাদা—আলাদা। কারু যাবার পথ অন্যজনের পথ কেটে যাবে না। এখন প্রশ্ন—যদু কাশ্মীর গেলে রাম ও শ্যাম কোথায় যাবে?...আবার কাশ্মীর না-গিয়ে যদি যদু উটকামণ্ড যায়, তাহলেই বা কোথায়?

হর্ষবর্ধনের ভাগনে ভাগ্য

ভাগনে যে সব সময় মামার সব বিষয়ে ভাগ দখল পায়, তা হয় না। বরং, বেশির ভাগ তার উলটোটাই দেখা যায়।

সব ভাগনেই কিছু মাতুলভাগ্য নিয়ে জন্মায় না।

মামা, কোনো পরীক্ষা-টরিক্ষা না দিয়েই, ডবোল পাশ করলেও দেখা গেছে যে তাঁর ভাগনে ডবোল ফেল মেরে বসেছে—রীতিমতন পরীক্ষা দিয়েই, এমন কি!

এর মানে কী তা কে জানে, তবে সেটাই সেবার হাতে হাতে প্রমাণে পেলাম!

'আমার ভাগনের বিষয়ে কিছু বলতে চাই 'হর্ষবর্ধনই কথাটা পাড়লেন গোড়ায়ঃ 'আপনি যদি তার সম্বন্ধে একটু চেষ্টা করেন—'

'আবার সম্বন্ধ?' শুনেই না আমার দম বন্ধ হবার মত প্রায়ঃ 'মাপ করবেন আমায়, আর না! আপনার সেই গুরুঠাকুরের মেয়ের সম্বন্ধ করতে গিয়েই যথেষ্ট শিক্ষা পেয়েছি। অমন গুরুতর ঝঞ্ঝাটে পড়তে চাই না আর।'

'শিক্ষা পেয়েছেন, না, শিক্ষা দিয়েছেন! হাড়ে হাড়ে শিক্ষা দিয়েছেন। আমার-ও কী শিক্ষা হয়নি নাকি? যা পেঁয়াজ-খাওয়া পাত্র এনেছিলেন মশাই!'

বলতে গিয়ে পয়জার-খাওয়ার মতই যেন মুখখানা হয়ে যায় তাঁর।

তাঁর সেই লপেটাহত মুখের দিকে তাকিয়ে ঘটনাটা মনে পড়ে আমার...

সংক্ষেপে ব্যাপারটা বলা যায় এখানে...

গুরুদেব তাঁর কন্যার একটি সৎপাত্রের জন্য উপরোধ করেছিলেন তাঁকে। আর সেই উপরোধের ঢেঁকি গিলতে হয়েছিল এই আমাকেই।

এদিকে আমার মা পই পই করে মানা করেছিলেন কারো কোনো সম্বন্ধের ব্যাপারে যাবিনে তুই কক্ষনো। কদাচ না।

মার সেই পই পই করে মানা কখনো আমি অমান্য করিনি। এমন কি, নিজের সম্বন্ধেও যাইনি আমি একেবারে। বিয়েও দিইনি নিজের পৈতেও না, এমন কি! তাঁর সেই পই পই মানা মেনে এসেছি। অথচ, এদিকে, হর্ষবর্ধনের কথাটাও ঠেলা দায়!

শেষটায়, দু কুল বজায় রাখতে মন গড়া এক সম্বন্ধ এনে খাড়া করলাম...

'একটি ভালো ছেলে আমার সন্ধানে আছে,—পাড়া গেল কথাটা—'সব দিক থেকেই সৎপাত্র কিন্তু দোষের মধ্যে একটি মাত্র খুঁত-তবে সে কথাও কই মশাই, একেবারে

শিবরাম চক্রবর্তী

নিখুঁত কেউ কি এই দুনিয়ায় আছে কোনোখানে কোথাও? এমন কি আপনার ঐ চাঁদের মধ্যেও তো খুঁত। তবে কিনা, চাঁদ এই পৃথিবীর নয়। তবে এই পাত্রটির বিষয়ে বলতে হয় যে সে একেবারে সোনার চাঁদ—শুধু একটু খানি যা খুঁত!'

'খুঁতটা কী শুনি?'

'এমন কিছু খুঁত-খুঁত করার মতন নয়। ছেলেটি পেঁয়াজ খায়।'

'পেঁয়াজ খায়?' শুনেই চমকে ওঠেন হর্ষবর্ধনঃ 'কী বললেন, পেঁয়াজ খায় পাত্তর?'

'আজ্ঞে হ্যাঁ। সেই কথাই বলছি। এই সামান্য একটু-খানি যা খুঁত তার।'

'গোঁসাই ঠাকুরদের কুলে পেঁয়াজখোর জামাই! এটাকে আপনি সামান্য বলছেন! এই পেঁয়াজ খাওয়াকে?'

'না, সামান্য বলছিনে। পেঁয়াজ সামান্য নয়। ঠাকুর বলতেন পেঁয়াজের খোসা ছাড়িয়ে গেলে শেষ পর্যন্ত যেমন তার কিছুই থাকে না, তেমনি নেতি নেতি করতে করতে এগিয়ে গেলে এই ব্রহ্মাণ্ডমায়া বিলকুল গায়েব। এমন কি স্বয়ং পরমব্রহ্মের পাত্তাও মেলে না তখন।'

'বলতেন নাকি ঠাকুর? তার মানেটা?'

'মানেটা যে কী, তা আমিও ঠিক বুঝিনি। মনে হচ্ছে পেঁয়াজ হল গে ব্রহ্মাণ্ড কিম্বা ব্রহ্মাণ্ড একটা পেঁয়াজি। অর্থাৎ কিনা, ব্রহ্মাণ্ডের মতন পেঁয়াজও আসলে মায়াই।'

'মায়াই হোক বা যাই হোক, মায়া বলে পেঁয়াজকে উড়িয়ে দিলে তো চলবে না মশাই! পেঁয়াজ বেজায় গন্ধ ছাড়ে যে! ঠাকুর বংশে তো ও-জিনিসের আনদানি হতে পারে না।' তাঁর কাতর কণ্ঠ শুনতে পাই।

'সে কথা আপনি বুঝুন। তবে আমি বলছিলাম কি পাত্রটি ভালই। তবে ঐ যা খুঁত—একটু পেঁয়াজ খায়। তাই বলে কি রোজই খায়? তা নয়। মাঝে মাঝে খেয়ে থাকে। ঐ মাংস-টাংস হলেই—'

'মাংস খায়!'—তিনি দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন—'আমাদের ঠাকুর মশায়ের নিরিমিষ বোষ্টম বংশে এসে শেষে মাংস খাবে! পাঁঠার মাংস কি অপাঠ্য মাংস কে জানে! নিষিদ্ধ মাংস কিনা তাই বা কে বলবে!

'না না, নিষিদ্ধ নয়, সুসিদ্ধ করেই খায়। নিষিদ্ধ হজম করতে পারবে কেন?'

'নিষিদ্ধই হোক আর সুসিদ্ধই হোক...' হর্ষবর্ধনের গলায় যেন হায় হায় বাজে—'গোঁসাই বাড়িতে এসে শেষে মাংস খাবে নাকি!'

'খাব বলে কি আর অ্যাতো অ্যাতো? পাচ্ছে কোথায়! একটু আধটু কখনো কখনো খায়। আর, সে-ও ঐ চাটের মুখেই।'—হবু জামাইয়ের মুখ রাখতে গিয়ে আমার রোখ চেপে যায়।

'চাট!'—সদ্য যেন ঘোড়ার চাট খেলেন এমনি ঘোরালো হয় তাঁর মুখখানা—'এরপর আবার চাটও আছে? চাট তো জানি...চাট তো জানি...'

'হ্যাঁ, যা ধরেছেন!—' তাঁর বোধ শক্তির বহর দেখে আমি উৎফুল্ল হই—খালি খালি কি আর চাট মারে? অকারণে খায় না মশাই!'

'এর মধ্যে কারণও আছে আবার!' তাঁর আর্তনাদ শুনি: 'বৈষ্ণব বংশে শেষটায় ঘোর শাক্তের আমদানি!'

'শাক্ত বলে শাক্ত! ঘোরতর শাক্ত। শাক্ত বা শক্ত যাই বলুন, শুধু ও-ই নয়। ওদের দলটাই বেশ শক্তিধর। বেজায় শক্তি ধরে। ওয়াগন ভাঙাই কি সোজা নাকি? ওই তো কাজ ওদের। শক্তি না থাকলে কি পারা যায় ওসব? আর সেই কারণেই—ওই সব কাজকর্মের গোড়ায় একটু-খানি কারণ বারি পান করে নিতে হয়। তবে ঐ একটু-খানিই। বেশি খাবার মুরোদ কই ওদের? পয়সা কোথায়? তাছাড়া—'

'থামুন! থামুন!...ওয়াগন ভাঙা, মালগাড়ি লুঠ! কী বলছেন আপনি? অ্যাঁ? আর ঐ কারণেই থামে কিনা কে জানে। গাঁজা গুলি ভাঙ টাঙ চণ্ডু চরস—'

'গাঁজা চণ্ডু চরসের কথা বলতে পারি না, তবে গুলি খায় বটে মাঝে মাঝে। আর ঐ ভাঙের কথা যা বললেন... ভাঙচুরের কাজ তো! ভাঙবার মুখে চুর হয়ে থাকলে, খেয়াল না রাখলে আচমকা ঐগুলিও...'

'গুলিও খায়?' আবার তাঁর হায় হায় শোনা যায়।

'খায়, মানে, খেতে বাধ্য হয় আর কি! পুলিসের গুলি এসে পড়ে যে আটপকা। না খেয়ে কি উপায় আছে!'

'পুলিসের গুলিও খায়! ওয়াগন ভাঙে, নেশা করে, মাংস খায়, চুরি ডাকাতিও করে,' পাত্রের গুণাবলীর ফিরিস্তি দিতে গিয়ে ক্রমেই তিনি যেন মিইয়ে পড়েন—'এর ওপরেও আরো কোনো ইতরবিশেষ আছে কিনা কে জানে!' হর্ষবর্ধন মুহ্যমান হন।

'হ্যাঁ, আছে ইতর বিশেষ—' আমার আশ্বাস দানঃ 'আছে বই কি। ওর বন্ধুরাই সেই ইতরবিশেষ। বিশেষ ইতর বলেই বোধ হয় তাদের আমার। সত্যি বলতে কি, ছেলেটি ভালোই, পাত্র হিসেবে নেহাত অপাত্র নয়, কিন্তু ওই যে বলে সঙ্গদোষে লোহা ভাসে। সঙ্গীদের পাল্লায় পড়েই আমাদের ভাবী দুলোহা ভেসে গেল!'

'দুলোহা! দুলোহা নাম? বাঙালীও নয় বুঝি?'

'না না, দুলোহা ওর নাম নয়। খাঁটি বাঙালীও বটে। আমাদের বেহারের দেহাতী ভাষায় জামাইকে দুলোহা না দুলাহা কী যেন বলে থাকে। তাই বলছিলাম। চেহারাটা একটু কাঠখোট্টা হলেও তাই বলে

খোট্টা নয়—বাঙালীই আলবাৎ।'

'রাখ্‌ন আপনার দেহাতী বাত!' উনি চিৎকার ছাড়েন—'আপনার কথায় আমার দেহ জ্বলে যাচ্ছে! এমন পাত্র এনেছেন যে...শশ্‌র বাড়িতে আমাদের মেয়ের সুখের অন্ত থাকবে না। জামাই যতক্ষণ বাড়ি থাকবে...বউকে ধরে ঠেঙাবে কিনা কে জানে...'

'কদিন বাড়ি থাকবে মশাই!' আমি ভরসা দিই ওনাকে—'কদিন আর থাকতে পাবে? থাকতে দেবে নাকি পুলিস? বছরের মধ্যে এগারো মাস তো তার জেল-খানাতেই কাটে। বছর ভোরই শান্তি-স্বস্তিতে থাকবে আপনাদের মেয়ে। সত্যি, ছেলেটি ভারী নির্ঝঞ্ঝাটে। জেল থেকে বেরিয়ে তিন চার দিন বাইরে থাকতে না থাকতেই আবার তাকে ধরে নিয়ে যায় পুলিস। আবার সেই জেলেতেই কাটে। আপনার ভয় নেই কোনো...'

তারপর আর অভয়বাণী শোনানো যায়নি ও'কে। চোখে মুখে জলের ঝাপ্‌টা মারতে হয়েছে ও'র। মূর্ছিত হয়ে আছাড় খেয়েছেন উনি।

'তারপর আবার আপনি একটা ছেলের সম্বন্ধে বলতে এসেছেন আমাকে!' গোড়ার কথায় ফিরে গিয়ে এবারের ফাঁড়াটা কথার গোড়াতেই আমি কাটাতে চাই।

'না না! এটা কোনো বিয়ের সম্বন্ধ নয়, বি-এ পাশের সম্বন্ধেও নয়কো, নিতান্তই এস-এফের ব্যাপার!'

'এস-এফ? এস-এফের ব্যাপার!' আমি ঠাওর করতে পারি না ঠিক।

'হ্যাঁ। আমার ভাগনে স্কুল ফাইনাল দিয়েছিল এবার। ফেল করে বসেছে। কর্তাদের কাউকে ধরে টরে পাশ করিয়ে দিতে হবে তাকে। আমার বোন কান্নাকাটি করছে। বেজায়। অতএব আপনাকে...আপনিই একাজ পারবেন। তাই আপনার কাছেই...'

'আমি কাকে ধরব? কাউকেই তো আমি জানি না। এসব বিষয়ে কাকে যে ধরতে হয় তাই আমার জানা নেই।'

'সেই ভদ্রলোককে পেলে আসতুম না আপনার কাছে, মশাই! তিনি সব রকম পাশ করিয়ে দিতে পারতেন—পরীক্ষা-টরিক্ষা কিছু না দিলেও। এমন কি বি-এ, এম-এ, ডাক্তার মোক্তার—যা চান। কিন্তু দেখাই তো মিলছে না তাঁর।'

'কে সেই ভদ্রলোক?'

'আমাদের বিদ্যাসাগর মশাই! কোথায় যে তিনি বর্তমানে আছেন জানি না।'

'বিদ্যাসাগর মশাই!' আকাশ থেকে পড়ি আমি—সোজা একেবারে ভূমধ্য সাগরেই—'তিনি কি এখনো বর্তমান আছেন?'

'থাকবেন না কেন? ক বছর আগেও তো দেখেছি আমি তাঁকে।'

'বলেন কি! অনেকদিন আগে তিনি দেহরক্ষা করেছেন এই রকম একটা সন্দেহ ছিল আমার। সেদিন

লক্ষ্মী ঘি'য়ের
খাবার পেলে
ছেলেমেয়েদের
আনন্দের সীমা
থাকে না
LAKHMI
Ghee
A PURE MILK PRODUCT
LAKHMIDAS PREMJI

তাঁর দেড়শো বছরের স্মৃতি বার্ষিকী হয়ে গেল না?'

'আহা, তিনি তো আমাদের সাবেক বিদ্যাসাগর—প্রথম ভাগের। অ আ ক খ-র। ইনি হচ্ছেন বিশ্ববিদ্যাসাগর... নানা ভাগের বলা যায় এনাকে।'

'নানা ভাগের বিশ্ববিদ্যাসাগরটা কী রকমের আবার?'

'বলি তাহলে খুলে আপনাকে—শুনুন। দার্জিলিং বেড়াতে গিয়ে সেবার একটা টাট্টু নিয়ে ফিরেছিলাম তো! রোজ সকালে ময়দানে সেই ঘোড়াটায় চেপে হাওয়া খেতাম। সেই সময়ে আলাপ হয়েছিল সেই ভদ্রলোকের সাথে। কথায় কথায় তিনি জানতে চেয়েছিলেন কী পাশ করেছি আমি? আমি বলেছিলাম—এপাশ-ওপাশ। তাতে একটু অবাক হয়ে তিনি শুধিয়েছেন—ঐ A-O পাশটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের মশাই? আমি বলেছি—কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের নয়, বিছানার ওপর। এপাশ আর ওপাশ। 'তা আপনি কি কোনো পাশ টাশ করতে চান, বি এ কি এম এ?' তিনি জানতে চেয়েছেন—'তাহলে আমি তার ব্যবস্থা করতে পারি।' আর কি মশাই এই বয়সে কেঁচে গণ্ডূষ করা যায়? সেই ইনফ্যান্ট ক্লাসের থেকেই?' 'না না, পড়াশোনা করতে হবে না, কোনো পরীক্ষা-টরিক্ষা না দিয়ে যদি...?' দুনিয়ার যে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ের যে কোনো ডিগ্রি উনি আনিয়ে দিতে পারেন বললেন। শুনে আমি বলি—'দিন তাহলে পাশ করিয়ে আমায়। সবচেয়ে বড় পাশের ডিগ্রি পেতে চাই। তখন তিনি বিলেতের দুই নামজাদা বিশ্ববিদ্যালয়ের সবার সেরা দুখানা ডিগ্রি আনিয়ে দিলেন আমায়। পাঁচশো পাঁচশো হাজার টাকা দিয়ে দু দুটো পাশ আমি। তা জানেন?'

'তাই নাকি?' জানার কৌতূহল জাগে আমার।—'কী কী পাশ শুনি?'

'ডঃ আর ডাঃ।' তিনি জানানঃ 'এর চেয়ে বড় ডিগ্রি আর নেই নাকি। ঐ ডঃ আর ডাঃ।'

'ডঃ আর ডাঃ?' শুনে তো আমি হাঁ।

'হ্যাঁ, একটা মেডিক্যাল কলেজ থেকে আসে। আরেকটা কোনো বিশ্ববিদ্যালয়ে থিসিস না থাইসিস তাই দিয়ে পেতে হয়। ঐ ডঃ আর ডাঃ। দুটোর উচ্চারণই ঐ ডাক্তার।' ডাক্তার হর্ষবর্ধন ব্যক্ত করেন আমার কাছে—'লেখার সময় ঐভাবে লিখতে হয় কেবল। একটার বেলায় ডঃ আরেকটার বেলায় ডাঃ।' উনি নিজের ডাহা বিদ্যাবত্তা জাহির করেন।

শুনে পুলকিত হই—'তা, সেই ভদ্রলোকই তো পাশ করিয়ে দিতে পারেন ডিগ্রি দিয়ে আপনার ভাগনেকেও। কাউকে ধরাধরি করতে হয় না আর তাহলে।'

'পারেনই তো! কিন্তু দেখাই যে পাচ্ছি না তাঁর। সকালে ও'কে ময়দানে দেখতাম, আর বিকেলে গোল-দিঘিতে বিদ্যাসাগর মশায়ের স্ট্যাচুর নিচে বসে থাকতেন সেই বিশ্ববিদ্যাসাগর। কিন্তু আজকাল আর তাঁকে দেখতে পাই না। তার পরে ক্যান্ডিডেট নিয়ে গেছলাম তার পরে—পাছে আরো আরো নিয়ে যাই—সেই কারণেই কিনা কে জানে, ভয় খেয়ে হয়তো পালিয়েছেন এখান থেকে।'

'আরো পাশার্থী ক্যান্ডিডেট নিয়ে গেছলেন নাকি আপনি?'

'হ্যাঁ। আমার সেই টাট্টুটাকেই নিয়ে গেছলাম তার পরে। বলেছিলাম এটাকে পাশ করাতে পারেন? ডঃ, ডাঃ যা আপনার অভিরুচি। তিনি ঘাড় নাড়লেন—না, তা হয় না। আমি বললাম, আমার দুটো ডিগ্রির জন্য আমি পাঁচশো পাঁচশো এক হাজার দিয়েছি—কিন্তু এই ঘোড়াটার জন্যে এক হাজার দু হাজার পাঁচ হাজার যা

লাগে দেব। এটা আমার ভারী প্রিয়—এর পিঠে চড়ে বেড়াই তো! এটাকেও তাই পাশ করাতে চাই আমি।'

'উত্তম প্রস্তাব দিয়েছিলেন মশাই! ডাক্তারের পিঠে ডাক্তার! এমনটা আর হয় না।' সহানুভূতিওয়ালা মহানুভব ব্যক্তি বলে মনে হয় আমার হর্ষবর্ধনকে।

তাতে তিনি কী বললেন, জানেন? বললেন যে শুধু গাধাদের ডিগ্রি দেওয়ারই তাঁর এখতিয়ার আছে কেবল। ঘোড়াদের পাশ করতে হলে সামনের ঐ বাড়িটায় যেতে হবে—আমাকে উনি বিশ্ববিদ্যালয় বিলডিংটা দেখালেন—ঘোড়াদের ডিগ্রি ওখানেই দিয়ে থাকে। ওটাই হচ্ছে অশ্ব-মেধের জায়গা। ঘোড়া পিটে ও'রা গাধা বানিয়ে ছেড়ে দেবার পর আমার কাছে তারা এলে তখনই আমি শুধু পাশ করাতে পারি। তার আগে নয়। এই কথাই বললেন উনি।

'এই বললেন নাকি?' আমি বলি—'তাহলে তো আপনার ভাগনের বেলাতেও উনি পারতেন। আপনার ভাগনেকে—যদ্দুর আমার মনে হচ্ছে—মানে, নরাণাং মাতুলক্রম হয় তো? সেও একটা গাধাই।'

'হ্যাঁ, কিন্তু তারপর যে তিনি কোথায় উধাও হয়ে গেলেন কে জানে। গড়ের মাঠে সকালে হাওয়া খেতে যেতেন। সেখান থেকেও হাওয়া। দেখতেই পাই না আর। তাইতো আসতে হল আপনার কাছে। এখন, কী করতে

আমি যাব একবার...আপনি আমার জন্য এত করে থাকেন, আপনার জন্যে কিছু করতে পেলে আমি কৃতার্থ হব। তা, কী কী বিষয়ে ফেল গেছে ছেলেটা?'

'অঙ্কে। কেবল ঐ একটা বিষয়েই।'

অঙ্ক! শুনে আমার আতঙ্ক হয়। সেই সঙ্গে ফেলোফিলিংও জাগে বোধ হয় একটুখানি। আহা, ঐ সাবজেকটে আমিও যে ফেল গিয়েছি বরাবর।

গেলাম মন্ত্রীবরের কাছে। তাঁর সদর দপ্তরে সটাং। বললাম, 'দেখুন, আমার ভাগনেটা—' নিজের বলেই চালিয়ে দিলুম হর্ষবর্ধনের ভাগনেকে। পরস্মৈপদীকে আত্মনেপদী করতে কোনদিনই আমার দ্বিধা হয় না— 'আপনারই নির্বাচনী এলাকার ছেলে। এ বছর আপনার ইলেকশনে খাটাখাটনিতে একেবারে পড়াশুনা করতে পারেনি। সারারাত আপনার পোস্টার মেরেছে আর দিন-ভর ভোট ফর ভোট ফর করে চেঁচিয়েছে খালি। ফলে এ বছর ফেল মেরেছে এবারকার ফাইনালে। তাই আপনার কাছে এলাম। আপনি যদি অনুগ্রহ করে এখন...'

'আমার জন্যে খেটেছিল বলছেন? কী কী বিষয়ে ফেল গেছে শুনি?'

'অঙ্কে। ঐ অঙ্কেই কেবল।'

'একটা বিষয়েই? তাহলে হয়ে যাবে। করে দেব আমি। একটা বিষয়েই তো! পাঠিয়ে দেবেন আমার কাছে কাল এমন সময়ে।'

ছেলেটি পরদিন যথাসময়ে গিয়েছে তাঁর কাছে।

'কী বিষয়ে ফেল করেছ শুনি?' শুধালেন তাকে মন্ত্রীমশাই।

'ম্যাথামেটিক্‌সে।'

'ম্যাথামেটিক্‌সে? ম্যাথামেটিক্‌সেও ফেল গেছ আবার?' শুনে যেন মাথা খারাপ হয়ে যায় তাঁর—'তোমার মামা যে বলে গেলেন মোটে একটি বিষয়ে ফেল গেছ। ওই অঙ্কেই কেবল। ম্যাথামেটিকসেও আবার ফেল করেছ তার ওপর? না, দু দুটো সাবজেক্টে ফেল্‌! যাও। কিচ্ছু হবে না। যাঃও! পালাও। ভাগো হিঁয়াসে।'

তারপর আর কী! ভাগতে হল আমাদের ভাগনে বেচারাকে।

হবে বলুন?'

'এগজামিন পাশ করাতে হলে—' আমার সর্বজ্ঞতা প্রকাশ পায়—'যদ্দুর জানি, সববের গোড়ায় ধরতে হয় গিয়ে এগজামিনারকে, তারপর ট্যাবুলেটর, তারপরে কন্ট্রোলার, তারপরে বোধ হয় সেই উপাচার্য মশাইকেই—'

'সে সব স্টেজ পেরিয়ে গেছে। ধরে করে দেখা গেছে সবাইকে—কিস্‌সু হয়নি। গেজেটে ফল বেরিয়ে যাবার পর আর নাকি কিছুই করার থাকে না।'

'এখন কোনো মন্ত্রীই একমাত্র ভরসাস্থল। তিনিই যদি পারেন কেবল।' আমি বলি—'যদি ইচ্ছা করেন তবেই।'

'আপনি একটু বললেই হবে। আপনাদের সাংবাদিক-দের ভক্তি না করলেও ভয় করে সবাই। আপনি যদি গিয়ে অনুরোধ করেন—

'দেখা যাক চেষ্টা করে। হবেই যে, তা বলা যায় না। আমার মুন্সিয়ানা আর মন্ত্রী মশায়ের মর্জি। তবে

ছবি এঁকেছেন শৈল চক্রবর্তী

Coca-Cola
Coke
Things go better
with Coke
Enjoy
Coca-Cola

শ্রেষ্ঠত্বে
বিপুল জনপ্রিয়তায়...

নিউ

মোহন'স

লাইফ

কর্ন ফ্লেক্স

দেহের চাহিদা পূরণ করতে স্বাভাবিকভাবেই দিনভর শক্তি আর ভিটামিন যোগায়। ঠাণ্ডা দুধ আর তাজা ক্রীম মিশিয়ে নিলে বিশেষভাবে সুবাসিত এই খাবার দারুণ লোভনীয় হয়ে ওঠে। বলতে কী, লোভ সামলানই যায় না। বাঁচার আনন্দ পুরোপুরি উপভোগ করুন। মোহন'স নিউ লাইফ কর্ন ফ্লেক শুধু আজ সকালে কেন, রোজ সকালে খাবেন।